বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়

তৃতীয় খণ্ড

(প্রথম সংস্করণ)

শ্রীকালিদাস রায়
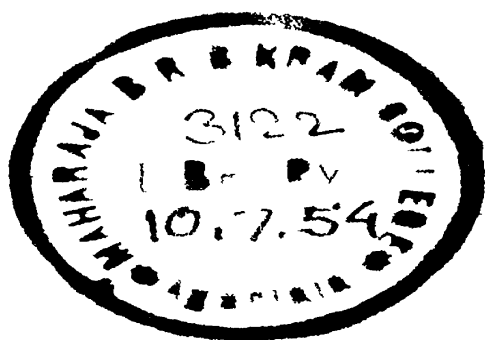
—প্রাপ্তিস্থান—
দি বুক হাউস
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

—ছয় টাকা—

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

গদ্য		পদ্য
প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য	১ম খণ্ড	আহরণ
”	২য় খণ্ড	আহরণী
”	৩য় খণ্ড	বৈকালী
বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়	১ম খণ্ড	হৈমন্তী
”	২য় খণ্ড	পর্ণপুট ১ম ও ২য়
”	৩য় খণ্ড	ব্রজবেণু
”	৪র্থ খণ্ড (যন্ত্রস্থ)	ঋতু-বঙ্গ
”	৫ম খণ্ড (ঐ)	রসকদম্ব
সাহিত্য প্রসঙ্গ	১ম খণ্ড	কাব্যে শকুন্তলা
”	২য় খণ্ড	ব্রজ-বাঁশরী
রচনাদর্শিকা	১ম খণ্ড	বল্লরী

প্রাপ্তিস্থান—দি বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

৬নং কলেজ রো, উদয়ন প্রেস হইতে মুদ্রিত   ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
আর. মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত

ভূমিকা

বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়ের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। তৃতীয় খণ্ডে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে—সমগ্র চতুর্থ খণ্ডে ঐ আলোচনাই থাকিবে। পঞ্চম খণ্ডে শরৎচন্দ্রের রচনার আলোচনা প্রকাশ করা হইতেছে। এই খণ্ড এখন যন্ত্রস্থ। সৎসাহিত্যের যাহা যাহা বাদ পড়িয়া যাইবে সেগুলির জন্য একটি পরিশিষ্ট খণ্ডের প্রয়োজন হইবে। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে—১ম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণও হইয়াছে। ৩য় খণ্ড যন্ত্রস্থ। এই সমস্ত মিলাইয়া সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের একটা মোটামুটি পরিচয় দান করাই আমার উদ্দেশ্য।

যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে রীতিমত নিষ্ণাত, এই গ্রন্থগুলি তাঁহাদের পড়িবার প্রয়োজন আছে মনে করি না। তবে তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া পাঠ করিয়া তাঁহাদের মতামত জানান, দোষত্রুটী দেখাইয়া দেন এবং নূতন তথ্যের সন্ধান দেন, তবে আমার উপকার হয় এবং ছাত্রদেরও পরোক্ষভাবে উপকার হয়।

যাঁহারা বঙ্গ সাহিত্যের ছাত্র এবং বঙ্গ সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশার্থী—তাঁহাদের সহায়তার জন্যই আমার এই প্রচেষ্টা। বঙ্গসাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস ইহা নয়। আমার গুরুস্থানীয় স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাক্তার সুকুমার সেন সে ইতিহাস লিখিয়াছেন।

সাহিত্য-প্রমাতার যে গুরুতর সাধনা তাহার ভার লইয়াছেন আমার কবিবন্ধু মোহিতলাল। আমার অন্যান্য বন্ধুরা বঙ্গসাহিত্যের অংশবিশেষের সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন। আমার কাজ তাঁহাদের কাজের অনুপূরকতা করিবে বলিয়া মনে করি।

আমার এই গ্রন্থমালা কতকগুলি প্রবন্ধের গ্রথিত মালা।—একটা গাঢ়বন্ধ সংশ্লেষণাত্মক ক্রমোন্মেষমূলক সৃষ্টি নয়।

আমি কবিতালেখক বলিয়াই সাহিত্যসমাজে পরিচিত, আমি শিক্ষাব্রতীও বটি, কিন্তু আচার্য্য বা অধ্যাপক নই। আমার যাহারা ছাত্র তাহাদের যেটুকু প্রয়োজন, তাহা আমি রচনাদর্শেই শেষ করিয়াছি। অতএব ইহা এক হিসাবে আমার অনধিকার চর্চ্চা। তবে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিতার উৎস শুকাইয়া আসিলে অনেকেই রসসৃষ্টি ছাড়িয়া সাহিত্যের উপভোক্তা হইয়া উঠে। বিশেষতঃ সংসারে নানা দুঃখক্লেশ, অভাব, বঞ্চনা ইত্যাদির মধ্যে যাহারা শান্তি ও সান্ত্বনা সন্ধান করিতে চায়, তাহারা সারস্বত সাধনা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে না। আমি সেই শ্রেণীর একজন সাহিত্যিক। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর পুস্তকে অর্থাগমের বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই।

যাঁহারা সাহিত্যালোচনার পুস্তক লেখেন—তাঁহারা হয় অধ্যাপক, নয়ত অধ্যাপকপদের সন্ধানী। যাঁহারা অধ্যাপক, তাঁহাদের আলোচনা অনেক সময় মুদ্রিত অধ্যাপনা কিংবা

ডিগ্রীবলে লব্ধ অধ্যাপকপদপ্রাপ্তির স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠা ও আত্মসমর্থন। ইহা শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চতর পদলাভের সোপানও বটে। অধ্যাপকপদের সন্ধানীদের ইহাত সোপান বটেই—তরুণ সন্ধানীরা এইরূপ আলোচনা গ্রন্থকে Thesis রূপেও পেশ করিয়া থাকেন।

আমার বিদ্যাবুদ্ধি, ডিগ্রী ও নিম্নতর শিক্ষাসেবকতার পক্ষে সেরূপ কোন সম্ভাবনা ছিল না—এখন ষাটের উপরে ত একেবারেই নাই, তাহা সকলেই জানেন। তবে এ কার্য্য করি কেন? পরিশ্রম ত কম হয় না। ইহার উত্তর—ইহা আমার পেশা নয়, নেশা।

অতএব আমার এই সকল গ্রন্থ হইতে যাহা প্রত্যাশা করা মূঢ়তা, তাহা কেহ যেন প্রত্যাশা না করেন। তবে শিক্ষার্থিগণের কিছু সুবিধা হইবে, সে বিষয়ে আমার ভরসা আছে।

নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে সুবিচার করিতে পারি নাই। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা এত বেশী যে, সেগুলির জন্য পৃথক পুস্তক রচনার প্রয়োজন। সেরূপ পুস্তক ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকেই লিখিয়াছেন। আমি তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক একখানি, পৌরাণিক নাটক একখানি, সামাজিক নাটক একখানি ও তত্ত্বমূলক নাটক একখানি বাছিয়া লইয়া আলোচনা করিলাম। আমার মনে হয়, মোটামুটি বক্তব্য বোধ হয় বলা হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক সম্বন্ধে পরে কিছু বলিবার চেষ্টা করিব।

স্বামীজির বাংলায় লেখা অল্প, তিনি ইংরাজিতেই বেশী লিখিয়াছেন—সেগুলির বাংলায় অনুবাদ হইয়াছে। স্বামীজীর আবেগগর্ভ রচনা একপ্রকার সাহিত্য। বিশেষ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহার জীবনের ব্রত ও বাণীর প্রভাব খুব বেশী; সেজন্য তাঁহার রচনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। তৃতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার ভূমিকার কতক অংশ মাত্র গেল, রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তব্যের জন্য একটি খণ্ডই উৎসর্গ করিতে হইবে।

আমি যে কাজে হাত দিয়াছি ইহাও একনিষ্ঠভাবে করিবার সুযোগ বা অবসর পাই নাই, সেজন্য দোষক্রটী অঙ্গহানি থাকিবারই সম্ভাবনা। মুদ্রণের পর আমার নিজের চোখেই অনেক ক্রটী ধর' পড়িতেছে। যদি জীবদ্দশায় দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তাহা হইলে যতদূর সম্ভব নির্দ্দোষ করিবার চেষ্টা করিব।

সন্ধ্যার কুলায়
চারু এভিনিউ, কলিকাতা-৩৩

ইতি—
শ্রীকালিদাস রায়

উৎসর্গ

পরম স্নেহাস্পদ সাহিত্যসমালোচক

শ্রীমান্ বিশ্বপতি চৌধুরী
শ্রীমান্ প্রমথনাথ বিশি
ও
শ্রীমান্ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

কবকমলেষু

তোমরা তিনজনেই আমার বিশেষ অনুরক্ত সোদরকল্প বান্ধব। একজনকে যৌবনে, একজনকে প্রৌঢবয়সে আর একজনকে বৃদ্ধবয়সে সাহিত্য-সুহৃদ্রূপে পাইয়াছি। তোমরা তিনজনে একই সময়ে, একই তীর্থে, একই ব্রতে ব্রতী, একই পথের যাত্রী। তোমাদের সারস্বত সাধনার ত্রিভুজের মধ্যে আমার বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়ের তৃতীয় খণ্ডকে অন্তর্বহ্নিত বৃত্তের মতন সন্নিবিষ্ট করিলাম। ইতি—

সন্ধ্যার কুলায়
২৫শে বৈশাখ,
রবীন্দ্রাব্দ ৯১

তোমাদের গুণমুগ্ধ চিরশুভার্থী
শ্রীকালিদাস রায়

সূচীপত্র

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়

তৃতীয় খণ্ড

নবীনচন্দ্রের

পলাশীর যুদ্ধ

পলাশীর যুদ্ধকে ঐতিহাসিক কাব্য বলা হয়। নবীনচন্দ্রের পূর্বে রঙ্গলাল ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন রাজপুতনার বীর ও বীরাঙ্গনাদের চরিত্র ও কাহিনী লইয়া। তাহা আমাদের কাছে অনেকটা পৌরাণিক কাব্যের মত। মেঘনাদবধের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে কাব্যের তেমন আর আদর হয় নাই। নবীনচন্দ্রের কাব্যখানি বাংলার ভাগ্যবিপর্যয়ের করুণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত, এ জন্য সহজেই বাঙ্গালীর অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। কাব্যোক্ত ঘটনাটি ঘটিয়াছে আমাদের বাড়ীর দুয়ারেই। কালের দূরত্বও বেশী নয়। এরূপ ঘটনাকে কাব্যে পরিণত করা সহজ নয়। দেশে ও কালে কতকটা দূরে কাব্যোক্ত ঘটনা না ঘটিলে তাহাতে রোমান্স সৃষ্টি করা কঠিন। নবীনচন্দ্র তাঁহার অসামান্য কবিপ্রতিভাবলে ইহাতে অপূর্ব রোমান্স সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন।

নবীনচন্দ্র বাইরনের শিষ্য ও অনুবর্ত্তী। এজন্য তাহাকে বাংলার বাইরন বলা হইত। রোমান্সসৃষ্টি, চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা, লালসাবিলাসের রঙ্গরসসৃষ্টি, জ্বালাময়ী বাগ্মিতা ও হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাসের জন্য তাঁহার কাব্য পড়িতে পড়িতে বারবারই বাইরনকে মনে পড়ে। ইংলণ্ডে বাইরনের আজ যে দশা, এ দেশে নবীনচন্দ্রেরও আজ সে দশাই হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"ইংরাজীতে বাইরনের কবিতা তীব্র তেজস্বিনী, জ্বালাময়ী অগ্নিতুল্যা। নবীনবাবুরও যখন স্বদেশবাৎসল্যস্রোতঃ উচ্ছ্বসিত হয় তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিঃস্রাবের ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্ব্বাসাপ্রার্থিত ক্রোধ, যদি দেশভক্তির লক্ষণ হয়, তবে নবীনবাবুর এই কাব্যের মধ্যে তাহার অনেক লক্ষণ বিকীর্ণ হইয়াছে।"

এখন কথা হইতেছে বঙ্কিমবাবুর মতে ঐগুলি দেশভক্তির লক্ষণ কিনা। আমরা যতদূর বুঝি, এক 'ভয়শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা' ছাড়া কোনটিকেই বঙ্কিম উচ্চশ্রেণীর দেশ ভক্তির লক্ষণ মনে করিতেন না। অতএব ঠিক বুঝা গেল না, বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধের তথাকথিত দেশবাৎসল্যের প্রশংসা করিলেন কিনা।

যাহাই হউক, পলাশীর যুদ্ধ একসময়ে দেশাত্মবোধমূলক কাব্য বলিয়াই আদৃত হইয়াছে।

নবীনচন্দ্র সিরাজকে অত্যন্ত অত্যাচারী দুর্বৃত্ত নবাবরূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। ছলকাপট্যের দ্বারা রণজয়ী ইংরাজজাতির লেখনীতে সিরাজ ঐভাবেই চিত্রিত। নবীন-চন্দ্রের কাব্যের কথাবস্তু জনশ্রুতি ও ইংরাজ-ঐতিহাসিকদের পুস্তক হইতেই গৃহীত। সিরাজের পতনে কবির কোন বেদনা নাই। দেশকে বাঁচাইতে হইলে সিরাজের সিংহাসন-চ্যুতির প্রয়োজন তাহা তিনি মনে করিতেন। পক্ষান্তরে ইংরাজের রাজ্যজয়কে তিনি দারুণতর অনর্থপাত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

শীতলিতে নিদাঘের আতপ জ্বালায়
অনল শিখায় পশে কোন মূঢ় জন ?

দেশ মুসলমানের পরাধীন আছে, তাহা তাঁহার পক্ষে নিদাঘ তাপের মত দুঃসহ, কিন্তু ইংরেজের অধীনতা অনলশিখার মত অসহ্য। তিনি স্বাধীনতা বলিতে হিন্দুর স্বাধীনতাই মনে করিতেন। এ জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের মত একাধিকবার বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেনের উদ্দেশে কটূক্তি করিয়াছেন। মুসলমানের শাসনে থাকিলে একদিন স্বাধীনতালাভের আশা ছিল, ইংরাজ শাসনে কোন আশাই নাই এই চিন্তাই তাঁহার কবিচিত্তকে পীড়ন করিয়াছে। কবির মতে, বিদেশী বণিকজাতির সঙ্গে হীন ষড়যন্ত্র করিয়া অবাঞ্ছিত সিরাজেরও সর্বনাশসাধন দেশাত্মবোধের অভিব্যক্তি নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া আর কিছু নয়। কবি নিজের মতাদর্শ রাণী ভবানীর মুখেই বসাইয়াছেন—

জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্ন জাতি, তবু ভেদ আকাশপাতাল,
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ। এই দীর্ঘকাল
একত্র বসতি হেতু, হ'য়ে বিদূরিত
জিতাজিত-বিষভাব, আযস্নুতসনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত,
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতিধর্মের কারণে।
অশ্বত্থপাদপজাত উপবৃক্ষ মত
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত।

* * * *

রাজকর্মচারী নবীনচন্দ্র রাণীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

আমাদের করে রাজ্যশাসনের ভার।
কিবা সৈন্য রাজকোষ রাজমন্ত্রণার
কোথায় না হিন্দুদের আছে অধিকার ?
সমরে, শিবিরে হিন্দু প্রধান সহায়।

অচিরে যবন রাজ্য টলিবে নিশ্চয়
উপস্থিত ভারতের উদ্ধার সময়।

এই ভারতের উদ্ধার অর্থে নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন—মুসলমানদের হস্ত হইতে মহারাষ্ট্রীয়দের ভারত উদ্ধার। "বিষম বিকল্প স্থানে" দাঁড়াইয়া বাণী ভবানী যাহা বলিতেছেন তাহাই নবীনচন্দ্রের দেশবাৎসল্যের প্রকৃত স্বরূপ—

"আমার কি মত? তবে শুন মহারাজ
অসহ্য দাসত্ব যদি, নিষ্কোষিয়া অসি
সাজিয়া সমর সাজে নৃপতি সমাজ
প্রবেশ' সম্মুখ রণে, যেন পূর্ণশশী
বঙ্গস্বাধীনতাধ্বজা বঙ্গের আকাশে
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে
হাসুক উজলি বঙ্গ। এই অভিলাষে
কোন বঙ্গবাসি-রক্ত ধমনী ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর? আমি যে রমণী
বহিছে বিদ্যুৎ বেগে আমারো ধমনী।"

কবি নিজের জবানীতেও বলিয়াছেন—

ধিক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, ধিক উমিচাঁদ
যবনদৌরাত্ম্য যদি অসহ্য এমন,
না পাতিয়া এই হীন ঘৃণাস্পদ ফাঁদ
সম্মুখে সমরে কবি নবাবে নিধন
ছিঁড়িতে দাসত্বপাশ, তবে কি এখন
হ'ত তোমাদের নামে কলঙ্ক এমন।

'পলাশীর যুদ্ধে' মোহনলালই একমাত্র সিংহ, বাকি সকলেই শৃগাল। মোহন লাল ছিল প্রভুভক্ত বীর, নবীনচন্দ্র তাহাকে আদর্শ দেশভক্ত বীর বানাইয়াছেন। কবি নিজের দেশপ্রাণতার সকল কথাই মোহনলালের মুখ দিয়া বলিয়াছেন। মোহনলালের বেদনা যবনের পতন হইল বলিয়া ততটা নয়, যতটা ইংরাজের বিজয়ে হিন্দুর আশাভরসাও ফুরাইল বলিয়া। মোহনলাল পলায়িত সৈনিকদের আহ্বান করিয়া বলিতেছে—

"নিশ্চয় জানিও রণে হলে পরাজয়
দাসত্ব শৃঙ্খলভার ঘুচিবে না জন্মে আর
অধীনতাবিষে হবে জীবন সংশয়।
যেই হিন্দুজাতি এবে চরণে দলিত,
সেই হিন্দুজাতি সনে নিশ্চয় জানিও মনে
একই শৃঙ্খলে হবে শৃঙ্খলিত।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত মোহনলাল অস্তগামী সূর্যকে আহ্বান করিয়া বলিতেছে—

যবনের অবনতি করি দরশন
নিরখিয়া মহারাষ্ট্র গৌরব বর্দ্ধিত,
কোন হিন্দুচিত্ত নাহি নিরাশাসদন
হয়েছিল স্বাধীনতা আশায় পূরিত।
কিন্তু তব অস্ত সনে কি বলিব আর
সেই আশাজ্যোতিঃ আজি হইবে আঁধার।

একশত বৎসর পরে কবি মহারাষ্ট্রগৌরবের ভরসার কথা লিখিয়াছেন। মোহনলাল মহারাষ্ট্রদের হাড়ে হাড়ে চিনিত, মুসলমানের চেয়ে ইংরাজ ভীষণতর কিনা সে বিষয়ে মোহনলালের সন্দেহ থাকিবার কথা। কিন্তু বর্গীরা যে মুসলমানদের চেয়ে ভীষণতর সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। মোহনলাল স্বচক্ষেই বর্গীর উপদ্রব দেখিয়াছে। অতএব মোহনলাল এখানে নিজের কথা বলিতেছে না, কবির কথাই আবৃত্তি করিতেছে।

মোহনলাল বলিতে চাহিয়াছে, মুসলমানদের যতটা সর্বনাশ হইল, হিন্দুদের ততটা নয়। হিন্দুরা অন্ততঃ নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারিবে। কারণ—

—পশিয়া পিঞ্জরাস্তরে বনবিহগীর
কিবা সুখ অসুখ সমান অধীন।
এবং—কিবা ধনী মধ্যবিত্ত কিবা দীনহীন
আজি হতে নিদ্রা যাবে নির্ভয়ে সকল,
ফুরাইল যবনের রাজ্য অভিনয়
এত দিনে যবনিকা হইল পতন।
কারণ—এখনো শরীর কাঁপে স্মরি অত্যাচার
করাল কৃপাণমুখে ধর্ম্মের বিস্তার।

একটা সান্ত্বনা এই—

তেজোময় বীরসিংহ ভারতে পাশলে
কামিনীকোমল হয় তার পরশনে।
ইন্দ্রিয়লালসা বহে সবেগে ধমনী
বীর হয় ভোগলিপ্সা, পুরুষ রমণী।

ইহার ফলেই মুসলমানের পতন, ইংরাজেরও এই একই কারণে একদিন পতন হইবে। বৃটিশরাজলক্ষ্মীর মারফতে কবি ব্রিটিশকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—"যদি ব্রিটিশ অপক্ষপাত ন্যায়নিষ্ঠতার সহিত শাসন পালন করে, তবেই তাহার রাজত্ব স্থায়ী হইবে, নতুবা 'ডুবিবে ব্রিটিশ রাজ্য ডুবিবে নিশ্চয়।'

ব্রিটিশরাজলক্ষ্মী ক্লাইবকে বলিতেছে—

ধর বৎস এই ন্যায়পরতা-দর্পণ
বিধিকৃত ব্রিটিশের রাজ্য নিদর্শন ?
যত দিন পূর্ব্বরাজ্যে ব্রিটিশ শাসন
থাকিবে অপক্ষপাতী বিশদ এমন,
তত দিন সেই রাজ্য হইবে অক্ষয়।
এই মহারাজনীতি মোহান্ধ যবন
ভুলিয়াছে। এই পাপে ঘটেছে নিরয়,
এই পাপে কত রাজ্য হয়েছে পতন।
ভীষণ সংহার-অসি রাজ্যের উপরে
ঝোলে সূক্ষ্ম ন্যায়সূত্রে বিধাতার ঘরে।

নবীনচন্দ্র যতই বাঙ্গালী বীরত্বের উদ্বোধন করুন, বাঙ্গালী বেতনভোগী মোহনলালকে একমাত্র দেশহিতৈষী বলিয়া যতই চিত্রিত করুন—বাঙ্গালী জাতির দুর্ব্বলতা তিনি মনে প্রাণে উপলব্ধি করিতেন। জগৎশেঠের মুখ দিয়া তিনি সত্য কথাই বলিয়াছিলেন—

স্বর্গ্য মর্ত্ত্য করে যদি স্থানবিনিময়
তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে একমত।
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু সাহসে দুর্জ্জয়
কার্য্যকালে দেখে সব নিজ নিজ পথ।

কবির কল্পিত এই বাঙালী চরিত্র পলাশীর যুদ্ধে পঞ্চম সর্গে সম্পূর্ণ অনাবৃত ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে—

হায় মা ভারতভূমি, বিদরে হৃদয়
কেন স্বর্ণপ্রসূ বিধি করিল তোমারে ?
কেন মধুচক্র বিধি করে সুধাময়
পরাণে বধিতে হায় মধুমক্ষিকারে ?
পাইত না অনাহারে ক্লেশ মক্ষিকায়
যদি মকরন্দ নাহি হ'ত সুধাসার।
স্বর্ণপ্রসবিনী যদি না হইতে হায়
হইতে না রঙ্গভূমি অদৃষ্ট ক্রীড়ার।
আফ্রিকার মরুভূমি, সুইস:পাষাণ
হ'তে যদি তবে সতি ; তোমার সন্তান
হইত না এইরূপ ক্ষীণ কলেবর
হইত না এইরূপ নারীসুকুমার।

ধমনীতে প্রবাহিত হ'ত উগ্রতর
রক্তস্রোত। হ'ত বঙ্গ বীর্য্যের আধার।
আজি এ ভারতভূমি হইত পূরিত
সজীব পুরুষরত্নে। দিগ্ দিগন্তর
ভারত-গৌরবসূর্য্য হ'ত বিভাসিত
বাঙ্গালার ভাগ্য আজি হ'ত অন্যতর।

পলাশীর যুদ্ধ ঐতিহাসিক কাব্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে গীতিকাব্য। মহাকাব্যের বা খণ্ড কাব্যের আকারে সর্গবদ্ধভাবে ইহা রচিত বলিয়া অনেকে ইহাকে গীতিকাব্য বলিয়া গণ্য করেন নাই। অবশ্য বঙ্কিম তখনই বলিয়াছিলেন—"পলাশীর যুদ্ধে উপাখ্যান এবং নাটকের ভাগ অতি অল্প। গীতিই প্রবল।" খণ্ডকাব্য হিসাবে তিনি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন—গীতি এত প্রবল না হইয়া উপাখ্যান ও নাটকের ভাগ বেশি থাকিলে ভালো হইত। তাই তিনি লিখিয়াছিলেন—

"এই কাব্যের বিশেষ একটি দোষ, কার্য্যের মন্থরগতি। ইহাতে কার্য্য অতি অল্প। যাহা আছে তাহার গতি অল্পে অল্পে হইতেছে। অল্প ঘটনার বিস্তীর্ণ বর্ণনায় সর্গসকল পরিপূরিত হইয়াছে।"

এ সকল কথা না তুলিয়া পলাশীর যুদ্ধকে কতকগুলি গীতিকবিতার সমষ্টি বলিয়া স্বীকার করিয়া কবির যথাযোগ্য প্রাপ্য দান করিলেই চলে। ঘটনা বা উপাখ্যানাংশ কম বলিয়াই ইহা গীতিকাব্যের পদবীতে আরোহণ করিবার সুযোগ পাইয়াছে,—গানে যেমন বাণীভার অল্প থাকিলে গানের সুর অবাধে খেলিবার সুযোগ পায়। উপাখ্যানভাগের ক্ষীণতায় ঘটনাঘনতার অভাবে এই কাব্যে গীতিমাধুর্য্য উচ্ছলিত হওয়ার সুযোগ পাইয়াছে।

মেকলে, মার্শম্যান ইত্যাদি ইংরাজ লেখকের রচিত ইতিহাস (বঙ্কিমের কথায় উপন্যাস) হইতে নবীনচন্দ্র সিরাজের কাহিনী পাইয়াছেন—তাহার ফলে সিরাজচরিত্রের প্রতি বিদ্বেষ লইয়াই তিনি কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, কাব্যের স্বকীয় প্রয়োজনেও তাঁহাকে সিরাজচরিত্র কলঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছে। মুসলমানের রাজ্য ধ্বংসকে কবি বিধাতার দণ্ডবিধান বলিয়াই মনে করিয়াছেন। সামান্য কয়জন বণিক যে সিরাজের বিশাল বাহিনীকে ছলেবলে পরাজিত করিল, ইহার মধ্যে বিধাতার গূঢ় অভিপ্রায়ই নিহিত রহিয়াছে। ক্লাইবকে নবীনচন্দ্র বিধাতৃ-প্রেরিত বিজেতা বলিয়াই শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। ব্রিটিশরাজলক্ষ্মীও বিধাতৃপ্রেরিত। ষড়্‌যন্ত্রের দুর্য্যোগ রজনীর বর্ণনাচ্ছলে কবি বলিয়াছেন—

অস্পন্দ অন্তরে যেন স্তব্ধ ধরাতল
শুনিছে কি মেঘমন্দ্র ঘন গরজিয়া,
বিজ্ঞাপিছে বিধাতার ক্রোধ ভয়ঙ্কর
কাঁপাইয়া অত্যাচারী পাপীর অন্তর।

পলাশীর শিবিরে নিদ্রাভঙ্গের পর—

সিরাজ স্বপ্নান্তে রবি করি দরশন
ভাবিল এ বিধাতার রক্তিম নয়ন।

ধর্মগোপ্তা বিধাতার অভিপ্রায়েই যখন এই দণ্ড, তখন পাপকে প্রায়শ্চিত্তের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া দেখানোই নবীনচন্দ্রের কবিধর্ম হইয়া উঠিল। প্রায়শ্চিত্তটা সম্পূর্ণ ইতিহাস সঙ্গত। তদুপযোগী পাপের সমাবেশের জন্য কবিকে কল্পনার সাহায্য লইতে হইয়াছে। রাজা রাজবল্লভের মুখ দিয়া কবি তাই বলিয়াছেন,—

ক্রমে পাপলিপ্সাস্রোত হতেছে বিস্তার,
এই দুর্নিবার নদী কে বলিতে পারে,
কোথা হবে পরিণত ? কিছুদিন আর
সতীত্ব রতন এই বঙ্গের ভাণ্ডারে
থাকিবে না। থাকিবে না কুলশীলমান
বঙ্গবাসীদের হায়। এখনো সবার
অনিশ্চিত ভয়ে ত্রাসে কণ্ঠাগত প্রাণ
সীমা হতে সীমান্তরে এই বাঙ্গালার
উঠিতেছে হাহাকার। ভাবে প্রজাগণ
কেমনে রাখিবে ধন, রাখিবে জীবন।

চক্রান্তকারীদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত অভিযোগ ছিল—তাহারা সেই অভিযোগকে জাতীয় অভিযোগ বলিয়া প্রচার করিতেছে এবং অতিরঞ্জনের সাহায্য লইতেছে—ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কবি নিজের জবানীতেও বহু স্থলে সিরাজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন—ইহা ছাড়া, সিরাজের স্বপ্ন ও তাহার আত্মধিক্কারের মধ্য দিয়া, তাহার ভোগবিলাসের মধ্য দিয়াও তাহার দণ্ডার্হতা দেখানো হইয়াছে। কবি সিরাজকে শুধু ইন্দ্রিয়াসক্ত কামপশুরূপে চিত্রিত করেন নাই—তাহার স্কন্ধে সর্বপ্রকার পাপ ও দুর্বলতা আরোপ করিয়াছেন। সে শুধু পাপিষ্ঠ নয়, সে কাপুরুষ, রণভীরু, দুর্বলচিত্ত, স্বার্থপর ও নির্বোধ। সে প্রাণরক্ষার জন্য সর্ববিধ হীনতা স্বীকারে প্রস্তুত।

সিরাজকে যখন মোহাম্মদীবেগ হত্যা করিতে আসিতেছে, হতভাগ্য কারাকক্ষে বন্দী সিরাজ তখন অনুতপ্ত হইয়া শুধু বাঁচিবার অধিকারটুকু চাহিতেছে। যতই দুর্বৃত্ত হউক বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার ইংরেজ-বিদ্বেষী নবাব আলিবর্দি খাঁর দৌহিত্র, মহাপাপী মিরণের হেয় অনুচরের হাতে যূপবদ্ধ ছাগের মত নিহত হইতে চলিয়াছে—তখনও নবীনচন্দ্রের কবি-জনোচিত সহানুভূতি সে পাইতেছে না। ঘাতকের প্রতিই যেন তাঁহার সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ এইখানেই 'পলাশীর যুদ্ধে' চরম কবিত্বপ্রকাশের অবকাশ ছিল।

কবি বলিতেছেন—

হতভাগ্য! দুরাচার যুবক দুর্জ্জন
পায়ে পড, ক্ষমা চাহ, সকলি বিফল,
কর্ম্মক্ষেত্রে যেই বীজ করেছ রোপণ
ফলিবে তেমন তরু অনুরূপ ফল।
আজন্ম ইন্দ্রিয়সুখ পাপকামনায
কি পাপে না বঙ্গভূমি করেছ দূষিত?
নবনারীরক্তস্রোতে ভুলেছ কি হায়
কি পাপ কামনা নাহি করেছ পূরিত।
ভাবিতে পরের ভাগ্যবিধাতা তোমায়,
নিজ ভাগ্যে এই ছিল জানিতে না হায়।

আশ্চর্যের বিষয়, নবীনচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল সিরাজের বয়স উনিশ বৎসর মাত্র। তবু উনিশ বৎসরের যুবক কত পাপ করিতে পারে তাহা কবি ভাবিয়া দেখেন নাই—বিধাতার বিধানের সমর্থনের জন্য তাহার এইরূপ সিরাজচরিত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। কাব্যের রীতিগত প্রয়োজন সাধন করিতেও এখানে নবীনচন্দ্রের কবিধর্মবিচ্যুতি হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, মাইকেলের অনুজাত কবি হইয়াও নবীনচন্দ্রের এই কবিধর্মচ্যুতি ঘটিল!

রায়দুর্লভের মুখ দিয়া সিরাজকে রক্ষা করিবার যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে সিরাজের প্রতি আরও কঠোরতর অবিচারই করা হইয়াছে—

সিরাজ দুর্দ্দান্ত অতি নিষ্ঠুর পামর
মানি আমি। কিন্তু লোকে বনের শার্দ্দূল
পোষে নাকি? পোষে নাকি কাল বিষধর
বুদ্ধির কৌশলে? তবে কেন হেন ভুল।

আজ আমরা জানি—ইংরাজজাতি নিজের অপকর্মের সমর্থনের জন্য ইতিহাসের নামে উপন্যাস রচনা করিয়াছে, তাহারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে তাহারাই দারুণ দুর্গতি ও অত্যাচার হইতে এ দেশকে ত্রাণ করিয়াছে। আজ আমরা জানি অন্ধকূপহত্যা মিথ্যা কল্পনা মাত্র। আজ আমরা জানি কতদূর সঙ্গত কারণে মহাপাষণ্ড হোসেন কুলি খাঁর হত্যা হইয়াছিল। এই হত্যা হইয়াছিল আলিবর্দি খাঁর বেগমেরই আদেশে। আজ আমরা জানি মিরন ও সরফরাজ খাঁর অনুষ্ঠিত অনেক অন্যায় কাজই সিরাজের ঘাডে চাপানো হইয়াছে। আজ আমরা জানি সিরাজ ভীরু কাপুরুষ ছিল না, তাহার প্রধান অপরাধ ছিল ইংরাজবিদ্বেষ। পলাশীর শিবিরে সে নাচগান সুরাপান ও রমণীর সাহচর্যে রাত্রি কাটায় নাই। সে চক্রান্তকারীদের মত দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন ছিল না—কুটিলতা অভ্যাস করিবার অবসর সে পায় নাই। তাহার সারল্য ও তথাকথিত আপন জনে গভীর বিশ্বাসই তাহার সর্বনাশের মূল। সে সুরাপায়ী ছিল বটে, কিন্তু সরফরাজের মতন নয়। তাহার অত্যাচারে "সতীত্ব রতন বঙ্গের ভাণ্ডারে

থাকিবে না” এ কথার কোন মূল্য নাই। “বঙ্গবাসী কেমনে রাখিবে ধন রাখিবে জীবন” একথাও সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। বঙ্গবাসীর ধনপ্রাণ সত্যসত্যই বিপন্ন হইয়াছিল আলিবর্দির সময়ে বর্গীর উপদ্রবে—হিন্দুরই উপদ্রবে। সিরাজের রাজত্বে ধনপ্রাণ নিরুপদ্রবেই ছিল।

আজ আমরা ইতিহাসের মারফতে এসব কথা জানি বলিয়া পলাশীর যুদ্ধের কবিত্বরস উপভোগ করিতে গিয়া পদে পদে আঘাত পাই। নবীনচন্দ্রও যে এসব কথা একেবারেই জানিতেন না তাহা মনে হয় না। কিন্তু তাঁহার কাব্যের আদর্শ রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল—একটি শয়তান, একটি কিং জন, একটি রিচার্ড। তাই লেখনীর অধিকাংশ মসীর ব্যয় হইয়াছে সিরাজচরিত্রের কলঙ্কলেপনে।

নবীনচন্দ্রের রচনার একটি দোষ তাঁহার আবেগোচ্ছ্বাসে অসংযম। এ জন্য বহু স্থানে আতিশয্য ও অতিভাষণ দোষ ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমসর্গের মন্ত্রণা সভার বাদানুবাদকেও আতিশয্য দোষদুষ্ট বলিয়াছেন—‘এই সভার কার্য্য আরও সংক্ষেপে সমাপ্ত হইতে পারিত। তাহাতে সর্গটি পুনরুক্তিদোষ হইতে মুক্ত হইত।’ দ্বিতীয় সর্গে যে আশা প্রশস্তি আছে, তাহাও আতিশয্যদোষে-দুষ্ট হইয়াছে, ইহার কতক অংশ হতভাগ্য সিরাজের কারাকক্ষে প্রেরণ করিলে ভালো হইত। বিশেষতঃ যে সুরে আশা-প্রশস্তি চলিতেছিল নিম্নলিখিত অংশে সংযমের অভাবে তাহার ক্রমভঙ্গ হইয়াছে—

ধর্ম্মাধিকরণে বসি নিম্ন কর্ম্মচারী—	উদরে জঠরজ্বালা গুরু কার্য্যভারে
অবনতমুখ—ওই হংসপুচ্ছধারী	বীরবর, বুঝিতেছে অনন্ত প্রহারে
মসীপাত্র সহ, প্রভু পদাঘাত ভয়ে,	যথা শাল বৃক্ষ করে, গিরি শিরোপরে
যুঝিল ত্রেতায় বীর অঞ্জনাতনয়ে	নীল সিন্ধু সহ। ভবি সুগ্রীব বানরে
ঘর্ম্মসহ অশ্রুবিন্দু বহে দর দর	ভাবিতেছে এই পদ ত্যজিবে সত্বর ইত্যাদি।

ব্রিটিশ রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব মূর্তিমতী দৈববাণীর মত। তাহার মুখের উক্তি দৈববাণীর মত সংক্ষিপ্ত হওয়াই উচিত ছিল। পলাশীর শিবিরে লালসাবিলাসের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহার সুসঙ্গতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অবশ্য ইহার সঙ্গতি দেখানো যায়, কিন্তু ইহাতেও আতিশয্য ঘটিয়াছে।

বাইরনের ‘নাইট বিফোর ওয়াটারলুর,’ অনুকরণ করিতে গিয়াই ইহা আঁকিয়াছেন, কি কবির অন্তর গভীর উদ্দেশ্য ছিল তাহা বলা যায় না। ইন্দ্রিয়াসক্তি ও ভোগাসক্তির ফলে এ দেশে মুসলমান নবাব ও বাদসাহদের পতন—নবীনচন্দ্র একথা বারবারই বলিয়াছেন। পাপ ও প্রায়শ্চিত্তকে পাশাপাশি দেখানোর জন্যই হয়ত কবি স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হইয়াছেন।

পলাশীতে প্রকৃতপক্ষে একটা রীতিমত যুদ্ধই হয় নাই—একটা গোলাগুলি লইয়া দাঙ্গা হইয়াছিল মাত্র। কবি ইহাকে একটা বড় যুদ্ধের মর্যাদা দিয়া খুব ঘটা করিয়া ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। রণভঙ্গে পলাতক সৈন্যদের উদ্দেশে মোহনলালের বক্তৃতা রঙ্গলালের পদ্মিনী-কাব্যের অনুকরণে রচিত। এই বক্তৃতা জ্বালাময়ী। ইহাও পুনরুক্তিবর্জ্জিত হইলে আরও জ্বলন্ত হইতে পারিত। যে ছন্দে কবি বক্তৃতা রচনা করিয়াছেন তাহা উদ্দীপনা

সৃষ্টির পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। সবচেয়ে আতিশয্য ও অভিভাষণদোষ ঘটিয়াছে অস্তগামী সূর্যের উদ্দেশে মৃত্যুশয্যায় বীর মোহনলালের বাগ্মিতায়। কবি তাঁহার সমস্ত উচ্ছ্বসিত বক্তব্যই মোহনলালের মুখেই বসাইয়াছেন। বীরপুরুষেরা সাধারণতঃ মিতভাষী হ'ন—বিশেষতঃ মৃত্যুশয্যায় এত বড় সুচিন্তিত বক্তৃতা কাব্যের নাটকীয় ধর্মের বিরোধী। এমন অনেক কথা মোহনলালের মুখে কবি বসাইয়াছেন যাহা প্রভুভক্ত মোহনলালের বলিবার কথা নয়। যে প্রভুভক্ত বেতনভুক মোহনলাল নবাবের পক্ষে অকপটভাবে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে—তাহার একটা নিজস্ব নৈতিক আদর্শ আছে। তাহার চরিত্রে ভাব-দ্বন্দ্ব ও পরস্পরবিরোধী আদর্শের আরোপ না করিলেই বোধ হয় ভালো হইত।

কবির জেতৃবিজিত সম্পর্ক সম্বন্ধে মিশ্র মনোভাব ছিল। ইংরাজজাতির প্রতি তাঁহার বিদ্বেষও ছিল, শ্রদ্ধাও ছিল। মুসলমানের রাজ্যহারক বলিয়া একদিকে শ্রদ্ধা রহিয়াছে, আবার হিন্দুব ভবিষ্যৎ চিবদিনের জন্য অন্ধকার হইয়া গেল বলিয়া ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষও রহিয়াছে। ইংরাজের কাছে কবি ন্যায়বিচারেবও প্রত্যাশা কবিতেছেন। সিরাজেব প্রতি বিদ্বেষ রহিয়াছে, পক্ষান্তরে সিরাজকে যাহারা সিংহাসন হইতে সরাইতে চায তাহাদের প্রতিও বিদ্বেষ বহিযাছে। এই সকলেব ফলে কবির চিত্তে যে মিশ্র মনোভাবেব সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতেই মোহনলালেব বক্তৃতায় মাঝে মাঝে অসামঞ্জস্য ঘটিযাছে। মনীষী কালীপ্রসন্ন ঘোষ কবির অসতর্কতার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া বলিয়াছেন—'এক গীতের মধ্যে আব এক গীত, এক বাগিণীব মধ্যে আব এক রাগিণী।' কবি যে উচ্চগ্রামে প্রত্যেক সর্গটিব সূত্রপাত করিযাছেন—সে উচ্চগ্রাম সমগ্র সর্গে রাখিতে পারেন নাই—'এক গীতেব মধ্যে অন্য গীত আনিযা'। মনেব আবেগ সংযত রাখিয়া তাহাকে যথাস্থলে প্রকাশ কবিবাব মত ধৈর্য কবির ছিল না। যখনই আবেগ উচ্ছলিত হইয়াছে, তখনই অগ্র-পশ্চাতে না চাহিযা তিনি তাহাব অভিব্যক্তিদান করিযা আবাব আখ্যানসূত্র লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন।

উপাখ্যানাংশ ও ঘটনাসমাবেশের প্রতি কবিব উপেক্ষাব জন্য বঙ্কিমচন্দ্র দোস ধরিযাছেন। গীতিকাব্য হইলেও এই ত্রুটিকে একেবারে উড়াইযা দেওযা যায় না। ঘটনার সমাবেশ আরও বাড়াইলে কবি অনেক কথা যাহা যথাস্থলে বলিতে পারেন নাই, তাহা বলিবার যথাযোগ্য সুযোগ পাইতেন, নবনব চিত্রাঙ্কনেরও অবকাশ পাইতেন। ঘটনাগুলিকে তিনি ২।৪টি কথাতেই শেষ করিয়াছেন। "নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।" এই একটি বাক্যের অন্তরালে একটি ঘটনা আছে। সেই ঘটনাটিতে একটি অপূর্ব চিত্র ফুটিয়া উঠিতে পারিত। কবি রণক্ষেত্রে সিরাজ মির্জাফরের সাক্ষাতের ঘটনাটিকে ঐ এক কথায় শেষ করিয়াছেন।

প্রজার বিরাগ, পরে পলাশিসমর পরাজয়, পলায়ন, ধৃত, কারাঘর।

এই দুই লাইনে পলাশি প্রান্তর হইতে সিরাজের কারাকক্ষবাসের শোচনীয় অবস্থা পর্যন্ত আভাসিত করা হইয়াছে। পলাশি সমরের পর ইংরাজ ও মির্জাফরের কথা না বলিলেও চলিত। কিন্তু সিরাজ-লুৎফউন্নিসার কথাই ছিল এখানে কাব্য-রসসৃষ্টির পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

কবি অন্য পুস্তকে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুসরণ করিয়াছেন। বাংলার কবিদের মধ্যে কেহ যদি মাইকেলের ছন্দের কিছু মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন তবে তিনি নবীনচন্দ্র। পলাশীর যুদ্ধ কাব্যখানি যদি নবীনচন্দ্র অমিত্রাক্ষরে লিখিতেন তাহা হইলে তাঁহার অবল্লিত আবেগের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইত। তিনি এই কাব্যরচনায় বাইরনের চাইল্ড হ্যারল্ডএর মত স্পেনসারিয়ান ষ্টানজা বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার ফলে রচনার প্রবাহ অনেক স্থলেই সাবলীল হয় নাই। মিল দেওয়ার প্রয়োজন হওয়ায় কবির আবেগ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ভাষা অনেক স্থলে দুর্বল, বিকৃত ও ব্যাকরণবিরুদ্ধ হইয়াছে। সাধারণতঃ মিলের জায়গাতেই ভাষার দোষ ঘটিয়াছে—নৃশংসকে নৃশংসয, পরাধীনাকে পরাধীনী, চন্দ্রমাকে চন্দ্রিমা, পর্ণকে পরিত করিতে হইয়াছে, এমন কি ন ণ ম এ মিল দিতে হইয়াছে।

কেবল বাইরনের নয়, পলাশীর যুদ্ধে অন্যান্য ইউরোপীয় কবিদের রীতিভঙ্গীরও ছায়াপাত দেখা যায়। কবি সে সমস্ত সুষ্ঠুভাবেই আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছেন। চক্রান্ত-সভার চক্রীদের বক্তৃতায় মিলটনকে, সামরিক শৌর্যের অভিব্যক্তিতে স্কটকে, কোন কোন স্তবকের শেষে উপনিবদ্ধ অর্থান্তরন্যাস, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি অলঙ্কারের পংক্তিগুলিতে পোপকে, আশা প্রশস্তিতে ক্যামবেলকে, সিরাজের স্বপ্নচিত্রে শেকস্পীয়ারকে এবং একাধিক স্থলে বাইরনকে মনে পড়ে। নবীনচন্দ্র অনেক স্থলে মাইকেলের বাচনভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন। ছত্র হইতে ছত্রান্তরে ভাবধারার প্রবাহ মাইকেলেরই অনুসৃতি।

কবি একটি চিত্র, দৃশ্য বা প্রসঙ্গের উদ্ঘাটনের পূর্বে অন্তরঙ্গীয় ও বহিরঙ্গীয় আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছেন, এই আবেষ্টনীসৃষ্টির রীতি কবি বিদেশী কাব্য হইতেই পাইয়াছেন। বহিরঙ্গীয় আবেষ্টনীর মধ্যে পারিপার্শ্বিক ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনী দুইই আছে। সিরাজের সর্বনাশ সাধনের জন্য শেঠের গৃহে ষড়যন্ত্র হইতেছে—ভারতের ভাগ্য বিপর্যয়ের মুহূর্ত আসন্ন। ভাগ্য-বিপর্যয়ের প্রধান পর্বই অনুষ্ঠিত হইতেছে শেঠের বাড়ীর অন্ধকারকক্ষে। ইহার উপযোগী প্রাকৃতিক আবেষ্টন—

"দ্বিতীয় প্রহর নিশি, নীরব অবনী
নিবিড় জলদাবৃত গগনমণ্ডল।
বিদারি আকাশতল, যেন দুষ্ট ফণী
খেলিতেছে থেকে থেকে বিজলী চঞ্চল।
*　　　*　　　*
গভীর গর্জন শব্দে কাঁপিছে অবনী
দ্বিগুণ ভীষণতরা হতেছে যামিনী।"

ভীষণ অন্ধকারে বিভীষিকা মূর্তি দৃষ্ট হইতেছে—
সমাধি করিয়া যেন বদনব্যাদান, নির্গত করেছে শব বিকটদশন

ধরা যেন বোধ হয় প্রকাণ্ড শ্মশান— নাচিছে ডাকিনী করে উলঙ্গকৃপাণ।
ধরিয়া বঙ্গের গলা কাল নিশীথিনী নীরবে নবাবভয়ে করিছে রোদন।

আর পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী, শেঠের ভবনে—

একটি কপাট কোথা নাহি অনর্গল। একটি প্রদীপ কোথা জ্বলে না এখন।
তিমিরে অদৃশ্য গৃহ প্রাচীর প্রাঙ্গণ। বোধহয় ঠিক যেন বিরল নির্জন।

আর যে গৃহে চক্রীরা উপবিষ্ট সে গৃহে—

প্রাচীরে চিত্রিত পটে নৃমুণ্ডমালিনী লোলজিহ্বা অট্টহাসি ভৈরবভামিনী।

আর মানসিক পরিবেষ্টনী—

রাখিয়া দক্ষিণ করে দক্ষিণ কপোল বসি অবনত মুখে বীর পঞ্চজন।
বহে কি না বহে শ্বাস চিন্তায় বিহ্বল কুটিল ভাবনাবেশে কুঞ্চিত নয়ন।
অনিমেষ নেত্রে কষ্টে যেন একমনে পড়িছে বঙ্গের ভাগ্য অঙ্কিত পাষাণে
বিধির অস্পষ্টাক্ষরে, কিংবা চিত সনে প্রাণ যেন আরোহিয়া কল্পনা-বিমানে,
সময়ের যবনিকা করি উদ্ঘাটন, বঙ্গ-ভবিষ্যৎ-সিন্ধু করে সন্তরণ।

কবি প্রকৃতির সহিত মানব মনের সংযোগে যে রসের সূত্র পাইয়াছেন, তাহাও বিদেশী সাহিত্য হইতে। দিবা-অবসানে ব্রিটিশসৈন্যদের মনে তাহাদের ঘরসংসারপরিজন প্রিয়জনদের স্মরণে বিষাদের ছায়াপাত হইতেছে পলাশীর পথে। কবি এখানে চমৎকার মানসিক আবষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার—

পলাশীপ্রান্তরে প্রভাত হইতেছে—

পোহাইল বিভাবরী পলাশীপ্রাঙ্গণে— পোহাইল যবনের সুখের রজনী।
চিত্রিয়া যবনভাগ্য আরক্ত গগনে উঠিলেন দুঃখভরে ধীরে দিনমণি।
শান্তোজ্জ্বল কররাশি চুম্বিয়া অবনী প্রবেশিল আম্রবণে, প্রতিবিম্ব তার
শ্বেতমুখশতদলে ভাসিল অমনি ক্লাইভের মনে হ'ল স্ফূর্তির সঞ্চার।
সিরাজ স্বপ্নান্তে রবি করি দরশন ভাবিল এ বিধাতার রক্তিম নয়ন।

ক্লাইভের সম্মুখে রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব, স্বপ্নে নিহত ব্যক্তিদের প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব ইত্যাদি ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে সংক্রামিত। কল্পনাকে মাঝে মাঝে আহ্বান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যে সঙ্গ প্রার্থনাও পাশ্চাত্য সাহিত্যের পদ্ধতির অনুসৃতি।

'পলাশীর যুদ্ধে' নবীনচন্দ্রের অঙ্কিত চিত্রগুলি অপূর্ব। শেঠভবনের মন্ত্রণাসভার চিত্র, বৃটিশরাজলক্ষ্মীর চিত্র, ক্লাইভের ব্যক্তিত্বের চিত্র, নবাবের পলাশীশিবিরে লালসাময় রভস-চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানসচিত্র অঙ্কনেও কবির কৃতিত্ব যথেষ্ট। ক্লাইভের মানসচিত্র ও সিরাজের মানসচিত্র অপূর্ব ভাবেই অঙ্কিত—আশানৈরাশ্যের সিত ও অসিত বর্ণে অভিরঞ্জিত।

'পলাশীর যুদ্ধে' তিনটি চরিত্র কবির শ্রদ্ধার্ঘ্য লাভ করিয়াছে। রাণীভবানী ও মোহনলাল এই দুই জনের মুখে নিজের প্রাণের কথার অভিব্যক্তি দান করিয়া কবি তাঁহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন

করিয়াছেন। আর ক্লাইভের দেহে তার মানসপ্রতিবিম্বের চিত্রণ করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করিয়াছেন।

শিবিব অনতিদূরে বসি তরুতলে নীরব ক্লাইভ। মগ্ন গভীর চিন্তায়
গম্ভীর মুখশ্রী কিন্তু বদনমণ্ডলে নাহি সুরূপের চিহ্ন। মনোহারিতায়
নাহি রঙ্গে শ্বেতকান্তি, অথচ যুবার সবাঙ্গ সৌষ্ঠবময়। প্রশস্ত ললাট
বীরত্বের রঙ্গভূমি, জ্ঞানের আধার। বক্ষঃস্থল যেন যমপুরীর কপাট
প্রশস্ত সুদৃঢ়। বহে তাহার ভিতব দুরাকাঙ্ক্ষা, দুঃসাহস স্রোত ভযঙ্কব।
যুগল নয়ন জিনে উজ্জ্বল হীরক আভাময। অন্তর্ভেদি তীব্র দৃষ্টি তাব
স্থির অপলক দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক। যে অসম সাহসাগ্নি হৃদযে তাঁহাব
জ্বলে, যথা অগ্নিগিরি অন্তঃস্থ অনল প্রদীপ্ত নযনে সদা প্রতিভা তাহাব।
ভুবনবিজয়ী জ্যোতি ববষে গরল শত্রুর হৃদয়ে—

ব্রিটিশবাজলক্ষ্মীর ববপুত্রের ভুবনবিজযী বিক্রমেব সম্মুখে কবিব শীর্ষ যেন অবনত হইযা পডিযাছে। বাজলক্ষ্মী এই বিলাতী বাবব ছাডা আর কাহার কাছে আবির্ভূত হইবেন ?

পলাশীর যুদ্ধে কবির আলঙ্কাবিকতাও উপেক্ষণীয নয। নিম্নলিখিত চরণগুলির আলঙ্কাবিকতা লক্ষণীয।

১। নিমীলিত নেত্রদ্বয মুখশ্রী গম্ভীব পডেছে করাল ছাযা চৌষট্টি কলায।
নিবখিযা যেই চন্দ্র নেত্র পাদ্মনীব হ'ত উন্মীলিত, আজি বাহুগ্রস্ত হায।*

ভাবতচন্দ্রের বচিত অন্নদামঙ্গলেব মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুণবর্ণনা পডিলে এই অংশেব আলঙ্কাবিকতা বোধগম্য হইবে।

২। কে চাহে পশুত্ববলে রমণীপ্রণয অনলে কে চাহে জল, পাষাণে হৃদয়।

৩। ছুটিল শোণিত তিতি বদনমণ্ডল
শোভিল রক্তচন্দনে সোনাব কমল।

৪। প্রিয়ে কেরোলাইনা আমার
যেই প্রেম অশ্রুরাশি আজি অভাগাব
ঝরিতেছে নিববধি তরল না হত যদি
গাঁথিতাম সেই হাব তব উপহাব
কি ছার ইহার কাছে গোলকুণ্ডা হার।

---

*চন্দ্রে সবে ষোলকলা হ্রাসবৃদ্ধি তায়
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়।
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেবে দেখিলে
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মেলে।

৫। তুচ্ছ এক কোহেনুর মুকুটে আবার
পরিবে ইংলণ্ডেশ্বরী তৃতীয় নয়ন
উমার ললাট যেন।

৬। সন্দেহ, হইত কিনা রাবণ ঘৃণিত
রামের ছায়ায় যদি না হ'ত চিত্রিত।

৭। মৃতদেহ নিপীড়িত শুষ্ক তৃণদল
কিছুদিন পরে পুনঃ পাবে নব বল।
এবে মৃত দেহতলে, বৎসর অন্তরে
জনমিবে পুনর্বার তাদের উপরে। (অনূদিত)

৮। সিরাজ স্বপ্নান্তে করি রবিদরশন
ভাবিল এ বিধাতার রক্তিম নয়ন।

৯। নীরবে শিবিরশ্রেণী শোভিছে কেবল
ধবল বালুকাস্তূপ যথা সিন্ধুতীরে
অথবা গোগৃহক্ষেত্রে যেমতি কৌরব
সম্মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ অটল নীরব।

১০। ওই হংসপুচ্ছধারী
বীরবর, খুঁজিতেছে অনন্ত প্রহারে
মসীপাত্রসহ, প্রভু পদাঘাত ভয়ে।
যথা শালবৃক্ষ হাতে, গিরি শিরোপরে
যুঝিল ত্রেতায় বীর অঞ্জনাতনয়
নীলসিন্ধু সহ, ডরি সুগ্রীব বানরে।

এই শ্রেণীর অলঙ্করণ মাইকেলেরই অনুসৃতি।

রৈবতক

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন যখন কায উপলক্ষে গিরিব্রজপুরে (জরাসন্ধের রাজধানী রাজগিরি) বাস করিতেছিলেন, তখন মহাভারত পাঠ করিয়া স্থানমাহাত্ম্যে আবিষ্ট হইয়া তিনি এই কাব্যগ্রন্থ রচনা করিবার প্রেরণা পান। রৈবতক তাঁহার 'ত্রয়ী' কাব্যের প্রথম গ্রন্থ। এই কাব্যের প্রধান রসসূত্র সুভদ্রাচরিত্র। উৎসর্গপত্রে কবি যদি স্থানের কথা উল্লেখ না করিতেন তাহা হইলে আমরা ভাবিতাম পুরীধামে অবস্থানকালে বোধহয় কবি এই সুভদ্রা-কাব্যখানি রচনার প্রেরণা পাইয়াছেন।

ইংরাজি শিক্ষায় নবীনচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি মার্জিত হইয়াছিল, গীতা পাঠ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের মহাবাণীর সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসও তাঁহার অধ্যয়ন করা ছিল—সেকালের অন্যান্য উচ্চ শিক্ষিতদের মত মিল, বেন্থাম, কোঁৎ, স্পেন্সার ইত্যাদির ধর্মনীতি তাঁহারও অধিগত ছিল। এইভাবে প্রস্তুত মতিবুদ্ধি লইয়া তিনি মহাভারত পড়িয়াছিলেন। তাহার ফলে মহাভারতীয় উপাখ্যানের একটা বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। তিনি কবি ছিলেন বলিয়াই এই ব্যাখ্যাকে মহাকাব্য-রূপ দিতে প্রলুব্ধ হন। কবি না হইলে তিনিও বঙ্কিমচন্দ্রের মত আর একখানি কৃষ্ণচরিত্র রচনা করিতেন। এই কাব্যখানির নিজস্ব রসৈশ্বর্য বিশেষ কিছু না থাকায় ইহার পক্ষে ঐ ব্যাখ্যাটাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। ইতিহাস আলোচনায় তিনি বুঝিয়াছিলেন—মহাভারতের সময়ের অল্পকাল আগেই আর্যগণ অনার্যদের রাজ্যচ্যুত করিয়া ভারতভূমিতে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। অনার্যেরা লোকালয় ত্যাগ করিয়া পাহাড়জঙ্গলে আশ্রয় লইলেও তখনও তাহাদের মনে হৃতরাজ্য উদ্ধারের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই বিদ্যমান ছিল। সুযোগ পাইলে তাহারা আর্যরাজ্যে দস্যুতা ও লুণ্ঠন করিয়া পাহাড়জঙ্গলে পলাইয়া যাইত। তাহাদের সংঘবদ্ধ হইবার সুযোগ ছিল না। অনেক সময় তাহারা আর্যদের উচ্চশ্রেণীর অস্ত্রে প্রাণ হারাইত।

নবীনচন্দ্র এই অনার্য জাতিকে বলিয়াছেন নাগজাতি। ইহারা নাগ-উপাসক ছিল বলিয়া ইহাদের নাগ বলা হইত, নবীনচন্দ্রের ইহাই অভিমত। পুরাণে যেখানে যেখানে তিনি নাগ পদটি পাইয়াছেন সেখানে সেখানে তিনি নাগশব্দের দ্বারা অনার্য-জাতিবিশেষকেই বুঝিয়াছেন। (মথুরা-আক্রমণকারী কালযবনকে বাদ দিলেন কেন?) নাগজাতি যে রাজ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকিত তাহাকে কবি বলিয়াছেন পশ্চিমসমুদ্রতীরবর্তী পাতালরাজ্য। নিম্নভূমিতে অবস্থিত বলিয়া এই রাজ্যের নাম কবির মতে পাতাল। বাসুকিকে এই রাজ্যের রাজা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন।

মথুরার রাজা কংস নাগরাজ্য অধিকার করিয়া নাগদের উপর অকথ্য উৎপীড়ন করিত। নাগেরাও ব্রজমণ্ডলে উপদ্রব করিত। অত্যাচারী কংসের মৃত্যুসম্বন্ধে দৈববাণী হইয়াছিল—তাহার ভগিনী দৈবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তাহাকে বধ করিবে। কবি বলেন,—এই দৈববাণী বাসুকির পিতা অনন্ত নাগ শুনিয়াছিল। কংস তাহার ভগিনী ও ভগিনী-

পতিকে কারাগৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল এবং তাহাদের প্রত্যেক সন্তানটিকে হত্যা করিল। অনন্ত নাগ অষ্টম গর্ভের সন্তান শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া গোকুলে রাখিয়া আসে তাঁহার দ্বারা বৈরনির্য্যাতন হইবে এই ভরসায়। নবীনচন্দ্র এই পৌরাণিক কাহিনীটিকে অনার্য জাতির কার্য্যসিদ্ধির একটী কৌশল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তারপরে কংসবধের মূলে নাগজাতির মথুরা আক্রমণ কল্পনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন কিশোরবয়স্ক তখন বাসুকি এক দিন গোকুলে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কংসবধে উৎসাহিত করিয়া বলিল—"আর গোরু চরাইয়া কালক্ষেপ করিও না। মাতাপিতা কংসকারাগারে বন্দী, তাহাদের উদ্ধার কর। আমি দশসহস্র নাগসৈন্য লইয়া তোমার সঙ্গে চলিব।" শ্রীকৃষ্ণ নাগসৈন্যের সহায়তা পাইয়া মথুরা আক্রমণ করিয়া কংসবধ করিলেন। ইহা নবীনচন্দ্রেরই পরিকল্পনা।

নবীনচন্দ্র পৌরাণিক কাহিনীকে একটা ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত করিতে চাহেন। তাই সহায়সম্বলহীন দুইটি গোপবালককে দিয়া দোর্দণ্ড প্রতাপ কংসরাজের বধসাধন করানো অসম্ভব মনে করিয়াছেন। তাহা ছাড়া সমস্তের মধ্যেই আর্য অনার্যের দ্বন্দ্ব জড়িত করিয়াছেন। "দুইটি গোপবালক আসিয়া বিনাযুদ্ধে সভামধ্যে মথুরাধিপতিকে বিনষ্ট করিবে"—বঙ্কিমচন্দ্রও তাহা বিশ্বাস করেন নাই। তিনি মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের একটি উক্তি হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "কংসবধের পূর্ব হইতে কৃষ্ণবলরাম মথুরাতে বাস করিতেন। উপদ্রুত যাদবগণ রামকৃষ্ণের বলাধিক্য দেখিয়া তাঁহাদিগকে নেতৃত্বে স্থাপন করিয়া কংসের বধ-সাধন করিয়াছিলেন।" (কৃষ্ণচরিত্র)। মথুরা অধিকৃত হইলে শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনকে রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন—বাসুকি নাগসৈন্যের সহায়তার পুরস্কারস্বরূপ ঐ রাজ্য চাহিল। আর্য শ্রীকৃষ্ণ অনার্যকে রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন না। বাসুকি সুভদ্রাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহাতেও সম্মত হইলেন না। রাজা হইলেও বন্য বর্বরের হস্তে আর্য্যকন্যা সমর্পণ করা চলে না।

শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ উগ্রসেনের নামে মথুরায় নিজেই রাজা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নাগ-রাজ বাসুকির আক্রোশ থাকিয়া গেল। মগধরাজ জরাসন্ধের জামাতা ছিল কংস। কংসবধের প্রতিহিংসাসাধনের জন্য জরাসন্ধ বারবার মথুরা আক্রমণ করায় শ্রীকৃষ্ণ মথুরা ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় রৈবতক শৈলের পাদমূলে সমুদ্রতীরে নূতন রাজ্য গঠন করিলেন। এবং রৈবতকে একটি অজেয় দুর্গও নির্মাণ করিলেন। এই সমস্ত কথা মহাভারতেরই অনুগত।

নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র দুইজনেই বলেন—শ্রীকৃষ্ণ আত্মরক্ষা বা আত্মকুলরক্ষার জন্য মথুরা ত্যাগ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—"শ্রীকৃষ্ণ অনর্থক মানবহত্যার নিতান্ত বিরোধী। সর্বভূতে দয়াময় কৃষ্ণ প্রাণিহত্যার পক্ষে ধর্ম ও প্রয়োজনীয় ব্যতীত অনুরাগ প্রকাশ করেন না।" নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন—'দেখিলাম শেষে বৃথা শোণিতের স্রোতে কালের প্রবাহে জীবনের ব্রত মম যেতেছে ভাসিয়া।' নবীনচন্দ্রের মতে রৈবতক নাগরাজ্যের নিকটেই অবস্থিত। এখানে আসার পর নাগদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রায়ই সংঘর্ষ ঘটিত।

বাসুকি বৈরিনির্যাতনের জন্য কৌশলের সন্ধান করিতে লাগিল, সে সহায় পাইল দুর্বাসা'কে। পৌরাণিক উপাখ্যানে দেখা যায়—আধিপত্য লইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে অনেক সময়ে সংঘর্ষ ঘটিত। নবীনচন্দ্র ব্রাহ্মণদের ক্ষত্রিয়বিদ্বেষের ধারাটীকে মহাভারতের যুগ পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছেন দুর্বাসার মারফতে। দুর্বাসা কথায় কথায় ক্ষত্রিয় রাজাদের অভিশাপ দিতেন। রাজারা সকলে তাঁহাকে ভয় করিত। সেজন্য কবি দুর্বাসাকে ক্ষত্রিয়বিদ্বেষী রূপে কল্পনা করিয়াছেন।

জরৎকারু ঋষি ছিলেন বাসুকির ভগিনীপতি। নবীনচন্দ্র এই জরৎকারু ও দুর্বাসাকে অভিন্ন কল্পনা করিয়াছেন। মহাভারতের যুগে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য হইয়াছিল খুব বেশী—ক্ষত্রিয়প্রাধান্যের যুগে রাজাদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার মাত্রা খুব বাড়িবারই কথা। নবীনচন্দ্র দেখাইয়াছেন—ভারতের ক্ষত্রিয় রাজারা সেকালে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয়ের প্রধান সহায় হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা কল্পনামাত্র নয়, ইহা মহাভারতীয় সত্য। তাহারা ধর্ম-শাস্ত্রের মর্য্যাদাও রক্ষা করিত না—ফলে, ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যও তাহারা অস্বীকার করিত। এজন্য ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় রাজাদের পতন কামনা করিত। তাহাদের ক্ষত্রিয়বিদ্বেষ এত বেশি যে তাহারা বরং অনার্য নাগজাতির রাজত্ব সহ্য করিতে রাজী, তবু আর্য ক্ষত্রিয়ের রাজত্ব চাহিত না। সব যুগেই ভারতবর্ষে কতকগুলি লোকের এই মনোভাব বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষে স্বজাতিবিদ্বেষ এমনই মজ্জাগত! রাজারাও আধিপত্য লইয়া পরস্পর মারামারি করিত, তাহাকে ব্রাহ্মণরা রাজাদের সর্বনাশসাধনে একটা সুযোগ বলিয়াই মনে করিত, চিন্তা করিত কিরূপে কণ্টকের দ্বারা কণ্টকের উদ্ধার হইবে।

কবি বলিয়াছেন—এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের প্রতিনিধি দুর্বাসা। দুর্বাসার প্রধান অস্ত্র ছিল অভিশাপ। নবীনচন্দ্র এই অভিশাপের উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই—কারণ, তাহা কবির বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সহিত সুসমঞ্জস নয়। কবি দুইটি উপায়কে দুর্বাসার পরিকল্পনার মধ্যে স্থান দিয়াছেন। একটি উপায়—ভিন্নভিন্ন ক্ষত্ররাজকুলের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দেওয়া, আর একটি রাজ্যচ্যুত নাগদের সহায়তাগ্রহণ।

দুর্বাসা এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাসুকিকে বুঝাইলেন, ব্রাহ্মণের রাজ্য চাই না—তাহারা চায় ধর্মের উদ্ধার। তুমি চাও রাজ্য, ক্ষত্রিয় রাজারা ব্রাহ্মণ ও অনার্য দুইএরই শত্রু। অতএব এস মিলিত হই, আমার বুদ্ধিবল ও যোগবল, আর তোমার পশুবল দুই মিলিত হইলে ভারতে মহাশক্তিশালী অনার্য রাজ্য স্থাপিত হইবে।

> নিষ্পেষণী যন্ত্রে যথা করে নিষ্পেষিত
> দুই শিলা মধ্যস্থিত তণ্ডুলনিচয়,
> আইস ব্রাহ্মণ আর অনার্য শিলায়
> মধ্যস্থ ক্ষত্রিয়জাতি পিষিয়া তেমন
> নূতন ভারতরাজ্য করিব সৃজন।

তোমরা অনার্যজাতি যুদ্ধব্যবসায়ী
নহ ভীত রণে বনে অস্ত্রসঞ্চালনে।
লও ক্ষত্রিয়ের স্থান। হইলে চালিত
ব্রাহ্মণের মন্ত্রণায় অনার্যের অসি,
ব্রাহ্মণ মস্তিষ্ক সহ হইলে মিশ্রিত
অনার্যের ভুজবল, হইবে নিহত
বর্বর ক্ষত্রিয়জাতি তৃণরাশি মত।”

দুর্বাসা বাসুকির ভগিনী জগৎকারুকে বিবাহ করিয়া একদিকে অনার্য্যদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করিল, অন্যদিকে ব্রাহ্মণের পক্ষে চরম উদারতার পরিচয় দিল। পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে বিবাদ বাধাইবার জন্য দুর্বাসা বলরামকে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। সুভদ্রা অর্জ্জনের অনুরাগিণী জানিয়াও দুর্যোধনকে সুভদ্রা দান করিবার জন্য বলরামকে পরামর্শ দিয়া আসিল। দুর্যোধন ছিল বলরামের গদাযুদ্ধে শিষ্য ও প্রীতিপাত্র। দুর্বাসা দুর্যোধনকেও সুভদ্রার পাণিপ্রার্থী হইবার জন্য উপদেশ দিয়া আসিল। এদিকে এই ব্যাপার লইয়া অর্জ্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিবে—ইহাও দুর্বাসা আশা করিয়াছিল। ইহাতে ঘরে বাহিরে ভীষণ সমর যে বাধিবে সে বিষয়ে দুর্বাসার সন্দেহ ছিল না। বলা বাহুল্য, কবি ভদ্রার্জ্জুনবিবাহেও দুর্বাসাকে টানিয়া আনিয়াছেন কাব্যের মূলসূত্র রক্ষা করিবার জন্য। দুর্বাসা আনুষ্ঠানিক আচারসর্বস্ব যাগযজ্ঞবহুল বৈদিক ধর্মের সমর্থক। শ্রীকৃষ্ণের ধর্মমত স্বতন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ একেশ্বরবাদী—এক নারায়ণই উপাস্য তাঁহার মতে। শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক দেবদেবীর পূজা, ব্রাহ্মণপ্রাধান্য, যাগযজ্ঞ, জীববলি, জড়পদার্থের (সূর্য্য-চন্দ্রাদির) উপাসনা, অদৃষ্টবাদ, জাতিবিচার, সকাম আরাধনা, প্রেমহীন অনুষ্ঠানপরম্পরা, আচারসর্বস্বতা ইত্যাদির বিরোধী। তাঁহার কাছে আর্যে অনার্যে ভেদ নাই—তিনি বিশ্বমানবতার প্রতিষ্ঠাতা, নিষ্কাম ধর্মের প্রবর্তক। তাঁহার ধর্মমতে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য নাই—কোন কুলবিশেষ বা জাতিবিশেষ তাঁহার লক্ষ্য নয়। এজন্য দুর্বাসা শ্রীকৃষ্ণের প্রধান শত্রু। ইহা ছাড়া, কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছিল—ইহা দুর্বাসার অসহ্য। কেবল ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া নয়—ব্রাহ্মণবিদ্বেষী নবধর্মমতের প্রবর্তক বলিয়া দুর্বাসার কৃষ্ণবিদ্বেষ মজ্জাগত। বাসুকির কৃষ্ণবিদ্বেষ এত প্রবল নয়।

বাসুকি শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলে বলরাম যখন বাসুকিকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তখন তাহাকে বাঁচাইয়া দেন। তাহা ছাড়া, কৃষ্ণ আর্য রাজা হইলেও তাঁহার অনার্যগণের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছিল না। তিনি আর্য্যদের প্রচলিত যাগযজ্ঞবহুল আচারসর্বস্ব ধর্মের বিরোধী। অনার্যদের যথাযোগ্য প্রাপ্য হইতে তিনি বঞ্চিত করিতে চান না। তিনি আর্য্য ও অনার্যের মিলনে নূতন ভারতবর্ষ গড়িতে চান। বাসুকি শ্রীকৃষ্ণের নবপ্রবর্তিত ধর্মের কথা ভাল করিয়া বুঝিত না বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম যে প্রেমের ধর্ম—তাহাতে মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ নাই, ইহা সে বুঝিত। এজন্য তাহার মনে কৃষ্ণবিদ্বেষ

খুব প্রবল নয়। অথচ আর্যদের একজন প্রবলপরাক্রান্ত নৃপতি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাসুকির মহাবৈরী।

মাঝে মাঝে বাসুকির সংকল্পে শৈথিল্য আসে—তখন দুর্বাসা বাক্যজালের দ্বারা এবং যুক্তির দ্বারা বাসুকিকে উত্তেজিত করে। ইহাতেও ফল না হইলে যোগবলের বিভূতি ও ইন্দ্রজাল দেখায়। কবি ইহাকেই যথেষ্ট মনে না করিয়া বাসুকির চিত্তে সুভদ্রার প্রতি প্রবল আকর্ষণ আরোপিত করিয়াছেন। সুভদ্রার জন্য বাসুকির কৃষ্ণবিদ্বেষ দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। বাসুকি এজন্য ভগিনী শৈলজাকে পুরুষের ছদ্মবেশে রৈবতকে পাঠাইল—শৈলজা রৈবতকে গিয়া বালকভৃত্যরূপে অর্জ্জুনের সেবা করিতে লাগিল। সে বাসুকিকে সুভদ্রাহরণের সুযোগ জানাইয়া দিল--বাসুকির সে চেষ্টা বিফল হইল। এদিকে শৈলজা ক্রমে অর্জ্জুনের প্রতি গভীর ভাবে প্রেমাসক্ত হইয়া পড়িল। ফলে, তাহার দ্বারা অন্য কোন অনিষ্ট হইল না। বরং দুইদুইবার অর্জ্জুনের প্রাণরক্ষা হইল। অর্জ্জুন শৈলজার পিতৃহন্তা। বালিকা-শৈলজার দুগ্ধের জন্য তাহার পিতা ইন্দ্রপ্রস্থে ধেনু হরণ করিতে গিয়া অর্জ্জুনের শরে নিহত হয়। শৈলজা আসিয়াছিল প্রতিহিংসা-সাধনের জন্য, কিন্তু অর্জ্জুনেব প্রেমে সে আত্মহারা হইয়া গেল। বাসুকির সহোদরা জরৎকারু দুর্বাসার নামেমাত্র পত্নী, তাহার চিত্তও শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত। কেবল দুর্বাসার তুষ্টিবিধান ছাড়া তাহার দ্বারা বাসুকির কোন কার্যসিদ্ধি হইল না। দুর্বাসার ষড়্‌যন্ত্র ব্যর্থ হইল, অর্জ্জুন সুভদ্রা হরণ করিয়া চলিয়া গেল। দুর্য্যোধনের সুভদ্রা লাভ হইল না। ইহাতেই রৈবতকের সমাপ্তি। দুর্য্যোধনের সুভদ্রা লাভ হইল না বটে, কিন্তু দুর্যোধনের মনে পাণ্ডববিদ্বেষের বহ্নি বহু শিখায় জ্বলিয়া উঠিল। কেবল সুভদ্রা লাভ হইল না বলিয়া নয়, পাণ্ডব ও যাদবগণের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইল বলিয়া দুর্যোধনের আক্রোশ বাড়িয়া গেল। দুর্বাসার ইহাই লাভ। নবীনচন্দ্র এই ভাবে আর্য অনার্যের সংঘর্ষ রৈবতকে দেখাইয়াছেন।

* * * *

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলায় নবীনচন্দ্র মধুররসকে একেবারে বাদ দিয়াছেন। প্রকৃত বৈষ্ণবেব কৃষ্ণ রৈবতকে নাই। কিশোরবয়স্ক শ্রীকৃষ্ণেব পক্ষে রমণীদের সঙ্গে প্রেমলীলা স্বাভাবিক নয় বলিয়া কবি প্রেমলীলা বর্জন করিয়াছেন। রাস, দোল, ঝুলন ইত্যাদিকে সার্বজনীন উৎসব বলিয়াই গণ্য করিযাছেন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে বাস তাঁহার অজ্ঞাত বাস মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম যখন দশ বছর, তখন যদুকুলপুরোহিত গর্গ একদিন আসিয়া বলিলেন—"তব পরিণাম বৎস নহে গোচারণ, তুমি মহত্তর ব্রতের বন্য আবির্ভূত। সমগ্র মানবজাতি গোপাল তোমার।" তার পর তিনি যমুনার জলে শ্রীকৃষ্ণকে দীক্ষা দিলেন, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আত্মচৈতন্যের উদয় হইল। তিনি মহর্ষি গর্গের আশ্রমে শাস্ত্র ও শস্ত্রে শিক্ষা লাভ করিলেন। পুরাণে আছে, কংসবধের পর রাম ও কৃষ্ণ কাশীতে সান্দীপন (সন্দীপন নয়) মুনির কাছে অধ্যয়ন করিয়া ৬৪ দিনে সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা সম্ভব মনে করেন নাই। তিনি বলেন—মহাভারতে উক্ত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ দশ বৎসর হিমালয়পর্বতে তপস্যা

করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই তপস্তাকেই শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন মনে করেন। ইহা অবশ্য কংস-বধের পর। নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাসের শিষ্য কল্পনা করিয়াছেন এবং কংসবধের পর তিনি ব্যাসের আশ্রমে, সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন—এ কথা তিনি কুরুক্ষেত্র কাব্যে বলিয়াছেন। রণবিদ্যায় তিনি এমনই বিশারদ হইলেন যে অঘাসুর, বকাসুর, মেঢ্রাসুর, প্রলম্ব ইত্যাদি কংসচরগণকে হেলায় বধ করিলেন—গোপগণের ধেনুচোর কালীয়নাগকে দমন করিলেন। একদিন তাঁহার মনে হইল—

একই মানব সব, একই শরীর
একই শোণিতমাংস, ইন্দ্রিয় সকল
জন্ম-মৃত্যু একরূপ, তবে কি কারণ
নীচ গোপজাতি, আর সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ
চারিবর্ণ চারি ভেদ দেবতা তেত্রিশ,
নিরমম জীবঘাতী যজ্ঞ বহুতর ?

এই ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার দিব্যজ্ঞান জন্মিল—এক নারায়ণই পূজ্য—যিনি

প্রকৃতিব পুরুষেব মহাসম্মিলন
একমেবাদ্বিতীয়ম্, পূর্ণসনাতন।

তাবপবে তিনি গোবর্ধনে ইন্দ্রপূজা বহিত কবিযা নাবাযণেব পূজা প্রতিষ্ঠিত কবিলেন। ইন্দ্রপূজা জড়শক্তিব পূজা, তাহাব বদলে গিবিযজ্ঞ করিয়া সর্বভূতেব সেবা ও সকলকে অন্ন-দানই পবম ধর্ম বলিয়া প্রচাব কবিলেন।

"দিযা গোবর্ধনে নানা অন্ন উপহাব।
কর বিতবণ তাহা ব্রাহ্মণে চণ্ডালে।"

ইহাই গোবর্ধনধাবণ।

তাবপর হইতে গোপগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরজ্ঞানে প্রেমভক্তি ও স্নেহবাৎসল্যে উপাসনা করিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাব সঙ্গে ইহার বেশ মিল আছে—"এই জগতেব একই ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই। ইন্দ্র বলিয়া কোন দেবতা নাই। যিনি সর্বকর্তা, সর্বত্র বিধাতা তিনিই বৃষ্টির কারণ, বৃষ্টির জন্য একজন পৃথক বিধাতা কল্পনা করা বা বিশ্বাস করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ যাহা পরিণত বয়সে প্রচারিত করিয়াছেন গিরিযজ্ঞে তাহার প্রবর্তনায় প্রথম উদ্যম। যদি মেঘের বা আকাশের পূজা করিলে তাঁহার পূজা করা হয়, তবে পর্বত বা গোগণের পূজা করিলেও তাঁহারই পূজা করা হইবে। বরং আকাশাদি জড়পদার্থের পূজা অপেক্ষা দরিদ্রদিগের এবং গোবৎসের সপরিতোষ ভোজন করানো অধিকতর ধর্মানুগত। গিরিযজ্ঞের তাৎপর্য এইরূপ বুঝি।"

বলা বাহুল্য, নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র দুজনেই ভাগবতের সাহিত্যের মধ্যে ইতিহাস খুঁজিয়াছেন।

নাগরাজ বাসুকির সহিত ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের মৈত্রী জমিয়া উঠিল। কংসবধ ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ নাগসৈন্যের সাহায্যে মথুরা আক্রমণ করিয়া কংসবধ করিলেন।

কংসের শ্বশুর জরাসন্ধের বারবার আক্রমণের ফলে শ্রীকৃষ্ণ পরে দুর্বল হইয়া পড়িলেন— তখন বৃথা রক্তস্রোত বন্ধ করিবার মানসে মথুরা ত্যাগ করিয়া তিনি রৈবতক শৈলে দুর্গ নির্মাণ করিয়া স্বজনগণ (অন্ধক, বৃষ্ণি, ভোজ) এবং ষোড়শ সহস্র যোদ্ধার বিধবা নারীগণকে সেখানে আশ্রয় দিলেন। নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শসহস্র পত্নীর এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। মহাভারতে আছে, শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি দুরাচার নরককে বধ করিয়া তাঁহার ষোড়শসহস্র কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে গুলিখুরি গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। যাহাই হউক, এইখানেই রৈবতক কাব্যের সূত্রপাত।

দ্বারকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রৈবতকে রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়া গর্গনির্দিষ্ট মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে সংকল্প করিলেন। তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন কেবল অনাচার, অত্যাচার, অবিচার, ধর্মের গ্লানি, অধর্মের অভ্যুত্থান। ব্রাহ্মণের অযথা প্রাধান্য ধর্মের গ্লানির প্রধান অঙ্গ। দুর্বাসাকে উপেক্ষা করার জন্য দুর্বাসা অভিশাপ দিয়া গেল, 'যাদবকৌরবকুল হইবে বিনাশ।' শ্রীকৃষ্ণ এই অভিশাপকেও উপেক্ষা করিয়া বলিলেন :—

"ব্রাহ্মণের অত্যাচার। কথায় কথায়
অভিশাপ, অভিমান অঙ্গের ভূষণ।
শার্দুল যেমন ভাবে প্রাণিমাত্র সব
সৃজিত তাহার ভক্ষ্য। তেমনি ইহারা
ভাবে অন্য তিন জাতি ভক্ষ্য ইহাদের।
বিনাদোষে অকারণে করিবে দংশন
অভিশাপ-বিষদন্তে। নাহি কি হে কেহ
ব্রাহ্মণ-রহস্যারণ্যে করিয়া প্রবেশ
আপন বিবরে সর্প ধরি মন্ত্রবলে
তাহার ঐ বিষদন্ত করে উৎপাটন।"

এই মনোভাব ব্রাহ্মণদের প্রতিনিধি দুর্বাসার অসহ্য। কেবল অভিশাপ নয়, অভিশাপকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য দুর্বাসার প্রয়াস অনিবার্য। দুর্বাসার সেই প্রয়াসের সূত্র ধরিয়া নবীনচন্দ্র আরো দুইখানি কাব্য রচনা করিয়াছেন।

*　　　*　　　*

রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিজের অভিমত জ্ঞাপনচ্ছলে বলিয়াছেন :—

সমর সর্বত্র পাপ নহে ধনঞ্জয়।
রক্ষিতে দশের ধর্ম　　　　নহে পার্থ পাপকর্ম
একের বিনাশ। পার্থ, নিষ্কাম সমর
নাহি ততোধিক আর পূণ্য শ্রেষ্ঠতর।

কি ছার নৃপতি শত স্রষ্টার মঙ্গল ব্রত
বিফলি' কোটির সুখে হইবে কণ্টক,
পবিত্র ভারতভূমি করিবে নরক।

যে সমর জগতের কল্যাণের জন্য নয়, সে সমর যাহাতে না ঘটে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।

বরম্ নিবারো সেই ভীষণ বিগ্রহ
হইতেছে প্রধূমিত যাহা অহরহ।
গৃহভেদ জাতিভেদ রাজ্যভেদ ধর্মভেদ
নীচ মানবের নীচ দুষ্প্রবৃত্তিচয়
জ্বালিছে যে মহাবহ্নি করিবে নিশ্চয়
ভস্ম এই আর্যজাতি। চাহি আমি পক্ষ পাতি,'
নিবারিতে সে বিপ্লব। বাসনা আমার
চিরশান্তি। নহে সখে সমর দুর্বার।
সে রাজ্যের ভিত্তিধর্ম শাসন নিষ্কাম কর্ম
কালের তরঙ্গে তাহা মৈনাক অচল
শক্তিধর্ম, ধনঞ্জয়, নয় পশুবল।

* * *

শিখাব একত্ব মর্ম এক জাতি এক ধর্ম
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,
সমগ্র মানব প্রজা, রাজা নারায়ণ।

* * *

এই কর্ত্তব্যের স্রোতে যাইব ভাসিয়া
ফলাফল নারায়ণপদে সমর্পিয়া।
এক ধর্ম এক জাতি এক রাজ্য এক নীতি
সকলের একভিত্তি সর্বভূতহিত।
সাধনা নিষ্কাম কর্ম লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম
একমেবাদ্বিতীয়ম্, করিব নিশ্চিত
ওই ধর্মরাজ্য মহাভারতে স্থাপিত।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ দার্শনিক তত্ত্বের মিলনে নবীনচন্দ্র আদর্শ মহামানবত্বের একটা পরিকল্পনা দিয়াছেন।

ব্যাসের সঙ্গে কথোপকথনে শ্রীকৃষ্ণ অদৃষ্টবাদকে অংশতঃ স্বীকার করিলেও পুরুষকারকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। যিনি মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে চাহেন তাঁহার অদৃষ্টবাদী হইলে চলে না। অদৃষ্টবাদকে অস্বীকার প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ ভারতের ক্ষত্রিয়রাজন্যবর্গের মনোভাবের কথা ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেছেন—

প্রত্যেক নৃপতি
ক্ষুধার্ত শার্দুলসম রয়েছে চাহিয়া
নিজ প্রতিবাসী পানে। ভাবিছে সুযোগ
বজ্রলম্ফে পৃষ্ঠে তার পড়িবে কখন?
আর্যধর্ম রীতি
প্রীতিময় প্রেমময় শান্তিসুধাময়
হইয়াছে পৈশাচিক যজ্ঞে পরিণত।
রাজ্যভেদ, জাতিভেদ, গৃহভেদ প্রভু
ভারতের যে দুর্দশা ঘটাতেছে হায়
বলবান্ কোন জাতি পশ্চিম হইতে
আসিয়া ঝটিকাবেগে, নিবে উড়াইয়া
ভেদপূর্ণ আর্যজাতি তূলারাশি সম।

পশ্চিম এশিয়ায় অনেক দুর্দ্ধর্ষ জাতির বাস, তাহা দ্বারকাবাসী কৃষ্ণের অজ্ঞাত থাকিবার কথা নয়। ব্যাস বলিলেন :—

যেইরূপে আর্যজাতি আঘাতিয়া বলে
করিয়াছে স্থানভ্রষ্ট অনার্য দুর্বলে
সেই বলে প্রতিঘাত পাইবে নিশ্চয়
একদিন। * * *
বিশ্বরাজ্য প্রীতিরাজ্য রাজত্ব নীতির
বিশ্বরাজ্য ন্যায়রাজ্য রাজত্ব দয়ার।
* * হেন মহারাজ্য
যতদিন যদুনাথ না হবে স্থাপিত
ততদিন আর্যরাজ্য জানিও নিশ্চয়
ভীষণ কালের স্রোতে বালির বন্ধন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

এক মহারাজ্য প্রভু হয়না স্থাপিত
এক ধর্ম, এক জাতি এক সিংহাসন?

ব্যাস বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ, একমাত্র তুমিই তাহা পার। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে আত্মপ্রত্যয় আরও দৃঢ় হইল,—আত্মচৈতন্য অধিকতর প্রবুদ্ধ হইল।

দ্বাদশ সর্গে ব্যাসদেব বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ, তোমার মহাব্রতকে গূঢ় অভিসন্ধিসিদ্ধির জন্য বিপ্লবসৃষ্টি বলিয়া লোকে মনে করে। শ্রীকৃষ্ণ উত্তেজিত হইয়া উত্তর দিলেন—

সরল বৈদিক ধর্ম পূজা প্রকৃতির
সারল্য সৌন্দর্য্যমাখা, আর্য্য শৈশবের

সে সরল হৃদয়ের তরল প্রবাহ
পৈশাচিক যজ্ঞে যারা করিছে বিকৃত
মহর্ষি বিপ্লবকারী আমি, কি তাহারা ?
পবিত্র উত্তরকুরু হইতে যখন
উচ্চারি পবিত্র ঋক্, গাহি সামগান
আসিল ভারতে সেই পিতৃদেবগণ
আছিল কি চারি জাতি ? লইল যখন
কেহ শস্ত্র, কেহ শাস্ত্র, বাণিজ্য কেহবা
সমাজের হিতব্রতে হইল যখন
কেহ হস্ত, কেহ পদ, কেহবা মস্তক
আছিল কি জাতিভেদ ? কাটিয়া যাহার
সুন্দর সমাজদেহ—মূরতি প্রীতির
করিতেছে চারিখণ্ড প্রতিরোধি' বলে
অঙ্গ হ'তে অঙ্গান্তরে শোণিত-প্রবাহ,
মহর্ষি বিপ্লবকারী আমি কি তাহারা ?
নাহি দিবে যারা প্রভো ভবিষ্যৎ ব্যাসে
ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব কর্ণতুল্য শূদ্রে,
নাহি দিবে জ্ঞানালোক ক্ষত্রিয়ে কখনো,
বৈশ্যে বাহুবল, আদি জাতি ভারতের
করিয়া দাসত্বজীবী রাখিবে যাহারা
মহর্ষি বিপ্লবকারী আমি কি তাহারা !

ব্যাস বলিলেন—প্রকৃতির গতিতে বৈদিক ধর্মের এই পরিণতি হইয়াছে, আর কি তাহা ফিরাইতে পারিবে ? আত্মপ্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

প্রকৃতির গতি দেব:করি অবরোধ
করিব নিস্ফল তাহা। ল'ব ফিরাইয়া
অনন্ত সিন্ধুর দিকে—নিষ্কাম আমরা —
সেই সিন্ধু নারায়ণ। সরল সুন্দর
এই প্রকৃতির গতি। অনন্ত উন্নতি
প্রকৃতির নীতি প্রভো, নহে অবনতি।

Evolution theory-র কথা অবশ্যই কবির মনে ছিল। এই বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাবেশ আসিল—তিনি বলিলেন

সোহহং আমি নারায়ণ। একক ত নহি
আমি একত্ব তাঁহার। সর্বভূতময়

আমি আমি সর্বপ্রাণী আমি বিশ্বরূপ।
বিশ্বের জীবন আমি। আমাতে জীবিত
চরাচর, জন্মমৃত্যু স্থিতি, রূপান্তর,
আমি ব্রহ্মা, আমি রুদ্র, আমি নারায়ণ,
একমেবাদ্বিতীয়ম্ আমি ভগবান।
আমার অনন্ত বিশ্ব ধর্মের মন্দির
ভিত্তি সর্বভূতহিত, চূড়া সুদর্শন,
সাধনা নিষ্কাম ধর্ম, লক্ষ্য নারায়ণ।
এই সনাতন ধর্ম এই মহানীতি
ব্যাসদেব জ্ঞানবলে, পার্থ বাহুবলে
ভারতে জগতে কর সর্বত্র প্রচার,
নারায়ণে কর্মফল করি সমর্পণ।
বিনাশিয়া স্বার্থজ্ঞান, করিলে নিষ্কাম
সাম্রাজ্য সমাজধর্ম হইবে অচিরে
খণ্ড এ ভারতে মহাভারত স্থাপিত,
প্রেমময়, প্রীতিময়, পবিত্রতাময়।

একদিকে অনন্যচিত্তে মহাব্রতের ধ্যান করিয়া অন্যদিকে নারায়ণের ভাবে আবিষ্ট থাকিয়া গভীরআত্মপ্রত্যয়শীল শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে নারায়ণের অবতার বলিয়া ব্যাসদেব ও অর্জ্জুনের কাছে আত্মপ্রকাশ করিলেন। ব্যাসদেব মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকেই পরংব্রহ্ম নারায়ণ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই বাণীই গীতা। ব্রজবাসিগণ তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহার সহিত প্রেমানন্দে মাতিয়া তাঁহাকে অনেক আগেই ভগবান বলিয়া মানিয়া লইয়াছে।

নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার ধরিয়া লইয়া কাব্যরচনার সূত্রপাত করেন নাই। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ধীরে ধীরে ভগবত্তা ও ঐশ্বর্য্য উন্মেষিত হইয়াছে। একদিন তাহা নিজের কাছে স্পষ্ট উপলব্ধ হইয়াছে—অন্যের কাছেও তাহা গোপন থাকে নাই। ইউরোপীয় দর্শনের বিবর্ত্তনবাদ (Evolution theory) তাঁহার ঐরূপ চিন্তায় প্রেরণা দিয়াছে। কবি শ্রীকৃষ্ণের জীবনকে যুক্তিমার্গে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের যুগে আমাদের সর্ব্ববিধ সংস্কারকে Rationalistic ভিত্তিতে আনিবার একটা চেষ্টা দেখা যায়—বঙ্কিম গদ্যে যাহা করিয়াছেন, নবীনচন্দ্র তাহা পদ্যে করিয়াছেন।

অন্যান্য সামসাময়িক নরনারীগণের মধ্যে কেহ বা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কেহবা করেন নাই। সুভদ্রা কিন্তু তাঁহাকে সব আগেই চিনিয়াছিলেন। উদাসিনী সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের মহাব্রত উদ্‌যাপনে প্রধান সহায়িকা। সুভদ্রার অর্থ সুমঙ্গলা। মানবের মঙ্গলসাধন এবং মানবজগতে জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে প্রেমবিতরণই সুভদ্রার জীবনব্রত।

রৈবতকে ইহাই শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথা। রৈবতকের আখ্যানভাগ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। অর্জ্জুনের ব্যক্তিত্ব এই কাব্যে ফুটে নাই। কবি বৃন্দাবন হইতে প্রেমলীলা বাদ দিয়াছেন—কিন্তু রুক্মিণীর মধ্যে চন্দ্রাবলীর, ও সত্যভামার মধ্যে রাধাভাবের বিলাস দেখাইয়াছেন। সুলোচনাচরিত্রের দ্বারা কাব্যংশের কোন শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। বরং স্থলে স্থলে রসাভাস ঘটিয়াছে। কাব্যের প্রত্যাশিত গাম্ভীর্য সুলোচনার চাপল্যে ও তারল্যে ক্ষুণ্ণই হইয়াছে। নারীগণের মধ্যে জরৎকারু চরিত্রটি জীবন্ত। নাগজাতির শত্রু শ্রীকৃষ্ণে তাহার হৃদয় নিবেদিত—এদিকে রাজনীতিক বিবাহ কুৎসিত কোপনস্বভাব দুর্বাসার সঙ্গে। জরৎকারুর হৃদয়ের ঝটিকা তাহাকে 'দলিতা নাগিনী' করিয়াই রাখিয়াছে। সবচেয়ে জীবন্ত হইয়াছে দুর্বাসাচরিত্র। কবি এই চরিত্রের দৃঢ়তার সহিত তাহার দৈহিক গঠনের সামঞ্জস্য রাখেন নাই। সুভদ্রাচরিত্রটি নবীনচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি। এ সুভদ্রা ব্যাসের সুভদ্রা নয়। কাব্যের অনেকাংশ নাট্যাকারে লিখিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থখানি কাব্য বা নাটক দুইদিক হইতেই তেমন সার্থকতা লাভ করে নাই। ৯ম সর্গ 'দলিতা ফণিনীই' সর্ব্বাপেক্ষা সুরচিত। ৭ম সর্গে পূর্ব্বস্মৃতিতে বেশ কবিত্ব আছে—কিন্তু অতিরিক্ত ভাবাকুলতায় ইহা কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কাব্যে প্রাকৃতিক আবেষ্টনীসৃষ্টির চেষ্টা আছে। চট্টগ্রামের কবির কাছে সমুদ্র, পর্ব্বত ও অরণ্যের চিত্র আমরা প্রত্যাশাও করি। সামুদ্রিক প্রকৃতির বর্ণনায় বেশ গাম্ভীর্যশ্রী পরিস্ফুট। তপোবনবর্ণনা conventional হইলেও অনেকস্থলে কবিশক্তির পরিচায়ক। কবি অনার্যজাতির মনোবৃত্তি ও প্রবৃত্তি যতদূর সম্ভব বাসুকিচরিত্রে আরোপ করিতে পারিয়াছেন। আরো দুই একটি অনার্য পুরুষচরিত্র অঙ্কন করিলে অনার্যজাতির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইত। দুর্বাসা যাহাদের প্রতিনিধি, কাব্যে তাহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

এই গ্রন্থের এক সময়ে খুব সমাদর হইয়াছিল, কিন্তু ইহার ভাষা গদ্যাত্মক, অপরিচ্ছন্ন ও নীরস বলিয়া এবং অনাবশ্যক অলস শব্দবাহুল্যের জন্য ইহার এখন আর আদর নাই। কবি অনেকস্থলে ভাবানুযায়ী যথাযথ শব্দ প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান যুগের পাঠক চায়, রচনায় পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা, ছন্দের অনবদ্যতা ও ভাবাবেগপ্রকাশে সংযম। কবির পরিকল্পিত বিষয়বস্তুর প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু তাহার অপরিচ্ছন্ন অসংযত অতিপল্লবিত অভিব্যক্তি কেহ স্পৃহণীয় মনে করে না। বিশেষতঃ এই যুগে মহাভারতের কোন কোন উপাখ্যান ও তথ্যের নূতন ব্যাখ্যা এমন চমৎকার ভাষায় ও ভঙ্গীতে পাঠকগণ রবীন্দ্রনাথের রচনায় পাইয়াছে যে, তাহারা মহাভারতীয় তথ্যের কবিত্বহীন ব্যাখ্যাবিশ্লেষণকে ক্ষমা বা সহ্য করিতে রাজী নয়।

নবীনচন্দ্র অনেকস্থলে গদ্যভাষাকেই কোনপ্রকারে চৌদ্দঅক্ষরের চরণে সাজাইয়া দিয়াছেন। সর্ব্বত্রই একটা ভাবাবেগের প্রবাহ অছে বলিয়াই তাহা কাব্যের অঙ্গীভূত হইতে পারিয়াছে।

প্রকৃত কবিত্বের অভাব থাকায় কাব্যের বিষয়বস্তুর আলোচনাতেই নিবন্ধটি পর্য্যবসিত হইল।

নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র

নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে প্রধান নারী-চরিত্র সুভদ্রা। রৈবতকে সুভদ্রার প্রণয় ও পরিণয় বর্ণিত হইয়াছে। সুভদ্রাহরণ হইতেই কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে নূতন করিয়া বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইল—এই বিদ্বেষানলের প্রজ্বালক দুর্ব্বাসা। সুভদ্রার পাণিপ্রার্থী কেবল দুর্য্যোধন ছিল না, নাগরাজ বাসুকিও ছিল। বাসুকির অনার্য্যসাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার বাসনা থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকে সে প্রথমে শত্রু মনে করিতে পারে নাই। কিন্তু সুভদ্রার পাণি প্রার্থনা করিয়া না পাওয়ার জন্যই তাহার হইল মজ্জাগত কৃষ্ণদ্বেষ।

কুরুক্ষেত্রে সুভদ্রার সেবাধর্ম্মের আদর্শসৃষ্টিতে Florence Nightingale-এর কথা কবির মনে ছিল। শিবিরে ও রণক্ষেত্রে শত্রুমিত্রনির্ব্বিচারে সুভদ্রা আহতগণের সেবা করিয়া বেড়াইতেছেন। সুভদ্রার একমাত্র পুত্র অভিমন্যুর বধই কুরুক্ষেত্রকাব্যে প্রধান ঘটনা। আশৈশব উদাসীনা সুভদ্রা একেবারে পুত্রশোকে সন্ন্যাসিনী। সুভদ্রা মূর্ত্তিমতী 'গীতার বাণী'।

'প্রভাসে' সুভদ্রা আর্য্য ও অনার্য্যগণের মধ্যে নবধর্ম্মরাজ্যের মূলমন্ত্র কৃষ্ণপ্রেম প্রচার করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের এই কাব্যত্রয়কে 'সুভদ্রাকাব্য' বলিলেও অসঙ্গত হয় না।

এই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের প্রধান উপজীব্য ক্ষত্রমেধযজ্ঞ। এই যজ্ঞের হোতা দুর্ব্বাসা। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের অনুবর্ত্তী আচারসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য সহ্য করিতে পারিতেছে না। এই ব্রাহ্মণদের প্রতিনিধি দুর্ব্বাসা অনার্য্যগণকে ক্ষত্ররাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছে। রৈবতকে দুর্ব্বাসার সহায় হইয়াছে বাসুকি ও জরৎকারু। কুরুক্ষেত্রে বাসুকি বা জরৎকারুর সহায়তা বিশেষ কাজে লাগে নাই। এখানে নবীনচন্দ্র কর্ণকে সহায়রূপে কল্পনা করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন—দুর্ব্বাসার আদেশেই সূতপত্নী রাধা জলস্রোতে বিসর্জ্জিত শিশু-কর্ণকে পালন করিয়াছিলেন, দুর্ব্বাসাই কর্ণের গুরু, দুর্ব্বাসাই কর্ণকে পরিচয় গোপন করিয়া জামদগ্ন্যের আশ্রমে অস্ত্রশিক্ষা করিতে প্রেরণ করেন। যখন সত্য পরিচয় আবিষ্কৃত হইল, তখন দুর্ব্বাসাই শেষ রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনিই কুরুপাণ্ডবকুল ধ্বংস করিবার জন্য কর্ণকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহারই উপদেশে কর্ণ কুরুপুত্রদের অস্ত্রবিদ্যাপ্রদর্শনের রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এইভাবে কবি কর্ণকে তাঁহার কাব্যতরীর কর্ণে পরিণত করিয়াছেন।

যাহাতে দুর্যোধনের মনে পাণ্ডববিদ্বেষ কিছুতে মন্দীভূত না হয়, বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, যাহাতে কিছুতে দুই পক্ষের সন্ধি না হয়, সেজন্য কর্ণ অনবরত কুমন্ত্রণা দিতে লাগিলেন দুর্ব্বাসারই প্ররোচনায়। মহাবীর কর্ণ যেন দুর্ব্বাসার হাতের পুতুল হইয়া পড়িলেন। ইহা কি কেবল কর্ণের কৃতজ্ঞতার ফলে? কবি বলিয়াছেন—ক্ষত্রিয় রাজপুত্রেরা অদ্বিতীয় মহাবীর হইলেও কর্ণকে সূতপুত্র বলিয়া ঘৃণা করিত। সেজন্য কর্ণের ক্ষত্রিয়কুলের প্রতি স্বভাবতই বিদ্বেষ ছিল। ইহার উপর দুর্ব্বাসা আশ্বাস দিয়াছিলেন—কুরুপাণ্ডবকুল ধ্বংস পাইলে কর্ণই ভারতের মহাসাম্রাজ্য লাভ করিবেন। নবীনচন্দ্রের কাব্যের আখ্যানবস্তুর পক্ষে দুর্ব্বাসার

কিন্তু তখন আর ধ্বংসনিবারণের উপায় ছিল না। কুরুপাঞ্চালের ধ্বংস হইল—সেই সঙ্গে যাদবদের সামরিক শক্তি নারায়ণী সেনাও বিনাশ পাইল। এখন বাকি থাকিল যাদবগণ। তাহারা মহাপাপের অনলে নিজেরাই শলভতা লাভ করিল—'প্রবাসে'সে কথা আছে। মদোদ্ধত ক্ষত্রকুল গেল—ভারতে বাকি আর্য্য অনার্য্য যাহারা থাকিল, ক্ষত্রিয়দের পতনে তাহারা অভিনব শিক্ষা পাইল এবং সেই সঙ্গে পাইল প্রকৃত ধর্ম্মের পথ গীতার মধ্য দিয়া। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠা। নবীনচন্দ্র তাঁহার শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলকাব্যের তিন খণ্ডেই এই সত্যই প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও এই কথা কৃষ্ণচরিত্রে বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহা ঐতিহাসিক সত্য নয়, ইহা কাব্যের সত্য।

রৈবতকে অর্জ্জুন প্রেমিক। কৃষ্ণাকে অর্জ্জুন জয় করিয়াছিলেন লক্ষ্যভেদ করিয়া। কিন্তু এই কৃষ্ণার তিনি এক পঞ্চমাংশের অধিকারী। কৃষ্ণার সম্পর্কে অর্জ্জুনকে প্রেমিক বলা যায় না। অর্জ্জুনের প্রেমিকজীবনের পরিচয় এই রৈবতকে। প্রেমবলে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে জয় করিলেন—সুভদ্রাই প্রেমাবতার অর্জ্জুনের যোগ্য সহধর্ম্মিণী।

কুরুক্ষেত্রে প্রেমাবতার অর্জ্জুনকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরের ধর্ম্ম পালন করিতে হইয়াছে অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত। যুদ্ধের প্রারম্ভে জ্ঞাতিবন্ধুগণকে হত্যা করিতে হইবে ভাবিয়া অর্জ্জুন কাতর হইয়া পড়িলেন—ক্ষাত্রধর্ম্মে ও প্রেমধর্ম্মে তাঁহার মনেই কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল। গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল হস্ত হইতে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরে ক্ষাত্রধর্ম্মের পুনরুদ্বোধনের জন্য গীতার বাণী প্রচার করিলেন—তাহাতেও অর্জ্জুনের মোহ দূর হইল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ বাধ্য হইয়া বিশ্বরূপ দেখাইলেন। তখন অর্জ্জুন বুঝিলেন, তিনি নিমিত্তমাত্র,—উপলক্ষমাত্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ আগে হইতেই নিহত। অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধারণ করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অর্জ্জুনের প্রেমধর্ম্ম বারবারই তাঁহার গাণ্ডীবকে শ্লথ করিয়া দিয়াছে, ভীষ্ম যে দশদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য সৈন্য বধ করিতে পারিয়াছিলেন—তাহা কেবল অর্জ্জুনের হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের জন্য। কিছুতেই অর্জ্জুন ভীষ্মকে সাংঘাতিক আঘাত করিতে পারেন নাই। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ তাই বলিয়াছেন—

কিন্তু হায় অর্জ্জুন হৃদয়ে
কি করুণা পারাবার! বাড়বাগ্নি মত
যদিও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম জ্বলে নিরন্তর
তথাপি পার্থের কর করুণায় শ্লথ।
রূপে নব জলধর, বীরত্বেও হায়
নব জলধর পার্থ! জীমূত গর্জ্জন,
গাণ্ডীবটঙ্কার। বজ্র, শায়কনিচয়,
করুণাসলিলে সিক্ত শর, শরাসন।
নয়নে অনল, হৃদে জল সুশীতল
বাহুতে অজেয় বল, হৃদয় দুর্ব্বল।

এই ভয়েই শ্রীকৃষ্ণ নিজে অস্ত্রধারণ না করিয়াও অৰ্জ্জুনের রথের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সারথ্য গ্রহণ না করিলে অর্জ্জুনের দ্বারা একটি রথীরও বধসাধন হইত না।

ভীষ্মের পতন হইল, কিন্তু দ্রোণের পতন কি করিয়া হয়? দ্রোণ অর্জ্জুনের রণগুরু। গুরুর গাত্রে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে অর্জ্জনের হাত কাঁপে। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলিয়াছেন—

যদি কোন ঘটনার ভীষণ আঘাত নাহি করে এ হৃদয় কুলিশ-কঠিন,

তবে দ্রোণাচার্য্য যে কতকাল যুদ্ধ করিবেন...তাহা কে জানে? এই ভীষণ আঘাতই অভিমন্যুবধ। এই অভিমন্যু বধের প্রয়োজন কৌরবদেরও ছিল, পাণ্ডবদেরও ছিল।

এই অভিমন্যু বধের দ্বারা কর্ণ চাহিয়াছিল অর্জ্জুনের বল হরণ করিতে, শ্রীকৃষ্ণ চাহিয়াছিলেন, অর্জ্জুনের শ্লথ হৃদয়কে কুলিশকঠিন করিয়া তুলিতে। শ্রীকৃষ্ণ যেন জানিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রাধিক অভিমন্যুকে কুরুক্ষেত্রের মহাহবে আহুতি দিলেন। অর্জ্জুনের হৃদয়কে কুলিশ- কঠিন করাইবার জন্য তাঁহার এই কুলিশ প্রহারের প্রয়োজন ছিল।

সংশপ্তকগণকে বধ করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুন ফিরিয়া আসিতেছেন সন্ধ্যাকালে—

সংহারিয়া সংশপ্তক কপিধ্বজ রথ
ফিরিতেছে ধীরে ধীরে; শোকভারে রথ
ভারাক্রান্ত। ভারাক্রান্ত রথীর হৃদয়।
কিন্তু সারথির সেই প্রশান্ত হৃদয়ে
প্রশান্ত ললাটস্বর্গে নাহি সেই ছায়া।
পড়ে মেঘচ্ছায়া ক্ষুদ্র বক্ষে সরসীর
অতল জলধিবক্ষে যায় মিশাইয়া।
"হা কেশব! এ ছিল কি নিয়তি আমার?"
বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে কহিল ফাল্গুনি—
"তব নারায়ণীসেনা অতুল জগতে
এরূপে অর্জ্জুন হায় করিবে সংহার?
মানুষের দৃষ্টি ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অপার।"

নারায়ণী সেনা বধ করিয়া অর্জ্জনের হৃদয় করুণায় বিগলিত। শ্রীকৃষ্ণেরই নিজস্ব সেনা, কিন্তু তাহার চিত্ত অবিচলিত। শ্রীকৃষ্ণ জানেন—কি কুলিশ অর্জ্জুনের বক্ষের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। অর্জ্জুনের চিত্তকে প্রস্তুত করার প্রয়োজন, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

"এখনো বুঝিলে নাকি ধ্বংস ক্ষত্রিয়ের
কৌরব পাণ্ডব সেনা, সেনা নারায়ণী
ইচ্ছা তাঁর। অধর্ম্মের যেই মহাবিষে
ক্ষত্রিয়ের রক্তমাংসমজ্জা জর্জ্জরিত
কার সাধ্য সেই বিষ করিতে উদ্ধার?
এখনো বুঝিলে নাকি হায় ক্ষত্রিয়ের

ধ্বংস বিনা ধর্ম্মরাজ্য হবে না স্থাপিত ?
নিম্ববৃক্ষে আম্র নাহি ফলিবে নিশ্চয়।''

অর্জ্জুন রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—'অভিমন্যু নিহত'—

মূর্চ্ছিত অর্জ্জুন
পড়িতে ধরিল কৃষ্ণ বাহু প্রসারিয়া।
উচ্ছ্বাসে কহিলা কৃষ্ণ—'অর্জ্জুন অর্জ্জুন,
আমরা বীরের জাতি বীরধর্ম্ম রণ।
অযোগ্য এ শোক তব, এই বীরক্ষেত্র
করিও না কলঙ্কিত করিয়া বর্ষণ
একবিন্দু শোক-অশ্রু। বীরর্ষভ তুমি,
বীরশোক অশ্রু নয়, অসির ঝঙ্কার।

শ্রীকৃষ্ণ ভাবান্তরের দ্বারা অর্জ্জুনের শোকমোহকে অপসারিত করিলেন—প্রতিহিংসার উদ্দীপনাই এই ভাবান্তর।

মুহূর্ত্তে আগ্নেয়গিরি হইল কম্পিত
হইয়া বিদীর্ণ তবে। মুহূর্ত্ত বর্ষিয়া
তরল শোকাগ্নি, বেগে বর্ষিতে লাগিল
বজ্রানল কুরুক্ষেত্র করিয়া কম্পিত।
অসি, অসি! বেগে অসি করি নিষ্কোষিত,
বিদীর্ণ আগ্নেয় গিরি বর্ষিল গৈরিক
"বসাইব কার বুকে কহ মহারাজ ?
অর্জ্জুনেরে পুত্রহীন কে করিল বল'।''

* * *

'অধর্ম্মের অভ্যুত্থান বুঝিলাম হায়
এত দিনে এত দূরে। বুঝিলাম আর
ধনঞ্জয় শ্লথ করে আবৃত অসিতে
যুঝিয়া করিতেছিল বৃথা নরমেধ
মায়াবশে ভ্রান্তমতি, সপ্তরথী আজি
খুলিল অসির সেই স্নেহ আবরণ,
শাণিত করিল ধার, করিল সঞ্চার
শ্লথ করে বিদ্যুদগ্নি। খুলিল নয়ন,
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বুঝিনু এখন।

কুরুক্ষেত্র যে সত্যই ধর্ম্মক্ষেত্র, অধর্ম্মের বিনাশসাধন করিয়া ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনের জন্যই যে কুরুক্ষেত্র, অভিমন্যুবধেই অর্জ্জুনের সম্পূর্ণ প্রতীতি হইল, গীতার উপদেশে নয়—দুর্য্যোধনের

রাজ্যহরণে নয়, দ্রৌপদীর অবমাননাতেও নয়। নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্রকাব্যে ইহাই প্রতিপাদ্য। 'কুরুক্ষেত্র' প্রকৃতপক্ষে অভিমন্যুবধ কাব্য, মেঘনাদবধের তুলনায় কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট নয় বটে, কিন্তু ইহা করুণতর কাব্য এবং গভীরতম ইহাই সার্থকতা। কুরুক্ষেত্র কাব্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধেই আলোচনা করিলাম—কিন্তু কাব্যের আলোচনা কেবলত তাহাই নয়। কবিত্বের কথাও বলিতে হয়। মনের উচ্ছ্বসিত আবেগ কাব্যের উপাদান মাত্র, আবেগই কবিতা নয়। নবীনচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল, মনের উচ্ছলিত আবেগই কবিতা,—তাহা যে কোন ভাষা বা ছন্দে প্রকাশিত হইলেই হইল। সে আবেগ শোভন সুন্দর সংযত ভাষা ও ভঙ্গীতে পারিপাট্যের সহিত অভিব্যক্ত না হইলে যে সংকাব্য হয় না—তাহা তাঁহার যুগের কোন কবিই মনে করিতেন না। ভাষার পরিচ্ছন্নতা ও মিতভাষণের অভাবে কবির ভাবোচ্ছ্বাস সংকাব্যে পরিণত হয় নাই। তত্ত্ববিচার ও তত্ত্ববিশ্লেষণের আতিশয্যও কবিকে কবিধর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের বিষয়বস্তুতে রসসঞ্চারের সুযোগ ঘটিতেছে না মনে করিয়া বোধ হয় কবি কুরুক্ষেত্রে 'পুতুলখেলা' শীর্ষক পরিচ্ছেদের অবতারণা করিয়াছেন। ইহাতে হিতে বিপরীত হইয়াছে। সুলোচনা ও উত্তরার রঙ্গলীলা কাব্যখানিতে রসাভাস ঘটাইয়াছে। এইরূপ তরলতা ও চটুলতা একমাত্র সামাজিক নাটকে বা উপন্যাসে স্থান পাইতে পারে। পৌরাণিক কাব্যে বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্রের মত কাব্যে—রণ-শিবিরের মধ্যে উহা একেবারেই অচল। যেখানে ব্যাস ও শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, সেখানেই কাব্যের প্রকৃতি মহনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের কথোপকথনে তত্ত্ববিচার বাদ দিলে একটা রসের সঞ্চারও হইয়াছে।

নবীনচন্দ্র একই শব্দ ঘন ঘন ব্যবহার করিয়া একটা শাব্দিক মাধুর্য্যের সঞ্চার করিতে চাহিতেন, যেমন—

পুষ্পমুখী ভদ্রা ধীরে পুষ্পনিভ কম-করে
মুছিছেন পুষ্পমুখ সুপ্তা রমণীর।
প্রভাতসমীরে খেলি পুষ্পে পুষ্প আলিঙ্গিয়া
সরাইছে যেন ধীরে নিশির শিশির।

এখানে বার বার পুষ্পের প্রয়োগ না হইলে উপমাটি সার্থক হইত। ছন্দ ও ভাষার অপরিচ্ছন্নতার জন্য স্থলে স্থলে রচনা গদ্য অপেক্ষাও নীরস ও দুষ্পাঠ্য হইয়াছে। যেমন···

১। একে ত কোমল পার্থের হৃদয় বীরত্ব আর্দ্র দয়ায়,
বালিকার এই করুণ উচ্ছ্বাসে বুঝি গীতা ভেসে যায়।
বুঝিল উত্তরা পার্থের হৃদয় হয়েছে কাতর অতি,
কিঞ্চিৎ ভাবিয়া অশ্রুতে হাসিয়া কহে প্রত্যুৎপন্নমতি,
হে বাবা! তুমিত বহু দিন ধরি পুতুলগুলি আমার।
দেখ নাই, আজি আনি গিয়া সব দেখিবে কি একবার?

২। হতেছে হইবে, কৃষ্ণ আবির্ভূত, দ্বাপর হতেছে শেষ।
নব অবতার নব যুগধর্ম্ম করিতেছে পরবেশ।

সাধুদের ত্রাণ, দুষ্কৃতদমন অধর্ম্ম হতেছে ক্ষয়,
এই কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মের সাম্রাজ্য হইতেছে সমুদয়।
এই নরমেধ করি সমাপন সাম্রাজ্য করি স্থাপন,
অর্জ্জুন-সারথ্য ত্যজিয়া জগৎ-সারথ্য কর গ্রহণ।

এইগুলি লঘু ত্রিপদী ছন্দে লেখা। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাবির্ভাব তখন হয় নাই বটে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্য ত ছিল। তাঁহার হাতে এই ছন্দ কি মধুর হইয়াছে, কবি তাহাও কি লক্ষ্য করেন নাই?

কবি লিখিয়াছেন—

কুরঙ্গশাবক যাইতেছে ছুটিয়া ঘ্রাণিয়া মুখ কখন,
খেলিতেছে সুখে নাচিতেছে শিখী আনন্দে ধরি পেখম।

'কখন' ও 'পেখম'এ মিল হইল মনে করিয়া কবি একটি পলও চিন্তা না করিয়া যেমন কলমে কথাগুলি আসিল তেমনি বসাইয়া গেলেন। একপল থামিলেই তিনি দেখিতে পাইতেন, প্রথম চরণে 'মুখ' আছে—দ্বিতীয় চরণে আছে 'সুখ'। তিনি অনায়াসে লিখিতে পারিতেন—

হরিণ-শিশুটি যাইতেছে ছুটি কখনো ঘ্রাণিয়া মুখে,
পেখম ধরিয়া শিখী আনন্দে নাচিছে খেলিছে সুখে।

কবি তাহার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। তাঁহার যদি মনে হইত পারিপাট্যের প্রয়োজন আছে, যদি মনে হইত এইরূপ ভাষার কেহ দোষ ধরিবে, তাহা হইলে তিনি সতর্ক হইতেন। মোটের উপর সেকালে এরূপ ভাষাবিন্যাসের কেহ দোষ ধরিত না,—কেবল দেখিত ভাবটা প্রকাশিত হইয়াছে কিনা।

কুরুক্ষেত্র কাব্যে সুভদ্রা, সুলোচনা, উত্তরা, অভিমন্যু, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাসদেব, অর্জ্জুন, শৈলজা দুর্ব্বাসা ও কর্ণ—এই চরিত্রগুলির সমাবেশ হইয়াছে। চরিত্রগুলিকে কবি নিজের কাব্যের উপযোগী করিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন। অধিকাংশ চরিত্র প্রাণবন্ত ও মানবিকতায় মণ্ডিত হইয়াছে। শৈলজাচরিত্রে বাস্তবতার অভাব আছে—রৈবতকে শৈলজা বেশ জীবন্ত। সুলোচনায় অতিরিক্ত রঙ চড়ানো হইয়াছে বটে, তবু শেষপর্য্যন্ত সুলোচনা মাতৃমহিমা রক্ষা করিয়াছে। পঞ্চদশ সর্গ হইতে কাব্যখানির গতি প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কাব্যের এই অংশের অনেক স্থলে মাইকেল মধুসূদনকে মনে পড়ে।

এই অংশে যে দৃশ্যগুলি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের সবগুলিই শোকের চিত্র, স্থলে স্থলে মর্ম্মস্পর্শী। অভিমন্যুর রণশয্যার চিত্র এবং কুরুক্ষেত্রে শ্মশান সংকারের চিত্র সুরচিত। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলকাব্য প্রধানতঃ উদাত্তভাবের শান্তরসেরকাব্য। কুরুক্ষেত্রের চিত্রগুলি মনে একটা গভীর ঔদাস্যের সৃষ্টি করে। কাব্যের ভাষা যেমনই হউক, ভাবের মহত্ত্ব অস্বীকার করার উপায় নাই। মহাভারতের মহাসমুদ্র হইতে উদ্গত ভাবাবাষ্পরাশি এই কাব্যে ঘনমেঘমালায় পরিণত হইয়া ইহাকে মেদুর করিয়া রাখিয়াছে, বিদ্যুতের চমক তাহাতে নাই, কিন্তু প্রচুর কল্যাণময় বর্ষণের সম্ভাবনা উহাতে স্তম্ভিত হইয়া আছে।

প্রভাস

প্রভাসও শান্তরসের কাব্য। এই কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবসান বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যের সুর আদ্যন্ত ঔদাস্যময়। এই শান্তরসোপেত ঔদাস্যের সুরে কবি গ্রন্থ-সূচনায় সামুদ্রী প্রকৃতির যথাযোগ্য আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছেন।

রুক্মিণী ও সত্যভামা দুইজন দুই মনোবৃত্তির কৃষ্ণভামিনী, শ্রীকৃষ্ণের সত্ত্বরজোময়ী প্রকৃতির দুইটি অভিব্যক্তি—

সত্যভামা পার্শ্বে শোভা বিদর্ভসুতার
দীপ্ত সন্ধ্যাপার্শ্বে যেন ফুল্ল জ্যোছনার।

ইঁহাদের কথোপকথনে প্রকাশ পাইয়াছে—কুরুক্ষেত্রের পর ভারতের, বিশেষতঃ যাদবরাজ্যের অবস্থা। সত্যভামা চারিদিকে আসন্ন ধ্বংসের লক্ষণ দেখিতেছেন,—সমস্ত প্রকৃতির উপর যেন একটা অভিশাপের কৃষ্ণচ্ছায়া।

বহুদিন অনাবৃষ্টি। মহানদীচয়
হইয়াছে শুষ্কপ্রায়। মহাশব্দে বয়
ঝটিকা—ইত্যাদি।

যদুকুলের শোচনীয় পরিণতির পূর্ব্বসূচনা দূরদর্শিনী সত্যভামার অন্তরকে আতঙ্কে উদ্বেলিত করিতেছে। তিনি রুক্মিণীকে বলিতেছেন—

জ্বলিতেছে নিরন্তর জর্জ্জরিত-কলেবর
কি বিদ্বেষে যাদবেরা, কি হিংসা-অনল
কক্ষে কক্ষে বক্ষে বক্ষে জ্বলে অবিরল।
এ অনলে সুরাপান, করিছে আহুতিদান
কি ভীষণ নিরন্তর, বিনা হৃষীকেশ
নরনারী সুরাপানে মত্ত নির্ব্বিশেষ।
কেহ কারে নাহি মানে কেহ কারে নাহি জানে
দেবতাব্রাহ্মণ, গুরু কিছু নাহি জ্ঞান,
নাহি লজ্জা ভয়, পাপে বদন অম্লান।
পরস্পর কি বিদ্বেষ ব্যভিচার কি অশেষ
পিতাপুত্রে পতিপত্নী-পবিত্র-বন্ধন
প্রবঞ্চনা ব্যভিচার করেছে ছেদন।

এই চিত্র কবিকল্পনামাত্র নয়—ইহা মহাভারতেরই কথা। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা তাঁহার নিজের বংশের লোকেরা স্বীকার করে নাই, স্বীকার করিলে তাহাদের এই অধঃপতন হইত না। তাঁহার বংশের লোকেরা অধঃপাতে চলিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ক্রিয় হইয়া তাহা কি দেখিতে-

ছিলেন? তিনি কি প্রতিরোধের কোন চেষ্টা করেন নাই? রৈবতকে ব্যাসদেব বলিয়াছিলেন—'প্রকৃতির গতিরোধ কে করিতে পাবে?' শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'মানুষ নিজের পুরুষকার ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তাহাও পারে।'

কিন্তু মহাভারতে আছে, বলরাম ছিলেন অতিরিক্ত সুরাপায়ী। বলরামের প্রভাবই যদুবংশে অধিকতর ক্রিয়াশীল হইয়াছে। দেখা যাক, কবি এ সমস্যার কি সমাধান করিয়াছেন।

সত্যভামা যখন উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তখন উত্তর দিলেন—

শান্তি অমঙ্গল
সকলি ত মানবের নিজকর্ম্মফল।
সেই কর্ম্মফলরেখা উহাই অদৃষ্টলেখা
মানব আপনি যদি না করে খণ্ডন,
কার সাধ্য সেই লেখা করিবে মোচন?

* *

কত যত্ন করিলাম জান তুমি অবিরাম
নিবারিতে কুরুক্ষেত্র, হইল নিষ্ফল।
পূর্ণ অধর্ম্মের কলি, ধ্বংস কর্ম্মফল।
অধর্ম্মের যে উত্থান জ্বালাইল সে শ্মশান
সে অধর্ম্ম যাদবের অস্থিমজ্জাগত,
বহিতেছে শোণিতের সঙ্গে অবিরত,
এ অশান্তি অমঙ্গল জানিও তাহার ফল
কেমনে নিবারি? কেন নিবারিব আমি?
নহি যাদবের, আমি মানবের স্বামী।

ঐ বাক্যগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায়—

শ্রীকৃষ্ণ গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবকে নিয়তি বলেন না,—তিনি মানুষের কর্ম্মফলকেই নিয়তি বলেন। মানুষ পুরুষকার ও সাধনার দ্বারা এই নিয়তির প্রভাবকে খণ্ডন করিতে পারে। মহাপুরুষরা কেবল মানুষের মনে জ্ঞানসঞ্চার ও শুভবুদ্ধির উদ্বোধন করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। তাহারও সীমা আছে।

পাপবুদ্ধি যখন এমন অবস্থায় ধ্বংসকে আলিঙ্গন করিবার জন্য 'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ,' তখন ভগবানও তাহাকে বাঁচাইতে পারেন না। বাঁচাইবেনই বা কেন? এক্ষেত্রে তাঁহার ধ্বংসই যে বাঞ্ছনীয়,—বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর।

শ্রীকৃষ্ণ মহাপাপী জরাসন্ধ ও শিশুপালকে বিশ্ব হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সৎপথে ফিরাইবার উপায় ছিল না। ভাবিয়াছিলেন, দুর্য্যোধনের মনে শুভবুদ্ধির সঞ্চার করিয়া কুরুক্ষেত্র-সমরের ধ্বংসলীলা রোধ করিবেন, কিন্তু যখন তাহাও সম্ভব হইল না—তখন তাহাকে এবং তাহার সহায়কদের ধ্বংস করিয়া পৃথিবীকে ভারমুক্ত করিবারই প্রযাস

করিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ফলে আর্য্যজাতি একেবারে ধ্বংস না পাইলেও একেবারে পঙ্গু হইয়া গেল ? তাহাতেই বা ক্ষতি কি.? আর্য্যরাই ত একমাত্র মানুষ নয়। আর্য্যজাতি যদি আত্মহত্যা করে করুক, অনার্য্যের উত্থান হউক। মানুষের যেমন—শৈশব, যৌবন, জরা, মৃত্যু আছে, জাতিরও তাহাই আছে। মানুষ মৃত্যুর পর নবজীবন লইয়া ফিরিয়া আসে—জাতিও নবজীবন লইয়া আবার ফিরিয়া আসে। যে জীবন জরাজীর্ণ এবং ধরনবাসের অনুপ যুক্ত সে জীবন বর্জ্জন করিয়া নবজীবন লাভ করিয়া আসাই মঙ্গলজনক।

যাদবকুলের ধ্বংসও তাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত। বিশ্বমানবকে যিনি আত্মীয় মনে করেন—পানোন্মত্ত মহাপাষণ্ড যাদবকুলের প্রতি তাঁহার অন্ধ মমতা থাকিতে পারে না। যাদবগণ তাহাদের কর্ম্ম-ফল ভোগ করিবে। শ্রীকৃষ্ণের আদর্শরাজধর্ম্মপালন তাহাদের চরিত্র সংশোধন করিতে পারে নাই। তাহারা সংশোধনের অতীত। অধর্ম্ম যাদবদের অস্থিমজ্জাগত, শোণিতের সহিত প্রবাহিত, অতএব অধর্ম্মের আশ্রয় ঐ অস্থিমজ্জা-শোণিতরাশির ধ্বংস অনিবার্য,—অভিপ্রেতও বটে।

আর্য্যজাতির কর্ম্মফলের এই যে অনিবার্য্য পরিণতি—ইহা মহাভারতেরই কথা। এই শোচনীয় পরিণতি ঘটাইবার মূলে অনার্য্যদের এবং ক্ষত্রদ্বেষী ব্রাহ্মণদের প্রয়াসের সমবেত সহায়তাও ছিল,—আমাদের কবি এই গ্রন্থে তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে অবতীর্ণ হইলেন, দুষ্কৃতকারীদের দণ্ড দিলেন, প্রকৃত ধর্ম্মের সার তথ্য প্রচার করিলেন, তাহাও কি ব্যর্থ ? কবি দুর্ব্বাসা ও তাঁহার শিষ্যদের কথোপকথনে ভারত-পরিব্রাজক শিষ্যদের মুখ দিয়া বলিয়াছেন—"কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে বহু ক্ষত্রিয়ের ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু ভারতে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই লোকে সুখে শান্তিতে নির্ভয়ে বাস করিতেছে,—দস্যুদের উপদ্রব নাই,— শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনের অনুশীলন সর্ব্বত্রই অব্যাহত। দেশে দেশে রাজ্যে রাজ্যে যে দ্বেষাদ্বেষি ছিল, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে মনোমালিন্য ছিল, আর্য্যে অনার্য্যে যে দ্বন্দ্ব ছিল, তাহা কুরুক্ষেত্রের অনলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এক কথায় ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইয়াছে, এই ধর্ম্মরাজ্যের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিত হইতেছেন। ব্যাসদেব এই ধর্ম্ম ভারতে প্রচার করিয়াছেন এবং সুভদ্রাদেবী নারীগণের মধ্যে এই ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন।"

এই কথাগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কি আছে, জানি না। তবে এই সময় হইতেই কৃষ্ণাবতারবাদ যে প্রচারিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত উদার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব যে আর্য্য অনার্য্যদের মধ্যে অনেকটা মিলন ঘটাইয়াছিল—ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। ব্যাসদেবের গীতার বাণী যে ভারতের ধর্ম্মজীবনে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল,—ইহাও অস্বীকার করা যায় না। নবীনচন্দ্রের ধর্ম্মরাজ্য একেবারে কবিকল্পনা হয় ত নয়। সমগ্র ভারতের মঙ্গলের কাছে কৌরব-যাদব যে অকিঞ্চিৎকর, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?

বাসুকি দুর্ব্বাসার আদেশে অনার্য্যসৈন্যসংগ্রহের জন্য ভারতের বহু শৈলে, বহু অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া দুর্ব্বাসার কাছে নিবেদন করিল—"কোথাও সৈন্য মিলিল না, সর্ব্বত্রই অনার্য্যেরা

কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর। তাহাদের মধ্যে আর্য্যদ্বেষ তিরোহিত।” বাসুকি নিজেও শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে,—প্রাক্তন দুষ্কর্ম্মের জন্য সে অনুতপ্ত। নাগরাজ্যেও কৃষ্ণভক্তির প্রচার হইয়াছে। বাসুকির ভগিনী শৈলজা ইহার প্রচারিকা। দুর্ব্বাসার যদুবংশধ্বংসের পরিকল্পনা বিফল হয় দেখিয়া সে যোগবলে ইন্দ্রজাল দেখাইয়া বাসুকিকে আবার বশীভূত করিল। বাসুকির চিত্তে যে ভীষণ দ্বন্দ্বের কুরুক্ষেত্র চলিতে লাগিল তাহাতে বাসুকি যেন ক্রমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে দুর্ব্বাসার শিষ্যগণ যদুবালকদের অভিশপ্ত করিয়া আসিয়াছে—যে মুষল পেটে বাঁধিয়া তাহারা ঋষিদের ব্যঙ্গ করিয়াছে—সেই মুষলই যদুবংশ ধ্বংস করিবে। মহাভারতে মুষলপ্রসবের কথা আছে। তবে তাহাতে আছে বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ তিনজন ঋষি শাম্বকে এই অভিশাপ দিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র ইঁহাদের দুর্ব্বাসার শিষ্যে পরিণত করিয়াছেন। এদিকে দুর্ব্বাসা তাহার নাগী পত্নী জরৎকারু ও অন্যান্য অনার্য্যবালাদের যদুপুরে সুরা বিক্রয় করিতে পাঠাইয়া যাদবদের অতিরিক্ত সুরাসক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

মহাভারতে আছে, শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করিয়াছিলেন—দ্বারকায় সুরা প্রস্তুত করিলে শূলদণ্ড হইবে। অতএব সুরা Smuggled হওয়া অস্বাভাবিক কথা নয়। চিরকাল তাহাই হয়। কৃষ্ণ ত দণ্ড ঘোষণা করিলেন, কিন্তু বলরামও ত ছিলেন। কেবল তাহাই নয়—অনার্য্যনারীরা অরণ্য ভূধরে সংবর্দ্ধিত স্বভাবসুন্দর রূপের দ্বারা যাদব যোদ্ধাদের মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

অনার্য্যের সুরাসুধা রূপসুধা আর
গরলে গরল উগ্র মিশি,
উন্মত্ত যাদবকুল দুই মহাবিষ
হায় পান করে অহর্নিশি।
অনার্য্যার প্রেমানল অনার্য্যার সুরানল
হিংসাকুণ্ড করি প্রজ্বলিত।
পুড়িছে যাদবকুল, কৃষ্ণের শাসনে
হইল না অগ্নি নির্ব্বাপিত।

বাসুকির ভগিনী কারু ছদ্মবেশে যদুরাজধানীর কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া বেড়ায়—অশ্বারোহণে যদুপুরে যাতায়াত করে। সে সাত্যকিকে মুগ্ধ করিল—

সুরাশ্লথ কণ্ঠে মত্ত কহে যুযুধান
নীলাব্জের লীলা নীলিমায়
দেখি নাই যতদিন ভাবিতাম মনে
তামরস ত্রিদিব সুধায়।
শ্যামাঙ্গিনী অনার্য্যার রূপে যে মদিরা,
আছে যেই লালসা প্রখরা
গৌরাঙ্গিণী আর্য্যবালা-রূপজ্যোছনায়
নাহি সেই লাবণ্য মুখরা।

কারু জানিত কৃতবর্ম্মার সঙ্গে সাত্যকির অহিনকুল সম্বন্ধ। সে বলিল, "কৃতবর্ম্মা আমাকে একবার অসহায় অবস্থায় পাইয়া অত্যাচার করিতে গিয়াছিল। আমি সময় লইয়া তাহার হাত হইতে নিস্তার পাই। যদি তাহাকে দণ্ড দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার হইব।" বলা বাহুল্য, ইহা নবীনচন্দ্রের কল্পনামাত্র।

কবি বলিয়াছেন, এই ভাবে অনার্য্যদের চক্রান্তে যদুকুলে গৃহবিবাদের সৃষ্টি। মহাভারতে অবশ্য অন্যরূপ আছে। কবি তাঁহার আখ্যান-ধারার সূত্ররক্ষার জন্যই এই ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন। অনার্য্য জাতি হইতে সুরার বহুল প্রচার এবং সুরাপবিবেষিকা নারীদের প্রতি-লুব্ধতা আর্য্যগণের পক্ষে অনেকটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

প্রভাসের উৎসবে সাত্যকির হাতে কৃতবর্ম্মার মৃত্যু হইল, এদিকে নাগ সেনাপতি তক্ষক সৈন্যসামন্ত লইয়া লুক্কায়িত ছিল, তাহারা গুপ্ত শরে উৎসবমত্ত যাদবদের বধ করিতে লাগিল। যদুবংশের পুরুষগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া ভীষণ যুদ্ধে নিজেদের নির্ম্মূল করিল। কেবল গৃহযুদ্ধ নয়, এই সময় ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপদ্রব ঘটিয়া প্রভাসের উৎসবক্ষেত্রকে ধ্বংস করিল। প্রভাসের উৎসবে বহু আর্য্য-অনার্য্যের সম্মেলন হইয়াছিল—তাহাদের শবে ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বিকারচিত্তে সমস্তই দেখিলেন—কোন প্রতিকারের চেষ্টা করিলেন না। মহাভারতে অবশ্য আছে—শ্রীকৃষ্ণ এড়কাপ্রহারে বহু যাদবকে নিজেই সংহার করিলেন।

পুরাণে আছে, শ্রীকৃষ্ণ জরা নামক ব্যাধের শরে নিহত হ'ন। নবীনচন্দ্র জরাকে সহজেই জরৎ-কারুতে পরিণত করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র রৈবতকে দেখাইয়াছেন—জরৎকারু শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে উন্মত্তা হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পত্নীরূপে অনার্য্যকন্যাকে গ্রহণ করিতে রাজী হ'ন নাই। অনার্য্যরমণীর প্রত্যাখ্যাত প্রণয় নিষ্ঠুর প্রতিহিংসায় পরিণত হয়। শ্রীকৃষ্ণকে নিঃসহায় অবস্থায় নিম্ববৃক্ষতলে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার আত্মবিস্মরণ ঘটিল। সহসা তাহার অনার্য্য বন্য প্রকৃতি জাগিয়া উঠিল, তাহার হাতের শর গিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে বিদ্ধ হইল। এইখানেই নবীনচন্দ্রের গ্রন্থের শেষ হইবার কথা। কিন্তু ভক্ত নবীনচন্দ্রের ভক্তিধর্ম্মপ্রচারের অনেকটুকু অবশিষ্ট ছিল।

দুর্ব্বাসাকে সুভদ্রা শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম বাই ছাড়িলেন। বাসুকি কৃষ্ণনামে পাগল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। জরৎকারু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল। শৈলজা সুভদ্রাকে বাঁচাইতে গিয়া এক যাদবরমণীর হাতের বর্শার আঘাতে আহত হইল। শৈলজা মৃত্যুকালে ধনঞ্জয় ও ব্যাসদেবকে অনুরোধ করিয়া গেল—যে নিম্ববৃক্ষমূলে শ্রীকৃষ্ণ লীলাসংবরণ করিয়াছেন, সেই নিম্ববৃক্ষ দিয়া তিনটি মূর্ত্তি গড়িতে হইবে—একটি শ্রীকৃষ্ণের, একটি সুভদ্রার, আর একটি অর্জ্জুনের। তারপর ঐ মূর্ত্তি অনার্য্যদের হাতে সমর্পণ করিতে হইবে। নবীনচন্দ্র অনার্য্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ-বলরাম সুভদ্রা মূর্ত্তির কথাই বলিয়াছেন। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্র এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান।

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বলদেব কতকগুলি নাগসৈন্য লইয়া পোতে আরোহণ করিয়া ভূমধ্যসাগর

পার হইয়া চলিয়া গেলেন। ইনি হরিকুলেশ (Hercules) নামে সে দেশে হেলেনিক সভ্যতার প্রচারক হইলেন, এবং নবধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিলেন। ব্যাসদেবের আদেশ হইল অবশিষ্ট যাদবসন্তানদের সহিত পাণ্ডবরা হিমালয় পার হইযা লোহিতসাগরকূলে নূতন সভ্যতা (Semitic Civilisation গঠন করুক, যুদাস (Judas) হইবে নব যদুরাজ্য। শৈলজা মৃত্যুকালে বলিয়া গেল, এই নব যদুকুলেই আবার ভগবান অবতীর্ণ হইয়া ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণ দিবেন।

অর্জ্জুন যাদব-রমণীদের ইন্দ্রপ্রস্থে লইয়া যাইতেছিলেন, পঞ্চনদদেশে বাসুকির সেনাপতি তক্ষক সসৈন্যে গিয়া তাহাদের হরণ করিয়া লইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানে অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে আর বল নাই,—অর্জ্জুন তাহাদের রক্ষা করিতে পারিলেন না। যাদবরমণীগণও ফিরিতে চাহিল না, তাহারাও সুরাপানে, ব্যভিচারে অনার্য্যভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ব্যাসদেব বলিলেন,—ইহাও শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত। ইহাতে আর্য্য-অনার্য্য রক্তমিশ্রণ ঘটিয়া বলবত্তর জাতির উদ্ভব হইবে। যেখানে সাধারণ সমাজবিহিত বৈবাহিক সূত্রে মিলন হয় না,—প্রকৃতি সেখানে এইভাবেই মিলন ঘটান। এই কথাটি কিন্তু সাংঘাতিক কথা। এই ভারতেই প্রকৃতির এই লীলা বার বার অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে।

নবীনচন্দ্রের সময়ে যে সব অদ্ভুত মতামত ইংরাজি শিক্ষিতদের মধ্যে প্রচলিত ছিল—সেগুলিকে অনেকটা Rational Interpretation of Mahabharat মনে করিয়া তিনি এই গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজি শিক্ষার ফলে সেকালের লেখকদের মধ্যে আর্য্যামির ভাব দূরীভূত হইতেছিল, ভারতীয় হিন্দুরাও যে মিশ্রজাতি, সকল শিক্ষিত লোকের এই ধারণা জন্মিয়াছিল, জাত্যভিমান বিদূরিত হইতেছিল—ব্রাহ্মণপ্রাধান্য হিন্দুসমাজের কলঙ্ক বলিয়া তাহাদের ধারণা জন্মিতেছিল—সেই সঙ্গে একটা অনার্য্যপ্রীতিরও সঞ্চার হইয়াছিল। মাইকেলের মেঘনাদবধ এক হিসাবে অনার্য্য-প্রীতির, নিদর্শন। সেকালের মনীষীরা, আমাদের সংস্কৃতির অনেকাংশ যে দ্রাবিড়জাতির দান, ইহা নানা প্রবন্ধে প্রচার করিতেছিলেন। আমাদের অবৈদিক দেবতারা অনার্য্যদেরই দেবতা বলিয়া অনেকে প্রমাণ করিতেছিলেন। নবীনচন্দ্রের অনার্য্যপ্রীতি এই মহাভারতীয় কাব্যের মূল প্রেরণা। নবীনচন্দ্র সম্ভবতঃ মান্দ্রাজের অনার্য্য আলোয়ার সাধকগণের গভীর কৃষ্ণভক্তির কথা জানিতেন। সে জন্য কৃষ্ণভক্তিপ্রচারে অনার্য্যদের অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন।

নবীনচন্দ্রের সময়ে সাহিত্যে ভারতীয় নারী যোদ্ধবেশে অশ্বারোহণে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে একটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইত। ইহা বীরপুরুষদের বশীভূত করিবার একটা কৌশলও বটে। নবীনচন্দ্র আর্য্য অনার্য্য উভয়শ্রেণীর নারীকেই অশ্বারোহিণী ও শস্ত্রধারিণী করিয়া তুলিয়াছেন।

প্রভাসে নবীনচন্দ্র ভক্তির উচ্ছ্বাসকে এমনই বন্ধনমুক্ত করিয়াছেন, যে ভক্তির প্লাবনে কাব্যের অন্যান্য সমস্ত ঐশ্বর্য্য সমুদ্রজলোচ্ছ্বাসে প্রভাসের উৎসবক্ষেত্রের মত ভাসিয়া গিয়াছে।

নবীনচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থে ভক্তির যে মাদকতা দেখাইয়াছেন—তাহা দ্বারাবতীর কৃষ্ণ সম্বন্ধে সুসমঞ্জস হয় না। এ জন্য তিনি প্রভাস-লীলায় প্রচুর পরিমাণে ব্রজভাবের মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন —ইহাতে কাব্যের দিক হইতেও রসাভাস হইয়াছে, ভক্তিধর্ম্মের দিক হইতেও রসাভাস হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য এ দেশে ভক্তির যে উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেন—নবীনচন্দ্র মৃদঙ্গ বাদ দিয়া তাহাই প্রভাস-লীলায় আরোপ করিয়াছেন। ফলে, নবীনচন্দ্রের কাব্য হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলকাব্য---অন্যান্য মঙ্গলকাব্য, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল কাব্যের সমপর্য্যায়ে ইহা পড়িয়া যায়। যদি কতকগুলি আধুনিক মতবাদ ও ছন্দ ইহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট না থাকিত, তাহা হইলে ইহাকে মঙ্গলকাব্যের যুগে রচিতই মনে করা যাইত।

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি কাব্যে যে ভাবাবেগের সংযম ও মিতভাষণ আছে, নবীনচন্দ্রের মঙ্গলকাব্যে তাহাও নাই। নবীনচন্দ্রের এই অমিত ভাষণ সর্ব্বত্রই—প্রকৃতি-বর্ণনাতেও যেমন, তত্ত্ববিবৃতিতেও তেমন। উক্তি মাত্রই প্রায় দীর্ঘ বক্তৃতা, কেবল আবেগমূলক উক্তিতে নয়, যুক্তিমূলক উক্তিতেও অমিত ভাষণ। যে কথা চারি চরণে বলা যাইতে পারিত, তাহাই বিবৃত হইযাছে ষোল চরণে। মুহুর্মুহু পুনরাবৃত্তির জন্য কলেবর অযথা বৃদ্ধি পাইযাছে। রচনাভঙ্গী বৈচিত্র্যহীন বলিযা পাঠকচিত্তকে ছন্দের প্রবাহ আকর্ষণ করিযা লইয়া যায় না। সেজন্য শেষ পর্য্যন্ত এই কাব্য পরীক্ষাপাঠ্য না থাকিলে কাহারও পড়াই হয় না।

কবির বিষয়বস্তুর মহিমা অবিসংবাদিত। কবির আন্তরিকতা অত্যন্ত গভীর, চিত্রাঙ্কনের শক্তিও অপূর্ব্ব। কিন্তু নবীনচন্দ্র প্রথমশ্রেণীর শিল্পী নহেন। তিনি জগন্নাথের মন্দির গড়িযাছেন, কিন্তু ভুবনেশ্বর বা কোনার্কের মন্দির গড়িতে পারেন নাই।

কবি পুরুষের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণরতিকে দেখাইযাছেন দাস্যমিশ্রিত সখ্যভাবে। এই ভাবের আদর্শ ধনঞ্জয। বাসুকি ও উদ্ধবেও ঐ মিশ্রভাবই প্রবল। নারীর পক্ষে দয়িতভাবই স্বাভাবিক বলিযা মনে করিযাছেন। জরৎকারু ও শৈলজার দ্বারা সেই ভাবকে ব্যক্ত করিযাছেন। সকল ভাবের চরমাশ্রয চিরকিশোর দ্বিভুজ মুরলীধর। শ্রীকৃষ্ণের অন্য রূপে আমাদের দাস্যভাবই সার্থকতা লাভ করিতে পারে---অন্য কোন ভাবের চরিতার্থতা হয না। শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারাবতীর পিতামহ নৃপতি বানাইব—অথচ তাহাকে লইয়া প্রেমে ঢলাঢলি করিব, ইহাতে আমাদের বৈষ্ণবহৃদয আদৌ সাড়া দেয না।

নীলকণ্ঠ

যাত্রাগানের জন্য নীলকণ্ঠের নাম রাঢ়বঙ্গে সুপরিচিত। বাংলাদেশে যাত্রাভিনয়ের নাটক রচনা করিয়া অনেকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু এক নীলকণ্ঠ ছাড়া কেহই কবির মর্য্যাদা লাভ করেন নাই। নীলকণ্ঠ যে গানগুলি রচনা করিয়া যাত্রাভিনয়ের কালে প্রধানতঃ নিজেই সুরতাল সংযোগে গাহিতেন—সেগুলি উনবিংশ শতাব্দীর পদাবলীর মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। সেই গানগুলি আজিও রাঢ়বঙ্গের চণ্ডীমণ্ডপে, মাঠে, হাটে, খেয়াতরীতে, দীঘিপুকুরের ঘাটে ঘাটে মুক্তকণ্ঠে উদ্‌গীত হয়। রাঢ়বঙ্গের বৈরাগী ভিখারীরা নীলকণ্ঠের গান গাহিয়া গৃহে গৃহে বৈরাগ্যের বাণী শুনাইয়া ঘুরে। প্রতিদিন অন্নগ্রহণের আগে তাহারা অন্নদাতা ভগবানের করুণার কথা শোনে, তাহাদের বিষয়াসক্ত মন ক্ষণকালের জন্য একটু চঞ্চল হয়। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসেই হয়ত সে চঞ্চলতার পরিসমাপ্তি হয়, কিন্তু প্রতিদিনকার নামশ্রবণের ফল একটু একটু করিয়া তাহাদের চিত্তে সঞ্চিত হইতে থাকে। তাই নীলকণ্ঠকে আমরা ধর্ম্মগুরু বলিয়া মনে করি। নীলকণ্ঠ শাক্ত ছিলেন, কি বৈষ্ণব ছিলেন—এ প্রশ্ন অনেকের মনে জাগিতে পারে। কারণ, তিনি শ্যাম ও শ্যামা দুইএরই গুণগান করিয়া গিয়াছেন। নীলকণ্ঠ যে যুগের লোক সে যুগে শ্যামভক্ত ও শ্যামাভক্তদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তিরোহিত হইয়াছিল। দাশরথি হইতেই এ দ্বন্দ্বের অবসান হইয়াছিল—নীলকণ্ঠ দাশরথিরই অনুবর্ত্তী। এ যুগে ভক্তমাত্রেই শ্যাম ও শ্যামার মধ্যে কোন ভেদ রাখিত না। গৃহস্থরাও দুর্গোৎসবও করিত—দোলের উৎসবও করিত। তাই হিন্দু গৃহস্থেরা ধর্ম্মজীবনের কথায় একসঙ্গে বলে "দোল-দুর্গোৎসব।" অতএব নীলকণ্ঠ ভক্ত শ্রেণীর কবি ছিলেন, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। নীলকণ্ঠ একটি গানে দাশু রায়ের মত লিখিয়াছেন—

শ্যামা শ্যাম হয়েছ।
তখন,—হাসিতে হাসিতে তীখন অসিতে নাশিতে দানবকুল,
এবে—গোকুল আকুল আজ বাঁশীতে করেছ॥

নীলকণ্ঠের কোন কোন গানে কালীপক্ষে এক অর্থ, কৃষ্ণপক্ষে আর একটি অর্থ থাকিত।

নীলকণ্ঠ ইংরাজীর ধার ধারিতেন না, তিনি কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষাও লাভ করেন নাই। তিনি চতুষ্পাঠীর ছাত্রও ছিলেন না, তিনি দাশুর মত হয়ত কোদণ্ডের অর্থও জানিতেন না। তাঁহার রচনায় বহু সংস্কৃত শব্দ বিকৃতরূপ গ্রহণ করিয়াছে—তাহাদের যথাযথ অর্থেও অনেকস্থলে সেগুলি প্রযুক্ত হয় নাই। কিন্তু তবু তিনি জ্ঞানী লোক ছিলেন। প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুর যে সংস্কৃতিধারা সমাজের উচ্চস্তরের লোকযাত্রার মধ্যে দিয়া ও সাধকপরম্পরাক্রমে বাংলার সমতল প্রান্তরে নামিয়া আসিয়াছে, নীলকণ্ঠ তাহার সহজ উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি বেদান্ত, উপনিষদ পড়েন নাই, সংস্কৃত পুরাণও পড়েন নাই—হয়ত বৈষ্ণব পদাবলীও পড়েন নাই। কিন্তু কথকতা শুনিয়াছিলেন, সাধককবিদের রচিত চলিত গানগুলি তাঁহার জানা ছিল,

রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না এবং কীর্ত্তনসঙ্গীতের সুরসিক শ্রোতা ছিলেন। রসকীর্ত্তনের মধ্য দিয়া তিনি পদাবলীর সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পদরচনার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। সকল দেবদেবীই যে এক ব্রহ্মেরই বিবিধ কল্পিত রূপ, এ জগৎ যে মায়াময়, আমাদের অবিদ্যা যে রজ্জুতে সর্পভ্রম, পরমধন লাভের পথ যে ক্ষুরের ধারের ন্যায় দুর্গম, ধনসম্পদের পথ যে সাধনার পথ নয়, দারিদ্র্যই যে তপস্যা, এ সকল তত্ত্ব তিনি ভক্তকবিদের কাছে উত্তরাধিকারসূত্রেই পাইয়াছেন। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞের মতই তাই গাহিয়াছেন—

মা আমার মাতা কি পিতা।
খুঁজে বেদবেদান্ত তন্ত্রমন্ত্র পাইনা মা তোর অন্ত কোথা,
পুরুষ কি প্রকৃতি তোমার মূরতি কেবা জানে বিশ্বমাতা।
তোমার বিশ্বরূপে যেরূপে ভাবে যে সেইরূপে যাওগো তথা।

কিন্তু আর একটি গানে তিনি রামপ্রসাদের অনুবর্ত্তী হইয়া বলিয়াছেন।

হরি তোমার মাতৃরূপই সর্ব্বরূপসার।
সর্ব্বলীলা প্রকাশিলে প্রসবিলে ত্রিসংসার।
পিতার কোলে থাকলে ছেলে স্থির মানে না ক্ষুধা পেলে,
মায়ের কোলে মাকে পেলে পিতার কোলে যায় না আর।
মায়ের মায়া পুত্রে যত পিতার মায়া নয়ক তত
মা কথাটি বদনভরা তুলা দিতে নাই যে তাহার॥

ইহাত জ্ঞানের কথা নয়,—ভক্তির জন্য চাই ব্রহ্মের মাতৃরূপ।

নীলকণ্ঠ কমলাকান্তের মত অনেকগুলি শ্যামাসঙ্গীত ও আগমনী গান রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্ব স্ফুরিত হইয়াছে—বৃন্দাবনের গানগুলিতে। শ্রীরাধার সখীরূপে বৃন্দার প্রাধান্য এই গানগুলিতে যথেষ্ট। শুনা যায় তিনি নিজেই বৃন্দা সাজিয়া এই গানগুলি গাহিতেন। নীলকণ্ঠের পদে শ্রীমতী খণ্ডিতা ও মানিনীরূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। এই প্রকরণের গানগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গান দুইটি খুব প্রসিদ্ধ।

১। আমায় দেগো মোহন চূড়া বেঁধে।
আমি কেন কেঁদে মরি কৃষ্ণরূপ ধরি দাঁড়াইব চরণ ছেঁদে।
ব্রজলীলা আমি করব যতদিন চন্দ্রাবলীর প্রিয় হব ততদিন,
শ্যামের বদননলিন হইবে মলিন রাই অদর্শনের খেদে॥
হয়ে কৃষ্ণ তারে রাধিকা সাজাবো পাথারে ভাসায়ে মথুরাতে যাব,
দুঃখ জানেনা জানেনা জানাব জানাব যে দুঃখ শ্যামবিচ্ছেদে॥
মানভরে যে দিন ঘটিবে প্রমাদ বসনে ঢাকিয়া রাখিব বদনচাঁদ,
কণ্ঠ কহে মাগি নিব অপরাধ ধরিয়ে যুগলপদে॥

আর একটি গান—

২। তোমায় হেরে অঙ্গ জ্বলে কেন বল জ্বালাতে এলে ?
ছিঃ ছিঃ ভৃঙ্গ ফিরে যাও হে বাসি ফুলে কি মধু মিলে ?
গত নিশিতে কার প্রেমেতে কোন্ ফুলেতে মজেছিলে ?
এখন, সখ্যভাব রাখতে প্রভাতে দেখা এসে দিলে !
তাই বলি—হে রসময়, হয়ে গেছে অসময় ;
ক্ষুধার সময় বহে গেলে ভাল লাগে কি সুধা দিলে ?
কণ্ঠ ভণে, প্রভাতকালে কোথা যাও হে চিকন কালা ?
তোমা বিনে কুঞ্জবনে কাঁদে যত ব্রজবালা।
শুকাল কমলের মধু, কমল পড়ে আছে শুধু,
সেইখানে বসো গে বঁধু মধুভরা যেখানে ফুলে।"

নীলকণ্ঠ কালীয়দমন, কলঙ্কভঞ্জন, মান, মাথুর, প্রভাসযজ্ঞ ইত্যাদি প্রকরণের বহু পদ রচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন যশোদা দিনরাত কাঁদেন, তিনি প্রাণের কানুকে স্বপ্ন দেখিয়া নন্দের কাছে স্বপ্নকথা নিবেদন করিতেছেন—

শুন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ
দেখা দিয়ে গোপাল কোথায় লুকালে।
যেন সে চঞ্চল চাঁদে অঞ্চল ধরিয়া কাঁদে,
জননী দে ননী দে ননী বলে।

বাৎসল্য রসের এই পদটী চমৎকার।

ব্রজলীলার পদে যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যভাব একেবারে বর্জ্জনীয়,—অনেক অর্বাচীন পদকর্ত্তারা তাহা বুঝিতেন না। নীলকণ্ঠ মাধুর্য্যের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের মিশ্রণ ঘটাইয়া ফেলিতেন বলিয়া বৈষ্ণব রসিকগণ অনেক সময় ক্ষুব্ধ হইতেন। যেমন,—তাঁহার প্রভাসযজ্ঞের পদাবলীতে। অথচ বৈষ্ণব লীলাতত্ত্ব কবির ভাল করিয়াই জানা ছিল। তিনি যে ব্রজলীলারসের রসিক ছিলেন তাঁহার বহু গানেই তাহার পরিচয় আছে। বৈষ্ণব লীলাতত্ত্ব অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রণয় ঋণ পরিশোধের জন্য স্বর্ণাভরূপ গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। নীলকণ্ঠ গাহিয়াছেন—

যামিনীতে কামিনী লয়ে অতি সংগোপনে হায়।
বিহার করেছ হরি তাহা কি লুকানো যায়।
ছি ছি হে চিকন কালো একাজ কি হ'ল ভালো।
প্রভাতে আসিয়ে কুঞ্জে নিত্য ব্যথা দাও রাধায়।
বনমালী চতুরালী খেলিবে আর কতদিন,
শোধিতে হইবে তোমার প্রেমময়ী রাধার ঋণ।
হা রাধে হা রাধে বলে ভাসিবে দু নয়ন জলে,
পাগল হ'য়ে পথে পথে ঘুরবে তুমি নদীয়ায়॥

সুন্দর চাঁচর কেশ মুড়াইবে হৃষীকেশ,
বিভূতি যতনে লয়ে মাথাইবে সর্ব্ব গায়।

শ্রীকৃষ্ণের মানবিকতা, গ্রাম্যতা ও রাখালিয়া ভাবের পরিস্ফুরণে নীলকণ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদেরও অতিক্রম করিয়াছেন—

তোমরা আমায় শিখিতে লিখিতে দিলে কই ?
বাল্যাবধি নিরবধি জানিনা শ্রীরাধা বই।
বৃন্দে তুমি গুরুমশায় যে বিদ্যা পড়ালে আমায়,
মহাবিদ্যার আশায় আশায় সকল বিদ্যা জলসই।
সকল জেতের হাতে খড়ি আমার জেতের পাঁচনবাড়ি
বেড়াই ব্রজের বাড়ি বাড়ি চুরি করে খাই দই।
চিনলাম না কলমের খৎ শিখায়েছ নাকে খৎ
শিখিয়াছি দাসখৎ, দিয়েছি তায় ঢেরাসই॥
জানি নাক লেখাপড়া জানি গোচারণ করা
শিখায়েছ পায়ে পড়া গায়ে পড়ার দশা অই।
লেখাপড়া কেবল রাধা, তন্ত্র রাধা মন্ত্র রাধা
রাধার কৃপাতে বাঁধা বাধা আমার ব্রহ্মময়ী।
পরমা প্রকৃতি রাধা শ্রীমতীর মতি রাধা,
নীলকণ্ঠের গতি রাধা রাধার কৃপায় জগৎজই।

এই গানটি আমি নীলকণ্ঠের ভণিতাতেই পাইয়াছি। শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলেন—এই গানটি গোবিন্দ অধিকারীর। ভণিতায় "নীলকণ্ঠের" এই কথাটির সহিত ছন্দঃসামঞ্জস্য এমনি চমৎকার হইয়াছে যে, আমি নীলকণ্ঠের পদ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি।

নিম্নলিখিত শশিশেখরী ঢঙের পদটি বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের প্রথম শ্রেণীর না হউক দ্বিতীয় শ্রেণীর পদগুলির সমকক্ষ।

সজল জলদাঙ্গ সুত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুমূলে।
হেরিলে হরে জ্ঞান মন প্রাণ পড়ে পদতলে॥
নবীন নটরাজ রাজে রূপ কিবা ঝলমলে।
সাজ হেরি লাজে দ্বিজরাজ নভোমণ্ডলে॥
এমন মনোহরা মাধুরী না হেরি আর মহীতলে!
প্রখর প্রভাকিরণকর ঝরে মকরকুণ্ডলে॥
উচ্চ শিখিপুচ্ছ চূড়া তাহে বামে পড়ে হেলে।
তুচ্ছ করে জাতি ধর্ম্ম মূর্চ্ছা হানি নারীকুলে॥
ভুবন করি আলো বনমালা কালো গলে দোলে।
মধুর মৃদু হাসিরাশি করে উদাসী, সুধা গলে॥

কণ্ঠ ভণে সহসা ক্ষণে অচেনায় কি চিনিতে পারে ?
ও যে চিনিতে পারে জানিতে পারে কিনিতে পারে বিনা মূলে।

রামপ্রসাদের মত নীলকণ্ঠ ভক্তহৃদয়ের অভিমানও স্থলে স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন—

হরি তোমার বিধান দেখে অবাক হই।
আমি বুঝেছি অন্তরে খোসামোদ চাও চরাচরে।
যে তোমার পড়িবে পদ প্রান্তরে (প্রান্তে ?)
তারে তুমি মোক্ষধামের দাও হে মই।

নীলকণ্ঠের পদাবলীর প্রধান অবলম্বন ভক্তি। প্রায় সকল গানেরই অন্তস্তলে ভক্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত। নিম্নলিখিত গানটিতে ভক্তিরসের চমৎকার প্রকাশ হইয়াছে—

(আমার) কতদিনে হবে সে প্রেমসঞ্চার।
কবে বলতে হরিনাম শুনতে গুণগ্রাম অবিরাম নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
(কবে) স্বরসে রসিক হবে এ রসনা জাগিতে ঘুমাতে করিবে ঘোষণা,
কবে যুগল মন্ত্রে হবে উপাসনা বিষয়বাসনা ঘুচিবে আমার॥
কতদিনে হবে সর্ব জীবে দয়া কতদিনে যাবে গর্ব মোহমায়া
কতদিনে হবে খর্ব মোর কায়া নত হব লতা যে প্রকার॥
কতদিনে হবে জ্ঞানোদয় মম কতদিনে যাবে কাম ক্রোধতমঃ,
কতদিনে হব তৃণাদির সম রজেতে লুণ্ঠিত হব অনিবার॥
কবে যাবে জাতিকুলের ভরম কবে যাবে আমার অযথা শরম,
কবে যাবে আমার ধরম করম কতদিনে যাবে সব লোকাচার॥
কবে পরশমণি করব পরশন লৌহদেহ আমার হইবে কাঞ্চন,
কত দিনে হবে কণ্ঠ বিমোচন জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার॥
কতদিনে শুদ্ধ হবে মম মন কবে যাবে আমার এ ভ্রম ভ্রমণ,
যেথা ইষ্ট মিষ্ট মম পরিবার কতদিনে যাব মধুর বৃন্দাবন।
কতদিনে ব্রজের পথে বুলিবুলি কাঁদিয়ে বেড়াব স্কন্ধে লয়ে ঝুলি
কণ্ঠ কয় কবে পিব করে তুলি অঞ্জলি অঞ্জলি জল যমুনার॥

ভক্তিরস ছাড়া শান্তরসের গান কতকগুলি আছে—এই গুলিতে সংসারের অনিত্যতা, এ দেহের নশ্বরতা ও ক্লিন্নতা, ভোগাসক্তির ভয়াবহ পরিণাম, নিষ্কিঞ্চনতার মহিমা, পারমার্থিকতার গৌরব ইত্যাদির কথা বলা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ জীবন-উমার সঙ্গে মরণ-শঙ্করের বিবাহের চিত্র অঙ্কন করিয়া মৃত্যুকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। পল্লীকবি নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন—

আর কি হরি ফুটবে কভু আমার বিয়ের ফুল।
দেখতে দেখতে বার্দ্ধক্যেতে পেকে এলো মাথার চুল।

বুঝেছি যে আপন মনে
বিয়ে হবে সেই শেষের দিনে শ্মশান মাঝে।
আমি চার বাহকের কাঁধে যাব বিয়ে বাড়ী গঙ্গাকূল॥
অগ্নিকুমারী সুন্দরী তিনিই হবেন সহচরী,
হ'বেন আমার প্রাণেশ্বরী
আমি বরের বেশে বসবো খাটে দারাপুত্র বুঝবে ভুল॥

দুইএকটি লৌকিক ব্যাপার লইয়াও কবি গান রচনা করিয়াছিলেন। যেমন—কলির ধর্ম্ম।

পিতামাতায় অন্ন দিতে দিনে দৈন্যদশা যার,
বনিতায় গয়না দিতে বেতে হয় সে জমিদার।
ভুলাতে রমণী মন করতে পারে দেশভ্রমণ,
পারে না দিনান্তে তারা হরি তোমার নাম জপিতে
জামা গায় কোঁচা দোলায় ছড়ি হাতে জুতা পায়,
বিধুমুখে টপ্পা গায় বিধুমুখীর মন মজাতে।
শ্বশুর সম্বন্ধী এলে পড়ে থাকে তাদের পায়।
গুরু এলে নোয়ায় না শির পাছে টেরি ভেঙ্গে যায়।
একি মরি হায়রে হায় জীর্ণ বসন মায়ের গায়,
সখের শাড়ী শালীরে দেয় মুখের কথা না খসিতে।

নীলকণ্ঠ হাস্যরসের গানও রচনা করিতেন। এদেশে হাস্যরস বহু কাল হইতে আদ্যরসের সহিত সংযুক্ত। নীলকণ্ঠের সময়ে বাংলা দেশে চিঁড়াফলারেরই রেওয়াজ ছিল—লুচিফলার খুবই দুর্লভ ছিল। নীলকণ্ঠ তাই গভীর রাত্রে ক্ষুধার্ত্তকণ্ঠে লুচি-বন্দনা করিয়া যাত্রাগানের শেষ করিতেন।

লুচি, তোমার মান্য ত্রিভুবনে।
তুমি সুপবিত্র শুচি অরুচির রুচি, দেখলে বাঁচি এ জীবনে॥
যাগযজ্ঞ শুভকর্মাদি বিবাহ তোমা বিনা কারও হয় না নির্বাহ;
শ্রাদ্ধ দুর্গাপূজায় মিলে রাজা প্রজায় তোমায় ভাজে সযতনে॥
তব ভাই হয় রুটি আর পরটা, যে না জানে বলে 'পর ওটা'
দালপুরী যেটা সে হয় তোমার জ্যেঠা ভুঁড়ী মোটা সে কারণে।
চাঁদপারা বেটা চাঁদসাহী খাজা, সহোদরা ভগ্নী নাম পাঁপর ভাজা,
খুড়তুতো ভগিনী নাম জিবে গজা—জিবে দিলে আর দেখিনে॥
কন্যা হল তব সুন্দরী কচুরী—খাস্তামণি নাম, মস্ত সে আদুরী,
বিবাহেতে যায় বড়লোকের বাড়ী দেখা না পায় দীন জনে॥
মোসাহেব দুজন ছক্কা বেগুনভাজা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে অঙ্গ করে তাজা।

অজা তোমার প্রজা ঝোলে দেয় মজা, চিনি তোমায় ভাল চিনে।
মণ্ডা মেঠাই তোমার হয় যে কুটুম্ব,তুমি এলে তাদের হয় না বিলম্ব।
তুমি মূলাধার, বহু পরিবার কর্ত্তা ব'লে সবাই মানে॥
তব সহচরী নাম ক্ষীরপুরী মরি মরি তব চরণেতে ধরি।
সপরিবারে একবার দেখতে ইচ্ছা করি আনি নিজ নিকেতনে॥
তুমি যখন বস পাত্রাসন'পরে গরম গরম, পাতে ঘৃতের টোষ ঝরে;
কেউ বা মনে করে কাজ কি মণ্ডাক্ষীরে—শুধু তুলে দিই বদনে।
তব ঘ্রাণ মম নাসিকার' পরে—পবিত্র হইব তোমায় স্পর্শ ক'রে।
খেয়ে দধি চিড়ে গলা গেছে ছিঁড়ে জানবে কি তা অন্য জনে॥
দ্বিজ নীলকণ্ঠ কয়, ওহে লুচি সখা—কতক্ষণে হবে তোমার সঙ্গে দেখা,
ভার হল আমার এ দেহ যে রাখা তব মুখ অদর্শনে।

নীলকণ্ঠের ভাষা সাধাবণতঃ বাংলার চলতি ভাষা, যে ভাষায় রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, কবি-ওয়ালারা এবং গোপাল উড়ে গান লিখিয়াছিলেন এ ভাষা সেই ভাষা। ছন্দও বাঙ্গালীর চল্‌তি ভাষার ছন্দ, যে ছন্দে ছড়াপাঁচালী রচিত হইত। নীলকণ্ঠ অন্যান্য সাধক কবিদের মত ঠারে ঠোরেও অনেক তত্ত্বকথা বলিয়াছেন। কোন কোন গানে অমার্জ্জিত ধরণের রূপকও ব্যবহার করিয়াছেন।

সাহিত্যের দিক হইতে নীলকণ্ঠের পদের বিশেষ মূল্য নাই, তবু বাংলা দেশের গানের ইতিহাসে ও বাঙালী জাতির সাধনভজন প্রসঙ্গে নীলকণ্ঠকে উপেক্ষা করা চলে না।

উনবিংশ শতাব্দীর বিদেশী প্রভাব বর্জ্জিত-গীতিসাহিত্যের নিদর্শন-স্বরূপ নীলকণ্ঠের পদাবলী আলোচিত হইল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য

(১)

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আদর্শ এবং শিক্ষাদীক্ষার সদ্যোমিলন ঘটিয়াছিল। সে মিলন তখন সর্ব্বাঙ্গীণ হইয়া উঠে নাই, সত্য হইয়া উঠে নাই, তাহার সহিত জাতীয় জীবনের সম্পূর্ণ সংযোগও ঘটে নাই। যাহা কিছু পাশ্চাত্য তাহাকে সহজেই বাছিয়া বাহির করা যাইত, তাহা ওতপ্রোতরূপে প্রাচ্যভাবের সহিত অনুস্যূত হয় নাই। জাতীয় জীবনসাগর আতল আলোড়িত হইয়াছিল বটে কিন্তু জাতির নিজস্ব প্রাণলক্ষ্মীর উদ্বোধন হয় নাই।

সাহিত্যে জাতীয় গৌরবের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেই এবং বিষয়বস্তু ও উপকরণ স্বদেশীয় হইলেই কোন সাহিত্য জাতীয় সাহিত্য হইয়া উঠে না। জাতীয় জীবনের সহিত তাহার যোগ থাকা চাই—জাতির অন্তর্জীবনের নিগূঢ় সুখদুঃখ তাহাতে বিম্বিত হওয়া চাই—জাতির প্রাণের গভীর বাণী তাহাতে ধ্বনিত হওয়া চাই। বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার ফলে জাতির উপরিতলে যে সমাজটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল—তাহার কথাই সমগ্র জাতির কথা নয়। পৌরাণিক উপাখ্যান বা রাজপুতজাতির শৌর্য্যকাহিনীর মধ্যে জাতির প্রাণের বার্ত্তা পাওয়া যায় না। এই হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যকে সম্পূর্ণ জাতীয় সাহিত্য বলা যায় না। অবশ্য এ কথাও বলিতে হয়, বঙ্কিমের হাতেই জাতীয় সাহিত্যরচনার ঐ যুগে সূত্রপাত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রপূর্ব্ব যুগের সাহিত্য প্রধানতঃ বস্তুতান্ত্রিক। এই যুগের সাহিত্যে আত্মবিশ্লেষণের বা অন্তরন্বেষণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। বহির্জগতের প্রেরণায় সাহিত্যিকদের হৃদয় বিগলিত হইয়াছে,—অন্তরের উৎসমুখ তখনও মুক্ত হয় নাই।

এই যুগের সাহিত্যে হৃদয়াবেগের অভাব ছিল না, কিন্তু যে সংযম প্রয়োগ করিলে হৃদয়াবেগ রসমূর্ত্ত হয়, সে সংযম অধিকাংশ সাহিত্যিকের ছিল না। হৃদয়াবেগের উচ্ছলিত উৎসারণকেই অনেকে সৎসাহিত্য মনে করিয়াছেন। হৃদয়াবেগ অনেক সময় ভাবাকুলতায় পরিণত হইয়াছে—তাহা ধর্ম্মের পক্ষে যতটা অনুকূল, রসের পক্ষে ততটা নয়।

এই যুগের সাহিত্যে বিদেশ হইতে আহৃত রাশিরাশি চিন্তা ও ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করিবার একটা উৎসাহ দেখা যায়। অভিনব চিন্তাগুলিকে সাহিত্যের পুটে পরিবেষণ করিবার অত্যাগ্রহে সাহিত্যিকরা প্রকাশসৌষ্ঠবের দিকে মনোযোগী হ'ন নাই অর্থাৎ বহু কথা শুনাইবার যতটা তাঁহাদের আগ্রহ ছিল—রসসৃষ্টির দিকে ততটা আগ্রহ ছিল না। প্রকাশ-সৌষ্ঠবটাই যে সৎসাহিত্যের প্রধান অঙ্গ—টেকনিকের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতার উপর যে সাহিত্যের মর্য্যাদা নির্ভর করে—বঙ্কিম ছাড়া তাহা কেহ বড় বুঝিতেন না। তাই কি গদ্যে, কি পদ্যে

তাঁহারা তাড়াতাড়ি একটা কিছু গঠন করিতে পারিতেন—কিন্তু গঠনের সৌষ্ঠব ও কলাশ্রীর দিকে ততটা মনোযোগী হইতেন না। তাঁহারা ভিত্তি দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিতেন, বহু উপকরণ কাজে লাগাইতেন—কিন্তু শোভনশ্রী দান করিতে পারিতেন না। অবশ্য ভিত্তি দৃঢ় ছিল বলিয়াই ঐ সাহিত্য এখনও টিকিয়া আছে—কিন্তু সুষমার অভাবে উপভোগ্য হইতে পারিতেছে না।

তাঁহারা ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের মারফতে সকল তত্ত্বতথ্যের Pragmatic value কষিয়া দেখিতেন; সাহিত্যের ঐরূপ লৌকিক ও ব্যবহারিক মূল্য থাকা চাই বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। যে সাহিত্যে জাতির কোন কল্যাণ হইবে না—তাহাব সৃষ্টিতে তাঁহাদের আগ্রহ ছিল না। অবশ্য মাইকেলের কথা এক্ষেত্রে বাদ দিতে হইবে। নিরবচ্ছিন্ন অবিমিশ্র আনন্দের জন্যই যে সাহিত্য, এ ধারণা তাঁহাদের ছিল বলিয়া মনে হয় না। শ্রেয়োবোধ তাঁহাদের এত বেশী ছিল যে, রসবোধ তাহার কাছে হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছিল। সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহারা যে দীন দুঃস্থ দুর্গত জাতির ঐহিক কল্যাণ কামনা করিয়াছেন তাহাও নহে। অনেকটা সমাজসংস্কার ও চারিত্রিক কল্যাণ সাধন তাঁহাদেব উদ্দেশ্য ছিল। নৈতিক আদর্শটাকে তাঁহারা এত বড় করিয়া দেখিয়াছেন যে, রসের আদর্শ তাঁহাদের নিকট খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। নৈতিক আদর্শকে খর্ব্ব করিতে হইবে এমন কথা বলি না, তাহাকে সমুচ্চ রাখিযাও বসেব আদর্শের মর্য্যাদা রক্ষাকেই সাহিত্যের মর্য্যাদা বক্ষা—ইহা তাঁহাবা মনে কবিতে পাবিতেন না।

রুশীয় সাহিত্যে আর্টকে কাজে লাগাইবার পদ্ধতি দেখা যায়। ফরাসী সাহিত্য সে পদ্ধতির ঠিক বিপরীত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। আমাদের গত যুগের লেখকগণ রুশীয় পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছেন। আমাদের সাহিত্যিকগণ ফরাসী দার্শনিক মতবাদের অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু ফরাসী সাহিত্যের পদ্ধতির অনুবর্ত্তন করেন নাই। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের প্রয়োজনও হইয়াছিল তাহাই; বিলাতী বিদ্যাজাহাজের search-light যখন আমাদের সমাজের উপর পড়িল—তখন দেখা গেল তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘা। গত যুগেব কবিরাজ-দের সেই ঘায়ের চিকিৎসা করিতে হইয়াছে। কি নাট্যে, কি কাব্যে, কি উপন্যাসে, সর্ব্বত্রই সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই উদ্দেশ্যই হইযাছে প্রভু, আর্ট হইয়াছে ভৃত্য।

এই যুগে একমাত্র বিহারীলালই পাশ্চাত্য সাহিত্যধর্ম্মের দীক্ষালাভ করিলেও পাশ্চাত্যদেশের পানে বা ভারতের অতীতের পানে চাহিয়া কাব্যরচনা করেন নাই। তাঁহার কাব্যেই অন্তর অন্বেষণের প্রথম চেষ্টা দেখা যায়, বাংলা কাব্যে বস্তুতন্ত্রের স্থলে ভাবতন্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তন তিনিই করেন। কিন্তু জাতীয় জীবনের সহিত গভীর সংযোগ ঘটে নাই বলিয়া এবং তাঁহার কবিমানসটি পরিপূর্ণ বাণীরূপ লাভ করে নাই বলিয়া তাঁহার কাব্যও জাতীয় সাহিত্য হইয়া উঠে নাই। তাঁহার দৃষ্টি ছিল আত্মসমাহিত, সমগ্রজাতির পানে তিনি চাহিবার অবসর পান নাই।

এ যুগে গদ্যে এক বঙ্কিমই প্রথম জীবনে অবিমিশ্র জাতীয় সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন

কিন্তু ক্রমে তাঁহারও মনে হইল, সাহিত্যে রসসৃষ্টির চেয়ে জাতীয় কল্যাণসাধনই মহত্তর ব্রত। জাতীয় কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তিনিও সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছিলেন—কিন্তু সুন্দরের সহিত শিবের হরগৌরী-মিলন ঘটিয়াছিল বলিয়া তাঁহার সাহিত্য সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। প্রৌঢ় বয়সে সুন্দরকে বর্জ্জন করিয়া তিনি শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন। জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা ছিল এতই অধিক, যে সুন্দরের বঙ্কিম অরণ্যপথ ত্যাগ করিয়া তিনি কল্যাণের সোজা রাজপথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। তাই ঔপন্যাসিক বঙ্কিম অবিমিশ্র কথা-সাহিত্য রচনা ত্যাগ করিয়া উপন্যাসের মধ্য দিয়াও ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন। শেষে তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া সমাজতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যানই হইল তাঁহার প্রধান সাহিত্যব্রত। বঙ্কিম ও বিহারীলালে যে সাহিত্য-প্রতিভার প্রথম উন্মেষ, তাহাই রবীন্দ্রনাথে সম্পূর্ণতা ও চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে।

(২)

দেশের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সাহিত্যাদির আদর অনাদরের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে আমাদের দেশে নরনারীর নৈতিক জীবনের শাস্ত্রীয় আদর্শ যেমনই হউক, সাহিত্যে পুরুষের নৈতিক আদর্শ খুব বড় ছিল না, নারীর নৈতিক জীবনের আদর্শটাই ছিল বড়। সেজন্য যে সাহিত্যে পুরুষচরিত্রের স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দৃষ্ট হইত—কিন্তু নারীর সতীত্বের মহিমা কীর্ত্তিত থাকিত, তাহা বেশ আদর পাইত। বৈষ্ণব-সাহিত্যের রসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া মানিয়া লওয়া সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীর সমালোচকেরা নৈতিক শৈথিল্যের জন্য বৈষ্ণবসাহিত্যকে ততটা আদর করেন নাই।

বিদেশী সভ্যতা প্রচারিত এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশের নৈতিক আদর্শ বদলাইয়া গেল। শিক্ষিত জনসমাজের মনে পুরুষের নৈতিক জীবনেরও একটি উচ্চাদর্শ গড়িয়া উঠিল। তখন সাহিত্যও সেই আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। যে সাহিত্যে নারী ও পুরুষ উভয়েরই নৈতিক জীবনের পবিত্রতার আদর্শ প্রচার করা হইয়াছে—সেই সাহিত্যই দেশে সমাদৃত হইত। দীনবন্ধু পুরুষের নৈতিক জীবন সর্ব্বত্র বড় করিয়া চিত্রিত করেন নাই সত্য, তবু দীনবন্ধু ছিলেন তৎকালের সভ্যসমাজের নব প্রবুদ্ধ নৈতিক আদর্শের গোঁড়া ভক্ত। তাঁহার রচনার মধ্যেই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু তিনি নৈতিক আদর্শ প্রচারের জন্য আদর্শ চরিত্র গঠন করার প্রয়োজন আছে মনে করেন নাই। তিনি পুরুষের দুর্নীতিকেই ব্যঙ্গ করিবার জন্য, তাহাকে নির্ম্মম কশাঘাত করিবার জন্য, অনৈতিক জীবনের দুর্গতি দেখাইবার জন্য উচ্ছৃঙ্খল অসংযত চরিত্র অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমের দেবেন্দ্র দত্ত আর দীনবন্ধুর নিমে দত্ত এক শ্রেণীর জীব। দেশের লোক দীনবন্ধুর উদ্দেশ্যটা বুঝিয়াছিল। তাই দীনবন্ধুর সাহিত্যের আদর করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ঐ রূপ নৈতিক আদর্শই চলিয়া আসিয়াছে। তারপর শরৎচন্দ্র হইতে

নৈতিক আদর্শের আবার রূপান্তর ঘটিয়াছে। এখন আবার পাশ্চাত্য জগতের নৈতিক আদর্শের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে শিক্ষিতসমাজে নৈতিক আদর্শের রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মূল বৃক্ষের ধর্ম্ম উপবৃক্ষে সংক্রামিত হইয়াছে।

এখনকার নৈতিক আদর্শ নরনারী উভয়ের পক্ষে সমান বটে, কিন্তু তাহাদের যৌন শুচিতাটাই তরুণ যুগ-নৈতিক আদর্শের সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করে না। ঐন্দ্রিয়িক শুচিতাই এ যুগে নৈতিক আদর্শের প্রধান উপজীব্য নহে, কঠোর সতীত্বই এখন নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হয় না। আগে যাহাকে দুর্নীতি বলা হইত, এখন ঠিক তাহাকেই দুর্নীতি বলা হয় না। এখন চরিত্রের দৃঢ়তা বা মহত্ত্বের পরীক্ষায় যৌন পবিত্রতার কথাই উঠে না। এযুগে এমন মানুষও কতকগুলি জন্মিয়াছেন নৈতিক দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও যাঁহারা সত্যসত্যই মহাপুরুষ। তাঁহাদের অবদানের গুরুত্বের জন্য তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। তাঁহাদের পানে চাহিয়াও নৈতিক আদর্শটাকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইতেছে। রক্তমাংসের দেহে সে সকল দোষত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, সাহিত্যে সেগুলিকে ক্ষমার চোখে দেখা হইতেছে।

তাই উনবিংশ শতাব্দীর নীতিব্রতী পণ্ডিতগণ যে সকল প্রাচীন কবিদিগকে দুর্নীতির জন্য অর্দ্ধচন্দ্র দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নূতন করিয়া আদর হইতেছে। বৈষ্ণবকবিগণের পদাবলীকে গত শতাব্দীতে কেবল ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছিল। আজ আর ধর্ম্মের দোহাই দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তাহারা নিজস্ব রসৈশ্বর্য্যের জন্যই সমাদৃত হইতেছে। ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের আবার আদর হইতেছে। আজ আমরা ভারতচন্দ্রের মত শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকে কেবল সহ্য করিতেছি না মাথায় তুলিয়া লইয়াছি। এমন কি, তথাকথিত উচ্ছৃঙ্খল সাহিত্যকেও অনেকেই সহ্য করিতেছেন, আদরও করিতেছেন।

গত শতাব্দীতে নৈতিক জীবনের সামাজিক আদর্শের ঠিক অনুগামীই ছিল তাহার বাচিক আদর্শ। কেহ কেহ বলেন, রবীন্দ্রনাথ যে কথা পুষ্পিত ও অলঙ্কৃত ভাষায় লিখিয়াছেন, ঠিক তাহাই অমার্জিত ও অনলঙ্কৃত ভাষায় লিখিয়া সেকালের অনেক কবি অনাদৃত হইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা মনে পড়ে। আমাদের দেশের ধর্ম্মসাধনাতত্ত্বের অনেক ব্যবস্থাই দুর্নীতিমূলক। গত শতাব্দীতে সেগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এখন আর ধর্ম্মের বালাই বিশেষ নাই, থাকিলে সাহিত্যক্ষেত্রেও এখন আর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিবার প্রয়োজন হয় না। তবে তাহারও দিন যায় নাই। এখনকার তারুণ্য প্রৌঢ়তায় পরিণত হইয়া ধর্ম্মতৃষ্ণায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িলে কি হইবে বলা যায় না।

গত শতাব্দীতে শ্রীকৃষ্ণকে নৈতিক আদর্শে মহাপুরুষ করিয়া তুলিবার জন্য অনেক ঘষামাজা করিতে হইয়াছিল এবং তাহাতেই গত শতাব্দীর নৈতিক আদর্শের একটা পরিপূর্ণ রূপ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। আজ যদি বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্রের পুনরুদয় হয়, তবে তাঁহার কলঙ্কটিকে মুছিয়া ফেলিবার জন্য বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করিতে হইবে না। এখনকার কবি বিনা শ্লেষেই বলিবে 'কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালি সর্ব্বদা উজ্জ্বল।'

পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যতার আলোক আমাদের দেশে পড়িবামাত্র শিক্ষিত লোকেরা দেখিলেন—আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে, সমাজে ও নৈতিক জীবনে অজস্র গলদ। এইরূপ গলদ দেখিয়া কেহ কেহ আমাদের সমাজ ও ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। আর যাঁহারা ত্যাগ করেন নাই—তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের লিখিবার ক্ষমতা ছিল, তাঁহারা লেখনীর সাহায্যে সংস্কারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন।

নৈতিক জীবনের সংস্কারের জন্যই সেকালের সাহিত্যসেবীদের ছিল সব চেয়ে বেশী উৎকণ্ঠা। এদেশে প্রচারিত খৃষ্টধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান অঙ্গই হইয়া উঠিয়াছিল নৈতিক আদর্শের উন্নয়ন। দীনবন্ধু ত স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—সেকালের ব্রাহ্মেরাই নৈতিক আদর্শে উন্নত, হিন্দুরা অনুন্নত। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যেমন একটা Puritan movement হইয়াছিল—এদেশেও তেমনি একটা আন্দোলন চলিতেছিল। সেকালে প্রবন্ধ, নাট্য ও কবিতার অধিকাংশই নৈতিক সংস্কারের জন্য রচিত হইত। নাট্যকার মাইকেল ও দীনবন্ধু নাটকে, অক্ষয় কুমার ও ভূদেব নিবন্ধে, টেকচাঁদ, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন সিংহ নকসায়, ঈশ্বর গুপ্ত হইতে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার পর্য্যন্ত বহু কবি কবিতায় নীতিপ্রচার করিয়াছেন।

(৩)

রামমোহনের সময় হইতে প্রবন্ধরচনার প্রথার সূত্রপাত হয়। লেখকদের মধ্যে প্রধানতঃ যাঁহারা কাব্য, নাট্য, উপন্যাস রচনা করিতে পারিতেন না, তাঁহারা প্রবন্ধ রচনা করিতেন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রবন্ধ রচনার উপজীব্য ছিল—

১। সমাজসংস্কার বিদ্যাসাগর মহাশয়ই এবিষয়ে ছিলেন অগ্রণী।

২। ধর্ম্মালোচনা—প্রচলিত লৌকিক ধর্ম্মের বিদূষণ, প্রচলিত পুরাণমূলক ও আচার মূলক ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা—প্রাচীন যুগের বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত, মহাভারত, গীতা ইত্যাদির ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কি? সেকালের ইংরাজিশিক্ষিত লোকদের এই প্রশ্নের উত্তরে ঐ সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সন্ধান না রাখিয়া অনেক ইংরাজিশিক্ষিত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়াছিল, তাহাদের প্রবোধনের জন্য বিশেষ করিয়া এই শ্রেণীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহা ছাড়া, নব প্রবুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ববিচার ছিল।

৩। স্পেনসার, বেকন, লক, হিউম, বার্কলি, কোম্‌তে, রুসো, ভল্‌টেয়ার ইত্যাদি ইউ-রোপীয় মনীষীদের নীতিধর্ম্মমূলক মতবাদপ্রচার, সংস্কারে অন্ধ স্বজাতির প্রকৃত জ্ঞানোন্মেষ সাধনের জন্য।

৪। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে যুক্তিমূলক ক্রমানুসারে নানা চিন্তার উদ্বোধন। ৫। সংস্কৃত সাহিত্য ও সাময়িক বাংলা সাহিত্যের আলোচনা। ৬। লোকশিক্ষা,—শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে ঐগুলির সম্পর্ক। ৭। অসামান্য জীবনবিশেষের দান ও নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা।

এইগুলি জীবনচরিত অথবা আত্মজীবনচরিতের রূপ ধরিয়াছে। কিছু কিছু ভ্রমণ বৃত্তান্তও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

৮। পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিক সাধনার পরিচয়।

গত শতাব্দীর প্রবন্ধলেখকদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, রামগতি ন্যায়রত্ন, কালীবর বেদান্তবাগীশ, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাঃ রামদাস সেন, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ স্বামী, যোগেন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থসংগ্রহ, বঙ্গদর্শন, প্রচার, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, নববিধান, নবজীবন, সাধারণী, প্রবাহ ইত্যাদি পত্রিকায় ইঁহাদের প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইত,—সকল প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে আজিও প্রকাশিত হয় নাই। গত শতাব্দীতে সমাজসংস্কার, জ্ঞানপ্রচার, লোকশিক্ষা, ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যা ও বিদেশীয় নানা মতবাদের আলোচনা প্রবন্ধরচনার প্রধান উপজীব্য ছিল।

শিক্ষাব্রতী ভূদেব বাবুর প্রবন্ধগুলি লোকশিক্ষার জন্যই রচিত। দেশে যখন বিজাতীয় ভাবের প্লাবন আসিয়াছে, তখন তিনি আর্য্যসংস্কৃতির যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দিয়া হিন্দুসমাজকে স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে সচেতন করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভূদেব ছিলেন আদর্শ হিন্দু গৃহস্থ। গার্হস্থ্য জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা বহু প্রবন্ধের উপজীব্য। আমাদের সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবন যাহাতে পাশ্চাত্য ভাবের খরস্রোতে ভাসিয়া না যায়, সেজন্য অকপট উৎকণ্ঠা তাঁহার নিবন্ধগুলিতে পরিস্ফুট। তাঁহার রচনায় যুক্তিমূলক উদারতাও সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

অক্ষয় কুমারও একজন লোকশিক্ষক। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য ও বস্তুজ্ঞান তিনি প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা ভাষায় প্রথম পরিবেষণ করেন। দেশের লোকের অন্ধ কুসংস্কার-গুলিকে বৈজ্ঞানিক আলোকপাতের দ্বারা তিনি দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। এদিকে তিনি একজন ধর্ম্মাচার্য্যও ছিলেন। তাঁহার উৎকণ্ঠা ছিল,—বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির সহিত পরিচিত হইয়া এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে সকল ব্যাপারের বিচার করিতে শিখিয়া পাছে সাধারণ লোক নিরীশ্বর বা ধর্ম্মবিমুখ হইয়া পড়ে. সেজন্য প্রত্যেক নিবন্ধের আদ্যন্তে তিনি ভগবানের গুণগান করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক ব্যাপারকে ভগবানের মহিমার নিদর্শন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সেকালের সমাজের দিকে তাকাইয়া তিনি আমিষভোজন, সুরাপান ইত্যাদির দোষসমূহ দেখাইয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়'। ইহার অধিকাংশ ইংরাজি পুস্তকের (Wilson's Essays and Lectures on the religion of the Hindus) অনুবাদ হইলেও তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বগত গবেষণার ইহা অপূর্ব্ব ফল। ইউরোপীয় বিদ্যাসমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার সুধাটুকু তিনি আমাদের দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার স্বপ্নদর্শন নিবন্ধ হইতেই সম্ভবতঃ এদেশে প্রবন্ধসাহিত্যেরও সূত্রপাত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিবন্ধগুলি লোকশিক্ষা ও সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে রচিত।

পরম ভাগবত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ভগবদ্‌ভক্তিমূলক। অনেক প্রবন্ধে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আত্মজীবনকে কেন্দ্র করিয়া ঘটনা, তথ্য ও পরিবেষের বিবৃতি বাঙ্গলা-সাহিত্যে তাঁহার নবপ্রবর্ত্তন। এবিষয়ে রাজনারায়ণ বসু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরই অনুবর্ত্তী। তাঁহার 'একাল ও সেকাল' ঐ শ্রেণীর রচনা। ইঁহার রচনায় দেশপ্রীতি, স্বধর্ম্ম-প্রীতি, নৈতিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা, অনাড়ম্বর সরল জীবনযাত্রার সহিত উচ্চ চিন্তা ইত্যাদি উপজীব্য হইয়াছে।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রও একজন লোকশিক্ষক। তাঁহার বিবিধার্থ সংগ্রহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বহুশাখার ফলফুলের ভাণ্ডার। প্রধানতঃ তিনি ছিলেন প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ। তাঁহাকে ঐতিহাসিক নিবন্ধরচনার প্রবর্ত্তক এবং ডাঃ রামদাস সেনকে এ বিষয়ে তাঁহার অনুবর্ত্তী বলা যাইতে পারে।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কালীবর বেদান্তবাগীশ, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, চন্দ্রশেখর বসু ইত্যাদি লেখকগণ হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্রাদির যুক্তিমূলক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের রচনা ভক্তের ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ। তাহা ছাড়া, তিনি মহর্ষির মত ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধও ধর্ম্মব্যাখ্যামূলক। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বাবুর মত সামসময়িক সমাজের চিত্রও অনেক নিবন্ধে অঙ্কন করিয়াছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন প্রথম বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মত বিবেকানন্দও ধর্ম্মবিষয়ক উচ্ছ্বাসমূলক বক্তৃতাগুলিকে প্রবন্ধাকার দান করিয়াছেন। আচার্য্য গিরিশচন্দ্র সেন সাধুসন্তদের জীবন ও চরিত্র লইয়া বহু নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ধর্ম্মবিষয়ে এমন অকপট উদারতা অতি অল্প লেখকেরই দেখা যায়। ইনি মুসলমান সাধুফকিরদের জীবনকথা ও মোসলেম ধর্ম্মসংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়া দেন। তিনি তাঁহার রচনাবলীতে দেখাইয়াছেন—ইসলামে ও ব্রাহ্মধর্ম্মে মৌলিক প্রভেদ বিশেষ কিছু নাই, সামাজিক প্রভেদটাই ধর্ম্মের বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতেন এবং ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা তাঁহার বহু নিবন্ধের উপজীব্য ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রবাস- (বোম্বাই) জীবনকে কেন্দ্র করিয়া প্রবাসের পরিবেষ্টনীর সরস চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ইউরোপীয় বীরপুরুষ ও মহাপুরুষদের জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন, আর সত্যচরণ শাস্ত্রী স্বদেশীয় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অগ্রগণ্য পুরুষদের জীবনকথা বিবৃত করিয়াছেন। রজনীকান্ত গুপ্তও ঐতিহাসিক নিবন্ধ রচনা করিতেন। তাঁহার সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস বিখ্যাত অবদান। যোগেন্দ্রনাথ বসু মাইকেলের জীবনচরিত লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রবন্ধরচনায় মৌলিক চিন্তাশীলতার পরিচয়

দিয়াছেন। ভাষাশৈলীতে ইনি বিদ্যাসাগরের অনুবর্ত্তী। ইউরোপীয় তত্ত্ববিদ্যা ও দর্শন লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন—তাঁহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও রাজকৃষ্ণ বাবুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিম, রামগতি ন্যায়রত্ন, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বসু, গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন, যোগেন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র ও বীরেশ্বর পাঁড়ে সামসময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

এই যুগে প্রবন্ধসাহিত্যও কিছু কিছু রচিত হইয়াছিল। সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—ইঁহারা কিছু কিছু প্রবন্ধ-সাহিত্যও রচনা করেন। সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ, বঙ্কিমের কমলাকান্তের দপ্তর, চন্দ্রনাথ বসুর ত্রিধারা, ফুল ও ফল ইত্যাদি, চন্দ্রশেখরের উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম, অক্ষয় সরকারের রূপক ও রহস্য, সনাতনী ইত্যাদি, কালীপ্রসন্ন ঘোষের নিভৃতচিন্তা, নিশীথচিন্তা, প্রভাতচিন্তা, হরপ্রসাদের বাল্মীকির জয় ইত্যাদি পুস্তক প্রবন্ধসাহিত্যের নিদর্শন। ইন্দ্রনাথ হাস্যরসের রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম পেঁচার নক্‌সা হাস্যরস রচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

নাট্যসাহিত্যের ক্রমোন্মেষ

মঙ্গলকাব্যগুলি একাধারে উপন্যাস, নাট্য, সঙ্গীত, কাব্য ও ধর্ম্মশাস্ত্র। মঙ্গলকাব্যগুলি লইয়া অভিনয় না করিলেও এমনভাবে সেগুলির গাওনা হইত, যাহাতে নাটকাভিনয়ের অভাবের কতকটা পূরণ হইত। মঙ্গলকাব্যগুলিতে নাটকীয় ভাবও ছিল প্রচুর। দেশের লোকের নাট্যরসতৃষ্ণা তাহাতেই নিবৃত্ত হইত। বৈষ্ণব রসগুরুগণ তাঁহাদের রসতত্ত্ব উদাহৃত করিবার জন্য সংস্কৃতে নাটক রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবসমাজে দানকেলি-কৌমুদী, জগন্নাথ-বল্লভ, চৈতন্য চন্দ্রোদয়, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব ইত্যাদি সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হইত। মহাভারত রামায়ণ ও অন্যান্য পুরাণাদি অবলম্বনে একপ্রকার যাত্রাসঙ্গীতেরও প্রচলন হইয়াছিল। তাহাতে সঙ্গীতেরই প্রাধান্য ছিল। এইগুলি ইউরোপের মধ্যযুগের Mystery plays বা Miracle plays এর মতন। ক্রমে শ্রীকৃষ্ণলীলা অবলম্বনে যাত্রাসঙ্গীতের প্রচলন হয়—সাধারণভাবে তাহাকে 'কালীয়দমন যাত্রা' বলা হইত। শ্রীকৃষ্ণের লীলাধর্ম্মপ্রচারই এই যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য,—কিন্তু লোকে তাহাতে নাট্যসাহিত্যের রসানন্দও লাভ করিত।

ক্রমে একঘেয়ে সঙ্গীতপ্রধান কৃষ্ণলীলার প্রতি লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিল—বৈষ্ণবপ্রভাবের আতিশয্যও কমিয়া আসিতে লাগিল—লোকের রুচিরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইল। ক্রমে অবৈষ্ণব উপাখ্যান লইয়াও যাত্রাভিনয় আরম্ভ হইল। যাত্রাভিনয়ে সাজসজ্জার বৈচিত্র্য আসিল—নানা পৌরাণিক ঘটনা লইয়া যাত্রার নাটক রচিত হইতে লাগিল—যাত্রার সঙ্গে সঙ ও হাস্যকৌতুক প্রবেশ করিল—বক্তৃতার মাত্রাও বাড়িতে লাগিল। বিদ্যাসুন্দরও গীতিপ্রধান যাত্রাভিনয়ের উপজীব্য হইল। বিদ্যাসুন্দর যাত্রানাট্যের মধ্যে গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিল। গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর খাঁটি পল্লীর ভাষায় রচিত, গানগুলি বাংলার চলতি গতে (Idiom) ভরা, ভঙ্গী অত্যন্ত লঘুচটুল। বিদ্যাসুন্দর শিক্ষিতসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিলাতী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হইলে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক অভিনীত হইতে লাগিল। ইংরাজি নাট্যাভিনয় দেখিয়া আমাদের দেশের লোকে এ যুগের প্রকৃত নাটক ও নাট্যাভিনয় কাহাকে বলে বুঝিতে পারিল। কেবল তাহাই নয়, রঙ্গমঞ্চের তাগিদেই এদেশে নাট্যরচনার সূত্রপাত। আগে রঙ্গমঞ্চ পরে নাটক, তারপর হইতে নাট্যসাহিত্যের নবযুগের সূচনা।

কোন কোন ধনী ব্যক্তি নিজ নিজ গৃহে রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সকল রঙ্গমঞ্চের চাহিদাতেই সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ হইতে থাকে। সবগুলিই অক্ষরে অনুবাদ নয়, কিছু কিছু যোগ-বিয়োগের দ্বারা সেগুলিকে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের উপযোগী করিয়া লওয়া হইত। রত্নাবলী, বেণীসংহার, শকুন্তলা, মালতীমাধব, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র,

চণ্ডকৌশিক, প্রবোধচন্দ্রোদয় ইত্যাদি নাটকের অনুবাদ হয় এবং ধনিগণের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

ইংরাজি ধরণের প্রথম রোমাণ্টিক নাটক যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের কীর্ত্তিবিলাস। বাংলায় প্রথম বিয়োগান্ত নাটকও ইহাই। সংস্কৃত নাটক কখনও বিয়োগান্ত হইত না—নাটককে বিয়োগান্ত করা অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ ছিল—ইংরাজি নাটকের অনুকরণেই কীর্ত্তিবিলাস বিয়োগান্ত। এই সময়ই তারাচরণ শিকদার মহাভারতের সুভদ্রাহরণ অবলম্বনে ভদ্রার্জ্জুন নামে নাটক লেখেন। এই নাটকই প্রথম নূতন ধরণের পৌরাণিক নাটক। লেখক যদিও বলিয়াছিলেন—'করিতেছি সুধাসম নাটক প্রচার'; কিন্তু সে সুধার পরিমাণ বিন্দুমাত্র, জনকয়েকের ভাগ্যেই তাহা মিলিয়াছিল। ইহার অধিকাংশ পয়ারে রচিত।

১৮৩০ খৃঃ অব্দ হইতে বিলাতী ধরণের নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত হয়। ঐ সময়ই বিলাতী ধরণের রঙ্গমঞ্চও কলিকাতায় প্রসিদ্ধ রসজ্ঞ ধনী ব্যক্তিদের গৃহে গঠিত হয়। এই সময়ে হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-১৮৮৪) মহাশয় কয়েকখানা নাটক রচনা করেন। ইঁহার সময়ে কলিকাতায় সাধারণ নাট্যশালাও স্থাপিত হইয়াছিল, ইঁহার রচিত পৌরাণিক নাটক, কৌরববিয়োগ। ব্রহ্মদেশের একটি কাব্যের আখ্যানবস্তু লইয়া তিনি রজতগিরিনন্দিনী নামে আর একখানি নাটক লেখেন; হরচন্দ্র বাবু ভানুমতী চিত্তবিলাস নামে Merchant of Veniceকে বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করেন।

ইহাই ইংরাজি নাটকের সর্ব্বপ্রথম অনুবাদ। তারপর ক্রমে শেক্‌স্‌পীয়রের সিম্বেলিন, টেম্পেষ্ট, রোমিয় জুলিয়েট, কমেডি অব এরারস, ওথেলো, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, উইনটারস্‌-টেল, জুলিয়াস সিজার ও মিডসামার নাইটস ড্রীমের অনুবাদ হয়।

নব্যতন্ত্রের প্রথম উল্লেখযোগ্য নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৫)। ইনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে ইহার মতামত ছিল উদার। ইনি রত্নাবলী, শকুন্তলা, বেণীসংহার, মালতীমাধব ইত্যাদি নাটকের অনুবাদ করেন। একেবারে অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ নয়, নাট্যকার নিজেই বলিয়াছেন—"অনুবাদপ্রবৃত্ত হইয়া আধুনাতন নিয়মানুসারে নাটক অভিনয়োপযোগী করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে রসভাবাদি পরিবর্ত্তিত, পরিত্যক্ত ও সন্নিবেশিত করিয়াছি।" [মঙ্গলাচরণ, অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক]।

সমাজসংস্কারমূলক নাটকের সূত্রপাত কুলীনকুলসর্ব্বস্বে। রঙ্গপুরের কুণ্ডী গ্রামের জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন—কুলীনকামিনীদের দুর্দ্দশা অবলম্বনে যিনি একখানি নাটক লিখিবেন তিনি ৫০৲ টাকা পুরস্কার পাইবেন। এই বিজ্ঞাপনই ঐ নাটকখানির রচনায় মূল প্রেরণা। এই নাটকের অনুসরণেই আমাদের দেশে সামাজিক কদাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে নাটকীয় অভিযান চলিতে থাকে—ফলে এইশ্রেণীর বহু নাটকই ক্রমে ক্রমে রচিত হইয়াছে।

ডাঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন—"কু-কু-স ঠিক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই, তবুও ইহা সাফল্যের সহিত কয় বার অভিনীত হইয়াছিল। এই সাফল্য বইটির কোন নাটকোচিত

গুণের জন্য নয়, ইহাতে যে সামাজিক নক্‌সা গুলি আছে তাহার বাস্তবতা ও সরসতা তাহার একমাত্র কারণ।"

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব (১৮৫৪) ও নবনাটকে-ই নবযুগের নাটকের প্রকৃত সূত্রপাত।* সে যুগে একটি নিষ্করুণ ও জঘন্য কুপ্রথা শিক্ষিত লোকের মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল—সেই কুপ্রথা কৌলীন্য ও তজ্জনিত বহুবিবাহ। ঐ কুপ্রথাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য ও সমাজসংস্কারসাধনের উদ্দেশ্যেই নাটক দুইখানি রচিত বলিয়া মনে হয়। তর্করত্ন নব্য ঢঙে রুক্মিণী-হরণ, ধর্ম্মবিজয়, সুনীতি সন্তাপ ইত্যাদি পৌরাণিক নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল নাটকের জন্য তিনি এদেশের নাট্যগুরু নহেন। তর্করত্নের পৌরাণিক নাটকে যাত্রার প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু এই নাটক দুইখানিতে সংস্কৃত ও বিলাতী প্রভাবও বিদ্যমান। কুলীনকুলসর্ব্বস্বেই বিয়োগান্ত সামাজিক নাটকের সূত্রপাত। নাটকখানিতে প্রচুর হাস্যরসের উপাদানও আছে। ছয় শতাব্দী ধরিয়া অব্যাহতভাবে চলিলেও কৌলীন্যের মধ্যে একটা দারুণ অসত্য ও অসঙ্গতি বিদ্যমান। তাহা যেমন পরিতাপের বস্তু—তেমনি পরিহাসের বস্তু। লেখক এই কুপ্রথার উপহাস্যতা দেখাইতে গিয়া স্থলে স্থলে গ্রাম্যতা দোষের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু গ্রাম্য চরিত্র সৃষ্টি করিতে স্বাভাবিকতার জন্য, তাহার প্রয়োজন ছিল বলিয়াই মনে হয়। ব্রাহ্মণদের ভোজনলুব্ধতা দেখাইবার জন্য নাট্যকার ফলার সম্বন্ধে একটি সুন্দর কবিতা নাটকের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তর্করত্ন মহাশয় একেবারে সংস্কৃত প্রভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই—সেজন্য সংস্কৃত নাটকের মত নান্দী, প্রস্তাবনা, মাঝে মাঝে শ্লোক ও কবিতাংশের প্রক্ষেপ, দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের সমাবেশ ইত্যাদি সংস্কৃত নাটকের প্রকৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়। যাহাই হোক—তর্করত্নই দীনবন্ধুর আবির্ভাবের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন।

সেকালের সামাজিক কুপ্রথার মধ্যে প্রধান কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, পণ-প্রথা, গ্রাম্য ঘোঁট-দলাদলি, নারীপীড়ন ইত্যাদি। এই সঙ্গে ইংরাজিশিক্ষিত লেখকরা নারীর বিশেষতঃ বালবিধবার চিরবৈধব্যব্রতপালনকে একপ্রকারের নারীপীড়ন বলিয়া মনে করিতেন। বিধবার পুনর্বিবাহের সমর্থনকল্পে এযুগে অনেকগুলি নাটক রচিত হয়। তন্মধ্যে উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিধবাবিবাহের সমর্থক-দিগের নিন্দা ও ব্যঙ্গ করিয়াও একাধিক নাটক রচিত হয়।

*নবনাটকও বরাতী রচনা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রেরা এই নাটক লিখাইয়া ২০০৲ টাকা পুরস্কার দেন। ইহাও উদ্দেশ্যমূলক নাটক। সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে রচিত বলিয়া সাহিত্যে ইহার কোন দাবি নাই। অজ্ঞাতনামা কোন লেখকের সম্বন্ধসমাধি নামক নাটকের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন এই শ্রেণীর সকল নাটক সম্বন্ধেই তাহা বলা যাইতে পারে। "সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া সাধারণের মানস তৃপ্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কেবল এই কুপ্রথা (বাল্যবিবাহ প্রথা) কি প্রকারে নিবারিত হইতে পারে এই মাত্র চেষ্টা।" 'বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে এই সময়ের আরো দুইখানি নাটক শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের 'বাল্যবিবাহ' ও শ্যামাচরণ শ্রীমানীর 'বাল্যোদ্বাহ নাটক'।

এ সমস্ত অনাচাব বাঙ্গালী হিন্দুসমাজেব নিজস্ব। বিলাতী সভ্যতাব আবির্ভাবে আমাদেব সমাজে নব নব কদাচারের প্রাবল্য ঘটিল। যেমন, সুবাপান—অভক্ষ্য ভক্ষণ, স্বধর্ম-দ্রোহ, লাম্পট্য, যবনীগমন, আত্মীয়দ্রোহ, সাহেবিয়ানা, সাহেবেব গোলামি ইত্যাদি। কিছুকাল পবেই এই সমস্ত অনাচাব, ব্যভিচাবেব বিরুদ্ধে বঙ্গমঞ্চে অভিযানেব সূত্রপাত হইল। এ সময়কাব নাটকগুলিব নামেও উদ্দেশ্যটাব ইঙ্গিত থাকিত——যেমন,—কলিকৌতুক নাটক, বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক নাটক, বেশ্যানুবক্তিবিষমবিপত্তি নাটক ইত্যাদি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তাঁহাব নিকট প্রতিবেশী ঠাকুব বাবুদেব মত নাট্যসাহিত্যেব ও বঙ্গমঞ্চেব একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নিজেও বিক্রমোর্ব্বসী ও মালতীমাধবেব :অনুবাদ কবিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সমাজেব কদাচাবকে কশাঘাত কবিবাব জন্য নাটক না লিখিয়া হুতোম পেঁচাব নক্সা লিখিয়াছিলেন। তাঁহাব বাবু নাটকেব নাম শুনিয়াছি, বোধ হয় তাহা সেকালেব বাবুদেব প্রতি আক্রমণ ই হইবে।

কলিকাতাব ধনিসম্প্রদায় নিকৃষ্টশ্রেণীব নাটকেব অভিনয়ে অজস্র অর্থব্যয় কবিতেছেন দেখিয়া মাইকেল নিজেই নাটক বচনায় অগ্রসব হইলেন। তখন তিনি বঙ্গভাষায় একখানি চিঠিও লেখেন নাই, কিন্তু এমনি তাঁহাব প্রতিভা যে অল্পদিনেব মধ্যেই—শর্ম্মিষ্ঠা (১৮৫৮) ও পদ্মাবতী (১৯৫৯) নামে দুইখানি নাটক লিখিয়া ফেলিলেন।

শর্ম্মিষ্ঠা পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে বচিত হইলেও ইহাই বাংলা সাহিত্যে প্রথম আসল বোমাণ্টিক নাটক। ইংবাজি নাটকেব প্রভাব ইহাতে থাকিলেও ইহা বত্নাবলী শকুন্তলাব আদর্শেই বচিত। ইহাব ভাষা সংস্কৃতানুগ, মনে হয় যেন ইহা কোন সংস্কৃত নাটকেব অনুবাদ। মহাভাবতীয় উপাখ্যানকে কবি ইংবাজি নাটকেব আদর্শে সেকালেব উপযোগী কবিয়া লইয়াছেন। সপত্নীদ্বেষই নাট্যেব বসবস্তু। ইহাতে মানসিক দ্বন্দ্বসংঘর্ষেব লীলাও আছে।

পদ্মাবতী আব একখানি বোমাণ্টিক নাটক। ইহাব গল্পাংশ গ্রীকপুবাণ হইতে গৃহীত—ইহাকে সহজেই কবি সংস্কৃত নাটকেব ছাঁচে ঢালিতে পাবিয়াছেন। ইহাব কথাবস্তুব ক্রমোন্মেষ-সাধনে কোন ত্রুটি নাই—ভাষা সংস্কৃতানুগ। ঘটনাঘনতাব জন্য ইহা চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই নাটকেবও স্থায়ী ভাব ঈর্ষ্যা। শচী, বতি ও মুবজাব রূপলাবণ্যসম্বন্ধে পবস্পবের ঈর্ষ্যাই নাটকটিব গতিপ্রকৃতির নিয়ামিকা।

কৃষ্ণকুমাবী নাটকেব মূল কথাবস্তু রাজস্থানেব ইতিহাস হইতে গৃহীত হইলেও ইহা খাঁটি ঐতিহাসিক নাটক নয়। ধনদাস, বিলাসবতী, মদনিকা ইত্যাদি চবিত্রেব অবতাবণায় ইহা বোমাণ্টিক নাটকেই পবিণত হইয়াছে। Intrigue বিলাতী নাটকেব একটি প্রধান রসবস্তু। পদ্মাবতীতে Intrigue এর একটা আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে বাস্তবতার অভাব। কৃষ্ণকুমারীতে এই Intrigue নাটকেব গতিপ্রকৃতিকে গ্রীকনাটকেব মত করিয়া তুলিয়াছে।

সমাজেব অবিচাব অত্যাচাব লইয়া পূর্ব্বে যে নাটকগুলি বচিত হইয়াছে—সেগুলি

বিয়োগান্ত হইতে বাধ্য—কারণ, সকল অবিচার অত্যাচারের পরিণতিই শোচনীয়। এই গুলিকে আসল Tragedy বলা যায় না। নিজের অনায়ত্ত ঘটনাচক্রের ফলে এই যে পরিণাম—ইহাতেই আসল Tragedy হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারীর আত্মবিনাশটাই Tragedy নয়,—পিতা ভীমসিংহকে নিজের আদরের দুলালীকে বলিদান দিয়া যে একটা জাতীয় অনর্থ এড়াইতে হইল—ইহাই Tragedy.

বাঙ্গালা ভাষায় প্রহসন আগেই রচিত হইয়াছিল। রামনারায়ণের উভয়সঙ্কট, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল. চক্ষুদান—এই তিনখানি বঙ্গসাহিত্যের প্রথম প্রহসন। মাইকেল 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা', এই দুইখানি প্রহসন রচনা করেন।

মাইকেল ইংরাজিতে কথা বলিতেন, ইংরাজিতে ভাবিতেন, ইংরাজিতে স্বপ্ন দেখিতেন—কিন্তু তিনি তাঁহার মাতৃভাষা ভুলেন নাই। মেঘনাদবধের ভাষা তাহার অনেক আয়াসে অধ্যবসায়ে শেখা ভাষা, আমি সে ভাষার কথা বলিতেছি না। ঐ ভাষা পিতৃভাষা হইতে পারে, মাতৃভাষা নয়। তাঁহার নিজস্ব মাতৃভাষায় তিনি এই প্রহসন দুইখানি রচনা করিয়াছেন। 'একেই বলে কি সভ্যতার' পাত্রপাত্রীদের সহিত মাইকেলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, কিন্তু সাহেব মাইকেল বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ এর পাত্রপাত্রীদেরও যেরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। কেবল তাহাই নয়—তাহাদের মুখের কথা অবিকল নকল করিতে পারিয়াছেন। এই বইখানিকে দীনবন্ধুর রচনা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। অসাধারণ কবিপ্রতিভার পক্ষে সবই সম্ভব। মাইকেলের মধ্যে যে এত চটুলতা, তরলতা ও হাস্যরসিকতা প্রচ্ছন্ন ছিল আমরা এই বইখানি না পড়িলে জানিতেও পারিতাম না। প্রথম খানি নব্যবঙ্গের বিজাতীয় জীবনযাত্রাকে ব্যঙ্গ করিয়া রচিত—দ্বিতীয়খানি বাংলার নিজস্ব ভণ্ডামি ও হীনরুচিকে আঘাত করিবার জন্য পরিকল্পিত। মাইকেল মনে প্রাণে বুঝিতেন —তাহার কল্পিত দুটি সমাজই জঘন্য, দুইটিই কশাঘাতের যোগ্য।

এই পর্য্যন্ত যে নাটকগুলি রচিত হইয়াছিল—সেগুলিকে সাহিত্যাংশের তেমন উৎকৃষ্ট বলা না গেলেও বঙ্গের নাটকসাহিত্যের একটা ভিত্তি এইগুলির দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। অন্ততঃ এইগুলির সেই হিসাবেও মূল্য আছে।

বঙ্গরঙ্গমঞ্চে এইবার যাঁহার আবির্ভাব হইল—তিনি পরিপূর্ণাঙ্গ শক্তি ও প্রতিভা লইয়াই অবতীর্ণ হইলেন। ইঁহার আবির্ভাবে নাট্যসাহিত্যের শিক্ষানবিশীর মেয়াদ ফুরাইয়া গেল—Experimental Stage কাটিয়া গেল। ইনি দীনবন্ধু। বিলাতী আদর্শে ইনি নাট্য রচনা করিয়াছেন—কিন্তু নবীন তপস্বিনী ছাড়া ইহার কোন নাট্যে বিলাতী ভাব নাই, সংস্কৃত প্রভাবও ইঁহার নাট্যে নাই—যাত্রাসঙ্গীতের কোন চিহ্নও নাই। দীনবন্ধুর নাটকগুলি বঙ্গসাহিত্যের ও বাঙ্গালী সমাজের সম্পূর্ণ নিজস্ব সামগ্রী—বঙ্গসাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি। দীনবন্ধু তাঁহার নাটকগুলির জন্য যদি কাহারও কাছে ঋণী হন, তবে রামনারায়ণেরই কাছে। তাঁহার কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ও নবনাটক দীনবন্ধুর নাটকগুলির অগ্রদূত। দীনবন্ধুর নাটকের গঠন কলাশ্রী-মণ্ডিত। তাঁহার চরিত্রসৃষ্টি ও চরিত্রগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি অপূর্ব্ব। মানবচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার

অভিজ্ঞতা অগাধ। নীলদর্পণের ভদ্রজাতীয় কয়েকটি চরিত্র ছাড়া তাঁহার অন্যান্য নাটকে পাত্রপাত্রীর মুখের ভাষা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অবশ্য স্বাভাবিকতা সৃষ্টি করিতে গিয়া অনেকস্থলে গ্রাম্যতা দোষ ঘটিয়াছে।

দীনবন্ধুর নীলদর্পণ বাঙ্গালী রায়তদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের চিত্র দেখাইবার জন্য ও সেদিকে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই রচিত। কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া রচিত নাটক অধিকাংশ ক্ষেত্রে রসসাহিত্য হইয়া উঠে না। দীনবন্ধুর কলা-চাতুর্য্যের গুণে ও সকরুণ কবিহৃদয়ের মাধুর্য্যের সমাবেশে নীলদর্পণ একখানি উৎকৃষ্ট নাটকে পরিণত হইয়াছে। নীলদর্পণে নীলের কথা 'লালে'-লেখা এ'লাল' প্রজার বুকের রক্তের। অসহায় বাঙ্গালী রায়তের প্রতি কবির গভীর মমতা এই নাটকে রসরূপ ধরিয়াছে। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাট্যসাহিত্যে একটি নূতন ধারারও প্রবর্ত্তন হইয়াছে। নীলকররা দেশের রাজা ছিল না বটে, কিন্তু ছিল রাজার সজাতি কুটুম্ব। ইহারাও দেশের শাসক ও শোষক হইয়া উঠিয়াছিল। নিরীহ দুর্ব্বল অসহায় বাঙ্গালীর উপর ইহাদের অত্যাচারের কাহিনীকে নাটকের বিষয়বস্তু স্বরূপ গ্রহণ করিয়া দীনবন্ধু নাট্যসাহিত্যে দেশাত্মবোধের প্রথম সঞ্চার করিলেন। এই দেশাত্মবোধই পরবর্ত্তী বহু নাটকের রসবস্তু হইয়াছে। রাজ্যশাসনে উৎপীড়িত প্রজা আর নাটকে স্থান পায় নাই বটে,—কিন্তু ঐতিহাসিক কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া ঐ দেশাত্মবোধই নানাভাবে নাট্যরূপ লাভ করিয়াছে।

দীনবন্ধু পৌরাণিক নাটক লেখেন নাই—বঙ্গের তৎকালীন সামাজিক জীবনকেই নাট্যের উপজীব্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার সধবার একাদশী ও জামাইবারিক—শ্রেষ্ঠ সামাজিক প্রহসন। আজিও তাহাদের যশ সমান ভাবেই অক্ষুণ্ণ আছে। ঐ নাটক দুইখানিতে তিনি তৎকালীন সামাজিক জীবনের অসঙ্গতি, গ্লানি ও অনাচার গুলিকে একদিকে যেমন কশাঘাত করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি সেইগুলি লইয়া অফুরন্ত হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। অথচ এইগুলির মধ্যে কোন্ একটি উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত নাই। নির্ম্মল রসানন্দ উপভোগের জন্য রচিত সামাজিক নাটক এই প্রথম। দীনবন্ধু মূলতঃ হাস্যরসের নাট্যকার। যেসকল নাটকে হাস্যরসের অবতারণা নাই, তাঁহার সেই নাটকগুলি ভাল জমে নাই। এই নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য এই—অট্টহাস্যের অন্তরালে বাঙ্গালী নারীজীবনের গভীর বেদনা ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে।

সেকালে হিন্দু কলেজ হইতে যে সকল ছাত্র বাহির হইত—তাহারা বিলাতী শিক্ষায় এমনি বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া উঠিত, যে হিন্দুসমাজের প্রত্যেক আচার আচরণকে বর্বরজনোচিত মনে করিত, ব্রাহ্মদিগকেও নৈতিক আদর্শনিষ্ঠার জন্য ব্যঙ্গ করিত, সাহেবদের অনুকরণ করাই জীবনের পরম ব্রত মনে করিত। সাহেবরা মদ খাইত বলিয়া ইহারা মদ খাওয়াকে সভ্যতার প্রধান অঙ্গ মনে করিত। এই শ্রেণীর বিজাতীয়ভাবাপন্ন যুবকদিগকে কশাঘাত করা ও তাহাদের অধঃপতন দেখানো সধবার একাদশী রচনার একটি প্রেরণা। দীনবন্ধু নাটকীয় কলা-কৌশলের গুণে ও কৌতুকরসের আতিশয্যে একটি লোকশিক্ষার অঙ্গকে সাহিত্যে পরিণত

করিয়াছেন। সধবার একাদশীর নিমচাঁদ সে যুগের ইংরাজী-শিক্ষিত তরুণ-সমাজের প্রতিনিধি। নিমচাঁদ এখনও মরে নাই,—কখনও মরিবে কিনা জানিনা—এখনও আমাদের সমাজে নিমচাঁদের অভাব নাই। সধবার একাদশীর লোকশিক্ষাগত দিকের মূল্য এখনও নষ্ট হয় নাই। এই নাটকের ভাষায় স্থলে স্থলে সুরুচির অভাব আছে।

থিয়েটারের সাজসজ্জায় এত ব্যয় হইত যে ধনী লোকেরা ছাড়া অন্য কেহ নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন না। সধবার একাদশীর মত সামাজিক নাটক (যাহাতে পোষাক পরিচ্ছদের কোন খরচ নাই) পাইয়া অল্পবিত্ত যুবকেরাও থিয়েটার করিতে পারিল এবং সাধারণ নাট্যশালা (ন্যাসনাল থিয়েটার) প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হইল।

দীনবন্ধুর আগে উমেশচন্দ্র মিত্র বিধবাবিবাহ নামক একখানি নাটক লেখেন। নাটকখানি বিয়োগান্ত। ইহাতে ব্রাহ্মগণের পক্ষ হইতে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ছিল।

দীনবন্ধুর পর গিরিশচন্দ্রের আগে আরও কয়েকখানি নাটকের প্রসিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে কবি সুরেন্দ্র মজুমদারের হামির, হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান', উপেন্দ্রনাথ দাসের শরৎ সরোজিনী ও সুরেন্দ্রবিনোদিনী, শিশিরচন্দ্র ঘোষের নয়শ রুপেয়া—এইগুলি উল্লেখযোগ্য।

এইগুলি ছাড়া, প্যারীচাঁদের আলালের ঘরের দুলাল, বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস, তারাশঙ্করের কাদম্বরী, রামগতি ন্যায়রত্নের রোমাবতী, এবং রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলিও নাট্যাকারে পরিণত হয়।

দীনবন্ধুর পর উল্লেখযোগ্য নাট্যকার মনোমোহন বসু। ইনি প্রধানতঃ পৌরাণিক বিষয় লইয়া নাটক রচনা করিতেন। বঙ্গমঞ্চে বিলাতি ঢঙের নাটকগুলিই অভিনীত হইত। দেশে যে যাত্রাভিনয়ের নাটকগুলি ছিল—সেগুলি পল্লীগ্রামে চলিলেও নগরে অচল হইয়া আসিয়াছিল। মনোমোহন নূতন ঢঙে যাত্রাভিনয়ের পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়া নগরের রঙ্গমঞ্চে অন্যান্য নাটকের সঙ্গে পাংক্তেয় করিয়া তুলিলেন। পরে তাহারই ধারা অনুসরণ করিয়া গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। মনোমোহনের নাটকগুলির মধ্যে সতীনাটক, হরিশ্চন্দ্র, রামাভিষেক,—বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্য নাটকগুলির মধ্যে প্রণয়পরীক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

ইহার পর অসংখ্য পৌরাণিক নাটক রচিত হয়—রামায়ণ মহাভারত পুরাণের কোন উপাখ্যান আর বাকি থাকিল না—বঙ্গমঞ্চের চাহিদায় এই সময়ে অনেক কাব্যও নাট্যাকারে পরিণত হয়,—যেমন গদ্যকাব্য কাদম্বরী, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, রামেশ্বরের শিবায়ন, বিদ্যাসুন্দর, মেঘনাদবধ কাব্য।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসকে নাট্যরূপ দান করেন।

বিহারীলাল গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা বর্ষীয়ান ছিলেন। ইনি বেঙ্গল থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন এবং নিজে ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। ইনি প্রভাসমিলন, জন্মাষ্টমী, সীতাস্বয়ম্বর, রাজসূয় যজ্ঞ, বাণ যুদ্ধ, নন্দবিদায়, মোহশেল ইত্যাদি কয়েকখানি নাটক রচনা করেন।

ইঁহাকেই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম নটনাট্যকার বলা যাইতে পারে। ইঁহার মৌলিক নাটকগুলি যাত্রাসঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবান্বিত।

তারপর আসিলেন বিখ্যাত নট নাট্যকার গিরিশচন্দ্র। (১২৫০-১৩১৮।) ইনি বঙ্গ-বঙ্গমঞ্চে যুগান্তর ঘটাইয়াছেন। প্রথমে ইনি সখের থিয়েটারে দীনবন্ধুর কোন কোন নাটকের (নিমাইচাঁদ প্রভৃতি) ভূমিকাগ্রহণ করিয়া নটবিদ্যা শিখিয়া ল'ন। তারপর নিজে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হ'ন। ইনি নাটকরচনায় নটবিদ্যার কলাকৌশল সংযোগ করিতে পারিয়াছিলেন। নিজে সুদক্ষ নট ছিলেন বলিয়া—কি ভাবে নাটকের ঘটনাপরম্পর সাজাইলে, কিরূপ দৃশ্যের অবতারণা করিলে এবং কোন পাত্র পাত্রীর মুখে কি ভাবের কথা বলাইলে লোকরঞ্জন হইবে, তাহা ভাল বুঝিতেন। মোটের উপর, নটবিদ্যার দ্বারা তাঁহার নাটক নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। সাহিত্যরচনা গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল না—অভিনয়ের দ্বারা লোকরঞ্জনই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহার নাটকগুলি অর্দ্ধসৃষ্টি—পূর্ণতা লাভ করিত অভিনয়ের দ্বারা। তিনি যাহা সৃষ্টি করিতেন তাহা পড়িতে কেমন লাগিবে তাহা ভাবিতেন না—বঙ্গমঞ্চে কেমন জমিবে তাহাই ভাবিতেন। রচনায় যে ত্রুটী থাকিত—অভিনয়ে তাঁহার পরিচালনায় তাহার পূরণ হইয়া যাইত। এইজন্য নাটকগুলির অভিনয় দেখিলে যেমন রস পাওয়া যায়, পড়িয়া তেমন রস পাওয়া যায় না। নাটক রচনায় শেক্সপীয়ারের কোন ত্রুটী বা কোন অঙ্গহানি থাকিতে পারে, সেযুগের অন্যান্য সাহিত্যিকদের মত তিনিও তাহা কল্পনা করিতে পারিতেন না। ফলে, শেক্সপীয়ারের দোষগুলিরও তিনি অনুসরণ করিয়াছেন। এমনকি সামাজিক নাটকেও তিনি শেক্সপীয়ারের ঐতিহাসিক ও রোমাণ্টিক নাটকের টেকনিক অনুসরণ করিয়াছেন।

লোকশিক্ষক হিসাবে গিরিশচন্দ্রের তুলনা নাই। গিরিশচন্দ্র বঙ্গমঞ্চের মারফতে দেশে সমাজসংস্কার করিতে ও ধর্ম্ম নীতি প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। সমাজের অবিচার অনাচারগুলিকে তিনি মর্ম্মস্পর্শী করিয়া নাট্যে প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছেন। দর্শকের চিত্ত যাহাতে সমাজের অবিচার অত্যাচার দেখিয়া বিগলিত হয়, সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল। বুদ্ধদেব, শঙ্কর, চৈতন্য, বিল্বমঙ্গল ইত্যাদি মহাপুরুষের লীলাজীবন তিনি নাটকাকারে প্রকটিত করিয়া দেশের লোকের ধর্ম্মবোধ জাগাইতে ও ধর্ম্মতৃষ্ণার তৃপ্তিসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবিষয়ে তিনি রামকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঐতিহাসিক নাটকও অনেক লিখিয়াছিলেন। সেগুলির নাম—অশোক, চণ্ড, সৎনাম, সিরাজ, মিরকাসেম, ছত্রপতি ও আনন্দ রহো। ঐতিহাসিক নাটকে যথাযোগ্য ঐতিহাসিক পরিবেষ্টনী সৃষ্টি করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু এই শ্রেণীর নাটকের মধ্য দিয়া তিনি দেশাত্মবোধ ও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

নৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল সামাজিক নয়, পৌরাণিক নাটকও তিনি অনেক লিখিয়াছেন। ঐসকল নাটকে নৈতিক সাহস, তেজস্বিতা, সত্যনিষ্ঠা, আত্মোৎসর্গ, শরণাগত-রক্ষণ, পাতিব্রত্য ইত্যাদি নৈতিক সদ্‌গুণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার পৌরাণিক নাটক প্রচলিত যাত্রাসঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবান্বিত। পৌরাণিক চরিত্র গুলিকে তিনি তাঁহার

উদ্দিষ্ট আদর্শের অনুযায়ী করিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন এবং অনেকস্থলে সেগুলিকে মানবিক দোষে গুণে জীবন্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তাঁহার অধিকাংশ নাটক লোক-কল্যাণ-কামনায় রচিত। অবিমিশ্র আমোদ দিবার জন্যও তিনি অনেকগুলি নাটক লিখিয়াছেন—এইগুলি প্রহসন-শ্রেণীর। তিনি যেমন কাঁদাইতে পারিতেন,—তেমনি হাসাইতে পারিতেন। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের সঙ্গে হয়ত তাঁহার তুলনা হয় না, কিন্তু বঙ্গের তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। বাংলার জাতীয় জীবন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম্মজীবন, সমাজ, সংসার, পারিবারিক জীবন সমস্তই গিরিশচন্দ্রের নাট্যের উপজীব্য হইয়াছে। স্বদেশের অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের স্মৃতিস্বপ্ন আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে গিরিশের কল্পনা অবিশ্রান্ত বিচরণ করিয়াছে। সাহিত্যসেবার চেয়ে যেন একটা মহত্তর ব্রতের প্রেরণায় তাঁহার লেখনী অবিশ্রান্ত ছুটিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক সাধারণতঃ নগরবাসী চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুখদুঃখ, দোষ ত্রুটী, আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া রচিত। নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুঃখক্লেশ ও জীবন-যাত্রার সমস্যা যে কত গভীর, তাহা গিরিশচন্দ্র দরদ দিয়া বুঝিতেন। নিম্নশ্রেণীর লোকদের ২।৪টি চরিত্রও এই সকল নাটকে আছে বটে, কিন্তু তিনি নিম্নশ্রেণীর নরনারীর সামাজিক জীবনচিত্র লইয়া নাটক রচনা করেন নাই। সে যুগে উহা আশ্রয় করিয়া কোন উপন্যাসও রচিত হয় নাই। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের ভাষা সাধারণ চল্‌তি গদ্য—কিন্তু ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের ভাষা পদ্যাত্মক। তিনি এজন্য রাজকৃষ্ণ রায় প্রবর্ত্তিত অসমমাত্রিক মিলহীন পয়ার ছন্দকে বহু নাটকে নাট্যোক্তির বাহন করিয়াছেন। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধ্বনিও তাহাতে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়।

গিরিশচন্দ্র যে ছন্দে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকগুলির অনেকাংশ লিখিয়াছেন, তাহা গদ্য ও পদ্যের মাঝামাঝি। মাইকেল-প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে কেবল মিলই নাই; কিন্তু ছন্দো হিল্লোল আছে, মাত্রা-যতির সুনির্দ্দিষ্ট রীতি আছে, প্রত্যেক পংক্তির অক্ষর-সংখ্যার নির্দ্দিষ্ট হিসাব আছে। গিরিশবাবুর এ ছন্দে মাত্রা-যতির বালাই নাই, অক্ষরসংখ্যার কোন নিয়ম নাই, ছন্দোহিল্লোল ত নাই-ই। গদ্যবাক্যের শব্দগুলির স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া এমন করিয়া সাজানো হইয়াছে, যাহাতে কবিতা বলিয়া ভ্রম হয়। অবশ্য স্থলে স্থলে প্রকৃত কবিতার পংক্তিতেই দাঁড়াইয়াছে।

কোন্ ভাষায় কোন্ ভঙ্গিতে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া রচনা করিলে নট-নটীদের রসনায় বেশ সুশ্রাব্য হইবে এবং শ্রোতার চিত্তবিনোদন হইবে, তাহা তিনি বেশ বুঝিতেন। কাজেই এই ছন্দের উক্তিগুলি শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করিত, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। গিরিশচন্দ্র এই ছন্দ Experiment হিসাবে ব্যবহার করেন নাই, এই ছন্দকেই তিনি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া চালাইয়াছিলেন। অন্যান্য নাট্যকারগণও এই ছন্দের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের বিষয়বস্তু ভারতের যে অতীত যুগের ইতিহাস

হইতে গৃহীত—সে অতীত যুগের স্মৃতি আমাদের স্বপ্নময়। গিরিশচন্দ্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন—সাধারণ গদ্যে এই স্বপ্নযুগের কথা তেমন জমে না। গিরিশের এই ছন্দে অন্ততঃ সেযুগের একটা আবেষ্টনী বা atmosphere-এর সৃষ্টি হইয়াছে—এটুকুও কম লাভ নয়!

পতিত-পতিতা-পরিবেষ্টিত নিজের জীবনযাত্রার প্রতি গিরিশচন্দ্রের শ্রদ্ধা ছিল না। সেকালের ব্রাহ্মসমাজ ও উচ্চশিক্ষিত সমাজ তাঁহার বৃত্তি ও রঙ্গমঞ্চকে ঘৃণার চোখে দেখিত। রামকৃষ্ণদেবের করুণা লাভ করিয়া গিরিশচন্দ্রের আত্মধিকৃত সন্তপ্ত প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়া ছিল। এই আশার বাণী তাঁহার অনেকগুলি নাটকের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত ধ্বনিত হইয়াছে। ভক্তমালের উপাখ্যান পড়িয়া তিনি আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর যে মহাপণ্ডিত ও মহাকবি ছিলেন, তিনি যে 'শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতে'র রচয়িতা, তাহা তিনি বোধ হয় জানিতেন না। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের সহিত তাঁহার পরিচয় থাকিলে তাহার অমূল্য শ্লোকাবলী অথবা সেগুলির নির্য্যাস বিল্বমঙ্গলের মুখে বসাইয়া নাটকখানিকে ধর্ম্মপুস্তকে পরিণত করিতে পারিতেন। বিল্বমঙ্গলের উপাখ্যানের সহিত সাধু সুরদাসের উপাখ্যান মিলাইয়া তাহাতে আপন মনের মাধুরী ও আপন মর্ম্মের বেদনা মিশাইয়া তিনি যে বিল্বমঙ্গল রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার ভক্তজীবনের অনুপম আলেখ্য। তিনি ভক্তির মহিমাকীর্ত্তনে কর্ণামৃতকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। পৌরাণিক নাটকে সাধারণতঃ চরিত্র সৃষ্টি করিতে হয় না,—পুরাণে আগে হইতেই চরিত্রগুলি পরিকল্পিত। নাট্যকার চরিত্রগুলিতে রঙের উপর রসান দিতে পারেন অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে মানবিকতা (Humanism) আরোপ করিতে পারেন,—তাহাদিগকে রক্ত-মাংসে জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারেন, তাহাদের জীবনে অন্তর্দ্বন্দ্বের লীলা দেখাইতে পারেন। জনা নাটকের কথাই ধরা যাক্।

গিরিশচন্দ্রের জনা নাটকে অবশ্য চরিত্রগুলি অতিমানবতা ত্যাগ করিয়া মানবিকতালাভে ততটা জীবন্ত হইয়া উঠে নাই। জনা চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে—আর কোন চরিত্রে নাই। জনা চরিত্রে তিনি রঙের উপর রসান দিয়াছেন।—কিন্তু তাহার জন্যও তিনি মৌলিকতার দাবী করিতে পারেন না। কারণ, মাইকেল বীরাঙ্গনাকাব্যে আগেই জনাচরিত্রকে যে ভাবে ফুটাইয়াছেন, গিরিশচন্দ্র সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক আবহাওয়াসৃষ্টিরও চেষ্টা করেন নাই। মহাভারতের যুগের জীবনাবেষ্টনী বা রাষ্ট্রীয় আবেষ্টনী ইহাতে ফুটে নাই। বরং বিদূষকের মুখের বর্ত্তমান কালোপযোগী কথাবার্ত্তা (এমন কি ফারসী শব্দের মুহুর্মুহু প্রয়োগ ইত্যাদি) আবেষ্টনীসৃষ্টিতে বাধাই দিয়াছে। নাটকের অধিকাংশে বিশেষতঃ পৌরাণিক চরিত্রগুলির মুখের কথায় গিরিশচন্দ্র অনিয়মিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের পদ্যভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন—ইহা কতকটা পৌরাণিক আবেষ্টনীর সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে। এই ভাষাভঙ্গী আমাদের মনকে বর্ত্তমান কাল হইতে অনেকটা দূরে লইয়া যায়। কিন্তু পাত্র-পাত্রীর ভাষণগুলি সুরচিত নয় এবং পদ্যের ছন্দ

ও ভাষা গ্রহণ করিয়াও তিনি তাহাতে কলাশ্রীসম্পাদনে তেমন অবহিত হ'ন নাই বলিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য অনেকস্থলেই ক্ষুণ্ন হইয়াছে। বীরাঙ্গনা কাব্যে মাইকেল নিয়মিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে ওজস্বিতা প্রকাশ করিয়াছেন—গিরিশের ভাষায় তাহার রীতিমত অভাব।

এই সব ত্রুটী সত্ত্বেও পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে জনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই নাটকে বিদূষক চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের নিজের সৃষ্টি। নাটকখানির উদ্দেশ্য হরিভক্তিপ্রচার। বিদূষকের সাহায্যেই তাঁহার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইযাছে।

বিদূষক চরিত্রটি নানা উপাদানে সৃষ্ট। সংস্কৃত নাটকের ঔদরিক বিদূষক, যাত্রা নাটকের ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নারদ এবং King Learএর fool এই সমস্তকে মিলাইযা গিরিশচন্দ্র বিদূষক চরিত্রের সৃষ্টি করিযাছেন। এই চরিত্রটি নাটকের মধ্যে কূটস্থ চরিত্র—সে মানবজীবনের গভীর রহস্যের সন্ধান জানে। সে তাই নাটকের সুখদুঃখের লীলায় মুহ্যমান নয়। সত্য তাহার নখদর্পণে,—সারতত্ত্ব তাহার অধিগত, তাই সে অসার ব্যাপার লইয়া পরিহাস উপহাসই করে। তাহার মুখের বচন ব্যঙ্গোক্তি, বক্রোক্তি ও শ্লেষে পরিপূর্ণ। সফরীর মত তাহার বচনলীলা, কিন্তু রোহিতের মত সে অগাধজলসঞ্চারী। হরির প্রতি তাহার ভক্তি অগাধ—কিন্তু মুখে সে হরিবিদ্বেষই প্রচার করে। হরি অন্তর্যামী,—ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন। তাই সে নিশ্চিন্ত।

ঐহিক সম্পদ ধ্বংস করিয়া হরি আধ্যাত্মিক সম্পদ দান করেন। ঐহিক সৌভাগ্য ধ্বংস করেন বলিযা সে হরির নিন্দা করে মৌখিক ভাবে। কিন্তু সে জানে ঐহিক সৌভাগ্য অসার এবং ইহার ধ্বংস না হইলে মোহস্বপ্নের আধ্যাত্মিক জাগরণ হয় না। জনা-প্রবীরের হরি-বিদ্বেষের পরিণাম সে জানে, তাই বক্রোক্তির দ্বারা বার বার সে তাহাদের সাবধান করিয়া দিয়াছে। এই চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই চরিত্রই জনা নাটকখানিকে আজিও বাঁচাইযা রাখিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত হয গান ও কবিতা রচনায়। তারপর তিনি অভিনয বিদ্যার অনুশীলন করেন। অভিনয়বিদ্যায় নিষ্ণাত হইয়া তিনি নাটক রচনার দিকে মন দেন। নাটকরচনার হাতেখড়ি হয বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যরূপদানে। তারপর তিনি গীতিনাট্য রচনা করেন। তারপর তিনি রূপকনাট্য ও রঙ্গনাট্য রচনা করেন। ক্রমে তাঁহার প্রতিভার ধারা আয়ততর হইলে তিনি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। একখানি ঐতিহাসিক নাটক লেখার পরই তিনি পৌরাণিক নাটকরচনায় মনোনিবেশ করেন। ৫।৬ বৎসরের মধ্যে চৌদ্দখানি পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়া ফেলেন। সম্ভবতঃ পৌরাণিক নাটকের রীতিপ্রকৃতি ও আদর্শের অভিনবতার জন্য ঐ শ্রেণীর নাটক দর্শকেরা চাহিতেছিল। ইহার পরই তিনি ভক্তিরসাত্মক নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন—ভক্তিধর্ম্মপ্রচারের জন্য তিনি ভারতের সাধু, ভক্ত ও মহাপুরুষদের জীবনবৃত্তকে নাট্যাকারে পরিণত করেন। গিরিশচন্দ্র ছিলেন ভাবতান্ত্রিক ও আদর্শবাদী, তিনি বস্তুতন্ত্রীয় (Realistic) রচনার পক্ষপাতী ছিলেন না—সেজন্য তিনি সামাজিক নাটক রচনা করিতে চাহেন নাই। কিন্তু থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের প্রয়োজন ও

দর্শকদের চাহিদা বাহির হইতে এবং দুর্গত দুঃস্থ স্বজাতির প্রতি গভীর সহানুভূতি ভিতর হইতে তাঁহাকে সামাজিক নাটক রচনায় প্রণোদিত করে। তারপর দেশের কল্যাণকল্পে ও দেশ-মাতৃকার আহ্বানে তিনি ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দেশাত্মবোধমূলক নাটক রচনা করেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছিল গুরু পরমহংসদেব-প্রচারিত পরমতত্ত্বের প্রচার রঙ্গমঞ্চের মধ্য দিয়া। বাংলার রঙ্গমঞ্চ রামকৃষ্ণমঠে পরিণত হইল। যদি জীবিকার সঙ্গে নাট্যরচনার সংযোগ না থাকিত, তাহা হইলে কেবল অধ্যাত্মতত্ত্বমূলকনাটকই হয়ত তিনি শেষ জীবনে রচনা করিতেন। এই শ্রেণীর নাটকের ফাঁকে ফাঁকে তিনি সামাজিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকও লিখিয়াছেন, কিন্তু এ সকল নাটকগুলির অন্তরে সূত্ররূপে কেন একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিদ্যমান থাকিত। দর্শকদের চাহিদাতে এবং জীবিকার তাড়নায় তিনি প্রহসনও ২।৪ খানি লিখিয়াছেন এবং সেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথের অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার শেষ নাটক শঙ্করাচার্য্য ও তপোবল। দুইখানিতেই দার্শনিক তত্ত্ব রূপ লাভ করিয়াছে।

সাহিত্য হিসাবে গিরিশচন্দ্রের রচনার যে মূল্য থাকুক্, লোকশিক্ষা, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার ওরঙ্গ-মঞ্চের সমুন্নতিসাধনে তাঁহার দানের তুলনা নাই। ধর্ম্মবিমুখ, তত্ত্ববিমুখ, বিজাতীয় ভাবাপন্ন বাঙ্গালী শিক্ষিত এবং ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বাঙ্গালী জনসাধারণকে গিরিশচন্দ্র ভারতের সংস্কৃতি, জাতীয় সাধনা ও ধর্ম্মসম্পদকে নাটকের মধ্য দিয়া পরিবেষণ কয়িয়া দেশের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়াছেন। লোকরঞ্জনের জন্য নিশ্চয়ই তাঁহার নাটকে নানা তত্ত্বের সমাবেশ হয় নাই। জনবল্লভ রঙ্গমঞ্চের পরিচালনার সুযোগ পাইয়া গিরিশচন্দ্র গুরুর নির্দ্দেশ পালন করিয়াছেন। অনিচ্ছাতেও দর্শকদের ঐসব তত্ত্বের কথা শুনিতে হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র জীবিকার মধ্য দিযাই জীবনের মহাব্রত পালন করিয়াছেন। বহু মনীষী তত্ত্বমূলক গ্রন্থাদি রচনা কবিযা বহু বক্তৃতা করিয়া, বহু গুরু গম্ভীর জ্ঞানোপদেশ দিয়া যাহা করিতে পারেন নাই—গিরিশচন্দ্র তাহা বঙ্গ-মঞ্চের প্রমোদের মধ্য দিয়াই করিয়াছেন।

এই সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি সকলশ্রেণীব নাটক লিখিয়াছেন। ইঁহার ঐতিহাসিক ও দেশাত্মমূলক নাটকের মধ্যে পুরুবিক্রম, সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক ও অশ্রুমতী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'স্বপ্নময়ী' বোমাণ্টিক নাটক, সামান্য ইতিহাসের সূত্র ইহাতে আছে। জ্যোতিবাবু কযেকখানি প্রহসনও লিখিয়াছেন। তিনি অনুবাদে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ফরাসী মলিয়ের দুইখানি নাটকের, শেকস্‌পিয়বেব জুলিয়াস সিজারের, একখানি বর্ম্মীনাটকের ও ১৭ খানি সংস্কৃত ও প্রাকৃত নাটকেব অনুবাদ করেন।

এই সময়ের আর একজন বিখ্যাত নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র। ইনি গিরিশচন্দ্রের সামসময়িক। ইনি অনেকগুলি নানাশ্রেণীর নাটক রচনা করেন কিন্তু গীতিনাট্য-রচয়িতা হিসাবে ইঁহার খ্যাতি ছিল।

রাজকৃষ্ণ রায় আর একজন বিখ্যাত নাট্যকার। ইঁহার অধিকাংশ নাটকই পৌরাণিক। পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে নরমেধযজ্ঞ ও প্রহ্লাদচরিত্র প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিক নাটক-গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বনবীর ও লৌহকারাগার। ইঁহার অনেকগুলি প্রহসন রঙ্গমঞ্চে

অভিনীত হইত। ইনি অবিশ্রান্ত লেখনী চালনা করিতেন—মাত্র ৪৪ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। যাহাকে আমরা গৈরিশ ছন্দ বলি তাহা ইঁহারই প্রবর্ত্তন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অসংখ্য নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে। এই গুলির অধিকাংশ উৎসবশেষে মাটির প্রদীপের মত উৎসবক্ষেত্র হইতে দূরীভূত হইয়াছে—তৈজস প্রদীপের মর্য্যাদা লাভ করে নাই। এইগুলির মধ্যে রোমাণ্টিব, সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক সকল শ্রেণীরই নাটক আছে। *

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের আগে যাত্রার পালাগুলির প্রভাব দলবিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের পর যাত্রার বহু নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল। যাত্রার প্রায় সকল নাটকই পৌরাণিক। যাত্রার নাটকলেখকদের মধ্যে ব্রজমোহন রায় ও মতিলাল রায়ের নাম সুপ্রসিদ্ধ। যাত্রার নাটকগুলি পড়িয়া দেখার সুবিধা আমাদের হয় নাই—তবে যাত্রাভিনয়

* এই সময়ে রচিত পৌরাণিক নাটকের সংখ্যাই বেশি— এই সকল নাটক যাত্রা-নাটকের নাগরিক রূপ। সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রণয়পরীক্ষা, আনন্দময় (মনোমোহন বসু), দুর্গোৎসব (বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়), সুধা না গরল (জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কার), মনোরমা (মদনমোহন মিত্র), কুলীনকন্যা অথবা কমলিনী (লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী), সুরেন্দ্রবিনোদিনী ও শরৎসরোজিনী (উপেন্দ্রনাথ দাস), সাক্ষাৎদর্শন (দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়)।

প্রহসনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বুঝলে কি ?' নিমাই-শীলের 'এরাই আবার বড লোক।' মহেশ চন্দ্র দাসের কুলপ্রদীপ। মীরমশররফ হোসেনের এর উপায় কি ? জ্যোতিরিন্দ্র নাথের কিঞ্চিৎ জলযোগ, এমন কর্ম্ম আর করব না বা অলীক বাবু। গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবার দাঁতে মিশি মুন্সীনামদার নামে ছদ্মবেশেও কোন লেখক অনেকগুলি প্রহসন রচনা করেন।

দেশীয় সাহিত্য ও বিদেশীয় সাহিত্য হইতেও কতকগুলি নাটক এই সময়ে রচিত হয়, বিদেশী নাটকেরও অনুবাদ হয়। দেশীয় সাহিত্য কাদম্বরী হইতে নাটক রচনা করেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাই শীল, গৌরসুন্দর চৌধুরী ও উমেশচন্দ্র মিত্র। মেঘনাদবধ হইতে ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় দে, হরিশ তর্কালঙ্কার; রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নফরচন্দ্র দত্ত, টেকচাঁদের আলালের দুলাল হইতে হীরালাল মিত্র, রামগতি ন্যায়রত্নের রোমাবতী হইতে সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নাটক রচনা করেন।

চণ্ডীমঙ্গল হইতে শ্যামলাল বসাক, রামেশ্বরের শিবায়ন হইতে কালিদাস মুখোপাধ্যায় এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর হইতে অনেকেই বহু নাটক রচনা করেন।

বিদেশী নাটকের অনুবাদ—বেণীমাধব ঘোষের ভ্রমকৌতুক (শেকস্‌পীয়ারের Comedy of Errors হইতে), নিমাই শীলের চন্দ্রাবতী (Reynold's Loves of the Harem হইতে), কালীপদ ভট্টাচার্য্যের প্রভাবতী (Scott 's Lady of the Lake হইতে), হরলাল রায়ের রুদ্রপাল (Hamlet হইতে), জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রজতগিরি (বর্ম্মী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ হইতে), প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়ের সুরলতা (Merchant of Venice হইতে এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের টেমপেষ্ট ও রোমিওজুলিয়েটের অনুবাদ।

হরলাল রায় বেণীসংহার নাটক হইতে শত্রুসংহার নাটক এবং শকুন্তলা হইতে কনকপদ্ম নাটক লেখেন।

অনেক দেখিয়াছি। তাহাতে মনে পড়ে—এই নাটকগুলির অনেকাংশে কবিত্ব আছে, পৌরাণিক চরিত্রগুলিতে রঙের উপর রসান দেওয়ার কৌশল আছে এবং অনেক সুরচিত গানও এইগুলিতে আছে। সমগ্রভাবে কোন নাটক অবশ্য সাহিত্যের পদবীতে উঠে নাই। থিয়েটারে যে সকল পৌরাণিক নাটক অভিনীত হইয়াছে, সেগুলির চেয়ে এইগুলি যে বিশেষ নিকৃষ্ট, তাহা মনে হয় না। আমাদের দেশের সাধারণ লোকে যাত্রা ছাড়িয়া থিয়েটার দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কারণ বিশুদ্ধ উচ্চারণ, মার্জ্জিরুচি ও সৌষ্ঠবের সহিত ভদ্র-সম্প্রদায়ের লোকের অভিনয়, বৈচিত্র্য-প্রীতি, এবং নানা শিল্পকলার সমবায়ে রঙ্গমঞ্চের সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, ঐন্দ্রজালিক কৌশল ও বিস্ময়োদ্দীপকতা। তাহা ছাড়া, তাহারা বেহালার বদলে হারমোনিয়াম-ক্লারিওনেট শুনিতে চাহিযাছিল, এবং বাস্তবরাজ্য ছাড়িয়া স্বপ্নরাজ্যে মসগুল হইতে চাহিযাছিল। রঙ্গমঞ্চের এই মনোহারিত্ব সৃষ্টির জন্য বহু অর্থব্যয় হইত। এজন্য কলিকাতাব বনিয়াদী ধনীরাই বহুদিন পর্য্যন্ত রঙ্গমঞ্চের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। পাইকপাড়া, জোড়া-সাঁকো, পাথুরিয়াঘাটা, শোভাবাজার ইত্যাদি অঞ্চলের বিদগ্ধ ভূস্বামিগণ ছাড়া কলিকাতার আরও অনেক ধনী ব্যক্তি প্রতিযোগিতা করিয়া নিজ নিজ গৃহে রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেন। এমন কি অনেকে এজন্য সর্ব্বস্বান্ত হ'ন। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চপ্রতিষ্ঠার পরে তাঁহারা এই দায় ও ব্যসন হইতে অব্যাহতি পান। অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে—তাঁহারা পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন এবং ব্যয়ভার বহন করিতেন বলিয়াই এদেশে নাট্যসাহিত্য, অভিনয়বিদ্যা ও রঙ্গমঞ্চের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তাঁহাদের বঙ্গমঞ্চের চাহিদাতেই বহু নাটকও রচিত হইয়াছিল। কিন্তু নাট্যকারদের যথাযোগ্য শক্তির অভাবেই নাট্যসাহিত্য,-- কাব্যসাহিত্য ও কথাসাহিত্যের ন্যায় উৎকর্ষ লাভ করে নাই।

জনসাধারণ সংস্কৃত বা ইংরাজি নাটকের অনুবাদে বা পৌরাণিক নাটকে ততটা আনন্দ পায় নাই, ঐ সকল নাটকের মঞ্চপটভূমিকাই তাহাদেব আনন্দ দিয়াছে। যাত্রার আসবে লোকে ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক পায় নাই, থিযেটারে তাহারা ঐ দুই শ্রেণীর নাটক পাইয়া খুশী হইল। ঐতিহাসিক নাটকগুলি স্বতই পরাধীন ভারতের পরাজয, বিড়ম্বনা, লজ্জা, অপমান, নির্য্যাতনভোগ, নারীর অমর্য্যাদা ইত্যাদি লইযাই রচিত। পরাধীন ভারতে যে নরনারী কিছুমাত্র শৌর্য্য ও তেজস্বিতা দেখাইয়াছে, তাহার চরিত্রগৌরবকে অতিরঞ্জিত কবিয়া দেখানো হইত। তাহার ফলে ঐগুলির দ্বারা দেশানুরাগ প্রচারিত হইয়াছে।

সামাজিক নাটকগুলি সাধারণতঃ আমাদের সমাজের সর্ব্ববিধ গ্লানিকলঙ্কের চিত্রের দ্বারা গুম্ফিত। যে সকল প্রথা সমাজের অহিতকর এবং যেগুলির প্রবর্ত্তন হিতকর—সেই সকল প্রথার কথাই স্বতই উপজীব্য হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর সমাজসংস্কারের যুগে। তাহার ফলে ঐ শ্রেণীর নাটকেরও আদর হইয়াছে। আর একশ্রেণীর সামাজিক নাটকে সম্প্রদায় বিশেষ বা প্রথাবিশেষকে লইয়া রঙ্গব্যঙ্গ হাসিমস্করা করা হইয়াছে। এইগুলি প্রহসন শ্রেণীতেই পড়ে। যাত্রার ইতর ধরণের সঙ দেখিয়া দেখিয়া লোকে অবশ্যই বিরক্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত রুচির হাস্যপরিহাস উপভোগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল।

দেশে অল্প অল্প করিয়া শিক্ষাবিস্তার হইতেছিল। সেজন্যও লোকে ঐ প্রহসনগুলি উপভোগ করিতে পারিত। এই প্রহসনগুলি কেবল বিদ্বৎসমাজেরই উপভোগ্য ছিল না। অমৃতলাল বসু বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রহসনের হাস্যরস ঘন হইয়া উঠে নাই। তবে অবিমিশ্র হাস্যরসের প্রহসন খুব কমই রচিত হইয়াছে—অধিকাংশ প্রহসনেও সমাজসংস্কারের আকাঙ্ক্ষাই প্রচ্ছন্ন থাকিত।

রোমান্টিক নাটকও অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল—এই শ্রেণীর নাটকের রসবোধ করিতে হইলে কতকটা শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষিত লোক ছাড়া এই শ্রেণীর নাটকের আদর বড় কেহ করে নাই।

পৌরাণিক নাটকের মধ্য দিয়া ভক্তিধর্ম্মপ্রচারের সূত্রপাত হওয়ায় পৌরাণিক নাটকের রূপের অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়—ভক্তিপিপাসু লোকেরা এই শ্রেণীর নাটকের সমাদর করিত। মনে রাখিতে হইবে, ভক্তিবিহ্বলতা ও নাট্যকলার উপভোগ স্বতন্ত্র পদার্থ। জাতীয় জীবনের বৈচিত্র্য থাকায় নাটকের বিষয়বস্তুর জন্য ইতিহাস ও পুরাণকে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে।

দেশের তুচ্ছতম ঘটনাকেও নাট্যরূপ দেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তারকেশ্বরের মোহান্তের নারীধর্ষণ লইয়াই বহু নাটক রচিত হইয়াছে। প্রিন্স অব ওয়েলেসের বাঙ্গালী ভবনে আতিথ্য স্বীকার লইয়াও নাটক রচিত হইয়াছে। বিষয়বস্তুর অভাবে কেবল অনুবাদ নয়—দেশে প্রচলিত কাব্য, গল্প, উপন্যাসগুলিকেও নাট্যাকার দেওয়া হইত।

যাত্রায় বিশেষতঃ কৃষ্ণযাত্রায় গানেরই প্রাধান্য ছিল—দেশের লোক নাটকের সঙ্গে গান শুনিতে অভ্যস্ত ছিল। থিয়েটারের নাটকে সেজন্য গান বর্জ্জন করা সম্ভব হয় নাই। সেজন্য স্থানে অস্থানে, কারণে অকারণে গান এমন কি কীর্ত্তনাঙ্গের গানও সংযোজন করা হইত। কেবল গানের দ্বারা যখন যথেষ্ট মনোহারিতা সম্পাদন হইতেছে না মনে করা হইল, তখন তাহাতে নাচও সংযোগ করা হইল। দেশের লোকে গান ভালবাসিত বলিয়া গীতিবহুল গীতিনাট্য যে বিশেষ আদৃত হইত তাহাও নয়। লোকে চাহিয়াছিল—টিকিট কিনিয়া থিয়েটার দেখিতে গেলে নাচ, গান, বক্তৃতা, বিলাতী কনসার্ট, রূপসজ্জা সমস্তই একসঙ্গে উপভোগ করিবে। এইরূপ মনোভাবের চাহিদাতেও বহু নাটক রচিত হইয়াছে।

থিয়েটারের গোড়ার দিকে রঙ্গমঞ্চে নারীর ভূমিকা বালক ও যুবকরাই করিত। তাহার পর নারী যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল—তখন দর্শক ও শ্রোতাদের নূতন আকর্ষণের সৃষ্টি হইল। আয়োজনের ত্রুটী ছিল না। কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত অভিনয়বিদ্যার বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। সপুত্রক গিরিশচন্দ্রের রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অভিনয়বিদ্যা অনুন্নত অবস্থাতেই থাকিয়া গিয়াছিল।

বিখ্যাত নটনাট্যকার অমৃতলাল বসু সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনার প্রয়োজন। বাগ্‌বিন্যাসের কৌতুকময় সরসতার জন্য অমৃতলালের রচনা প্রসিদ্ধ—এই সরসতা তাঁহার রচিত কবিতা ও প্রবন্ধেও দেখা যায়। অমৃতলালই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন-রচয়িতা। তাঁহার

রচিত প্রহসনগুলির মধ্যে খাসদখল, বিবাহবিভ্রাট, তাজ্জবব্যাপার, চোরের উপর বাটপাড়ি, চাটুয্যেবাঁড়ুয্যে, কৃপণের ধন, একাকার, তিলতর্পণ, কালাপানি, বাবু ইত্যাদি একসময় বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চকে মাতাইয়া রাখিয়াছিল। সামাজিক কদাচার, অনাচার ও অসঙ্গত আচারগুলিকে আক্রমণ করিয়া এই প্রহসনগুলি রচিত। এইগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য লোকরঞ্জন, গৌণ উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা ও সমাজসংস্কার। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রহসনগুলির তুলনায় এইগুলিতে মার্জ্জিত রুচির রঙ্গব্যঙ্গের প্রাচুর্য্য ও রসঘনতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অমৃতলাল পৌরাণিক নাটকও রচনা করিয়াছেন। সেগুলি তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই।

গিরিশচন্দ্র সিরাজউদ্দৌল্লা, মীর কাসেম ইত্যাদি নাটকের মধ্য দিয়া দেশাত্মবোধ প্রচার করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র যখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে এবং মাইকেল, নবীনচন্দ্রের কাব্যকে নাট্যরূপ দিতেছিলেন সেই সময়েই দেশে দেশাত্মবোধমূলক নাট্য রচিত ও অভিনীত হইতেছিল। ঐগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত-মাতা ও ভারতে যবন, হারানচন্দ্র ঘোষের ভারতী দুঃখিনী, হরলাল রায়ের হেমলতা ও বঙ্গের সুখাবসান, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের পুরুবিক্রম ও সরোজিনী, অক্ষয় কুমার চৌধুরীর দুর্গাবতী, গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়ের তারাবাই, কুঞ্জবিহারী বসুর 'ভারত অধীন', মনোরঞ্জন গুহের ভারত বন্দিনী।

গিরিশচন্দ্রের সময়ে দেশাত্মবোধমূলক নাটক রচনা করিয়াছেন—ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল। দ্বিজুবাবুর রাণা প্রতাপ, মেবারপতন, দুর্গাদাস এইশ্রেণীর ঐতিহাসিক নাটক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর ক্ষীরোদপ্রসাদের পদ্মিনী, চাঁদবিবি, নন্দকুমার, প্রতাপাদিত্য, বাংলার মসনদ ও পলাসীর প্রায়শ্চিত্ত ঐতিহাসিক রোমাণ্টিক নাটক। প্রত্যেকটি দেশাত্মবোধের দ্বারা অনুস্যূত। দ্বিজেন্দ্রলাল একজন বড় কবি, তাঁহার নাটকগুলিতে কবিত্বেরই প্রাধান্য। দ্বিজেন্দ্রলালের বিরহ, ত্র্যহস্পর্শ, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি প্রহসন নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটক সীতা শ্রব্য কাব্যমাত্র। দ্বিজেন্দ লালের নাট্যপ্রতিভা পৃথকভাবে আলোচ্য।

ক্ষীরোদ প্রসাদ আরব্য উপন্যাসের একটি কাহিনী অবলম্বনে নৃত্যগীতবহুল নাটক, 'আলিবাবা' রচনা করিয়া বঙ্গক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি আলিবাবার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া পশ্চিম এসিয়ার নানা গল্প কাহিনী লইয়া অনেকগুলি রোমাণ্টিক নাটক ও গীতিনাট্য রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে কিন্নরী ছাড়া অন্যগুলি লুপ্তপ্রায়। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক গুলিতে নাটকীয় কলার যথেষ্ট উৎকর্ষ দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের ও মনোভাবের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের দ্বারা তাঁহার নাটকগুলি ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে। ঐতিহাসিক ভিত্তিতে রচিত আলমগীর, চাঁদবিবি, রঘুবীর, বঙ্গে রাঠোর, প্রতাপাদিত্য ইত্যাদি নাটকে এই ভাবদ্বন্দ্ব নাটকীয় সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ ছিলেন রসায়নের অধ্যাপক, রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। সে জন্য তাঁহার রঙ্গালয়ে প্রবেশ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, -আমাদের দর্শকগণ নাটকে এক সঙ্গে নাচ, গান, ঘটনার বৈচিত্র্য, রোমান্স, বাক্যের মাধুর্য্য,

বক্তৃতা, রূপসজ্জা ইত্যাদি সব একসঙ্গে পাইলে ভারি খুশী হইত। ক্ষীরোদপ্রসাদ যেন দর্শকদের রুচির নাড়ীপরীক্ষা করিয়া আরব্য উপন্যাস হইতে আলিবাবা নাটক খানি লিখিলেন। এই এক নাটকেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। প্রথম প্রথম পতনোন্মুখ থিয়েটারগুলি তাঁহার শরণাপন্ন হইত এবং পতন হইতে রক্ষা পাইত। পরে সকল থিয়েটারেই তাঁহার নাটক সাদরে অভিনীত হইতে থাকিল। ইনি ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য হইতে লাউসেনের উপাখ্যান লইয়া রঞ্জাবতী নাটক রচনা করেন। বাংলার ইতিহাস অবলম্বনে প্রথম নাটক লেখেন ক্ষীরোদ প্রসাদ। এই নাটকখানির নাম প্রতাপআদিত্য। তিনি 'কুমারী' নাটকের মধ্য দিয়া জাত্যাভিমান ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য হিংসা যে সম্পূর্ণ সঙ্গত তিনি এই তত্ত্ব নানা নাটকের মধ্য দিয়া প্রচার করেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাটকের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার চরিত্র ও আখ্যানবস্তু মূল সংস্কৃত পুরাণ হইতে সংগৃহীত।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম নাটক তারাবাই কবিতার ছন্দে লেখা। ইহার সমাদর না হওয়ায় দ্বিজেন্দ্রলাল পরবর্ত্তী নাটকগুলির অধিকাংশ গদ্যেই রচনা করিযাছেন। কিন্তু তাঁহার এই ভাষাও অনেকটা কবিতার মতই সরস। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিই দেশে আজিও সমাদৃত। 'চন্দ্রগুপ্ত' ঐতিহাসিক ভিত্তিতে রচিত রোমাণ্টিক নাটক। ইঁহার দুইখানি সামাজিক নাটক বঙ্গনারী ও পরপারে তেমন আদর পায় নাই। বরং প্রহসন চারিখানি অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎস বলিয়া আদৃত।

উপন্যাসে মূল আখ্যানবস্তুর আশে পাশে অনেক অবান্তর চিত্র দিতে হয়—সেগুলি মূল আখ্যানবস্তুর পটভূমিকা রচনা করে। নাটকে তাহার প্রয়োজন নাই—রঙ্গমঞ্চই পটভূমিকার সৃষ্টি করে—সে জন্য অবান্তর অসংলগ্ন দৃশ্য বা চিত্র নাটকে পরিহার্য্য। দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু তাঁহার নাটকগুলিতে নাটকের এই টেকনিক সর্ব্বত্র অনুসরণ না করিয়া উপন্যাস বা কাব্যের টেকনিক অনুসরণ করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে সংযোজিত গানগুলির ভাব ভাষা সুর সবই চমৎকার। তবে কোন কোন গান জোর করিয়া নাটকে অনুপ্রবিষ্ট করা হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে ইতিহাসের সত্যের মর্য্যাদা খুব বেশি রাখেন নাই—ইতিহাসকে ঈষৎ রূপান্তরিত করিয়া রোমান্সে পরিণত করিয়াছেন। তাই তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি রোমাণ্টিক নাটকই হইয়াছে। তথাকথিত ঐতিহাসিক নাটকগুলির যথাযোগ্য পরিবেষ সৃষ্টিরও চেষ্টা দেখা যায় না। শাহজাহান, নুরজাহান ইত্যাদি নাটকের ভাষা পার্শীঘেঁষা হইলে পরিবেষটি কতকটা পরিস্ফুট হইতে পারিত। কবি পৌরাণিক চরিত্রগুলিকেও ইচ্ছামত রূপান্তরিত করিয়াছেন। এই ভাবে পরিবর্ত্তিত না করিয়া নূতন চরিত্র সৃষ্টি করিলেই ভালো করিতেন। পৌরাণিক আখ্যানে তিনি যে নূতন ব্যাখ্যান দিয়াছেন, তাহা অবশ্য কৃতিত্বসূচক। যত ত্রুটীই থাকুক দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি অভিনীত না হইলেও মাধুর্য্যে শ্রব্যসাহিত্য রূপে বঙ্গসাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিবে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের কথা সবশেষে বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি। রবীন্দ্রনাথ

মূলতঃ কবি, সর্ব্বক্ষেত্রেই কবি, গল্পেও কবি, প্রবন্ধেও কবি, নাট্যেও কবি, সঙ্গীতেও কবি। তাঁহার রচিত নাটক নাট্যাকারে কাব্য। তাঁহার রাজারাণী, বিসর্জ্জনের ত কথাই নাই—তাঁহার হাস্যরসাত্মক নাটকগুলিও কাব্যেরই মত। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনগুলি শিক্ষিত রসজ্ঞগণেরই উপভোগ্য—প্রাকৃত জনের উপভোগ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি ব্যঙ্গার্থমূলক (symbolical) নাটক রচনা করিয়াছেন—সেগুলিও গদ্য কাব্য। রক্তমাংসের জীবন্ত নরনারীর লৌকিক জীবন লইয়া এই নাট্যগুলি রচিত নয়—কবি কতকগুলি চিন্তা, ভাব বা অনুভূতিকে মূর্ত্ত বিগ্রহ দান করিয়া নাটকের পাত্রপাত্রীর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ঐ চিন্তা, ভাব বা অনুভূতির দ্বন্দ্ব ও ক্রমোন্মেষকেই নাটকীয় রূপ দান করিয়াছেন। ইহা বঙ্গসাহিত্যে অভিনব অবদান। বিশিষ্ট বিদগ্ধ সমাজ ছাড়া অন্যত্র সেগুলির অভিনয় চলে না। রাজা, ডাকঘর, মুক্তধারা, অচলায়তন, রক্তকরবী ইত্যাদি নাটক এইশ্রেণীর। আর এক শ্রেণীর গীতিনাট্য তিনি রচনা করিয়াছেন—সেগুলিও গীতিপ্রধান কাব্য। ঐগুলিতে যে বক্তৃতা আছে তাহা গদ্যকবিতা—গীতিরই ভূমিকামাত্র। এই শ্রেণীর নাটক ফাল্গুনী, শারদোৎসব, নটীর পূজা ইত্যাদি। দুই-একটী বড় গল্পকেও কবি নাট্যাকার দান করিয়াছেন—সেগুলি জনসমাজে অভিনয়ের যোগ্য। নাট্যসাহিত্যে লোকাতীত ব্যঞ্জনা একমাত্র এদেশে রবীন্দ্রনাথের নাটকেই দেখা যায়।

ইদানীং দেশে নাট্যকারের বড়ই অভাব। জাতীয় জীবনে বৈচিত্র্য না থাকিলে উৎকৃষ্ট নাটকের সৃষ্টি হয় না। বাঙ্গালীর একঘেয়ে একটানা বৈচিত্র্যহীন জীবনে গীতিরসাত্মক ছোট গল্প ও গীতিকবিতারই উদ্ভব স্বাভাবিক, উৎকৃষ্ট নাটকের জন্ম স্বাভাবিক নয়।* সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় বিশেষতঃ কথাসাহিত্যের তুলনায় এদেশে নাট্য সাহিত্যের দৈন্যই সূচিত হয়। এদিকে রঙ্গমঞ্চের অন্যান্য অঙ্গের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে—অভিনয়ের উপকরণ, উপাদানের ঐশ্বর্য্য ও শ্রীসৌষ্ঠবের অভাব নাই। মনীষী শিশির

* জাতীয় জীবনে বিষয়বস্তুর অভাবে নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাটকগুলির ও শেক্স্‌পীয়ারের নাটকের অনুবাদ করিয়া কিছুকাল রঙ্গমঞ্চের চাহিদা মিটাইয়াছিলেন। তারপর কিছুকাল বাংলা কাব্য, উপন্যাস ইত্যাদির নাট্যরূপ দিয়া নাট্যতৃষ্ণা নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন। তারপর ইংরাজি শিক্ষাপ্রচারের ফলে এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে হিন্দুসমাজে যে একটা নব চেতনার সঞ্চার হয়, তাহাকে অবলম্বন করিয়া নাট্য রচিত হইতে থাকে। সেই সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের অভিনব রূপ দান চলিতে থাকে। ইংরাজি সংস্কৃতি বঙ্গীয় সমাজে প্রভাব বিস্তার করিলে কৌলীন্য, বহুবিবাহ, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, নারীনির্য্যাতন ইত্যাদি সামাজিক কলঙ্ক বলিয়া গণ্য হয়। এইগুলিই নাটকের উপজীব্য হয়। পক্ষান্তরে ইংরাজি শিক্ষার বিষময় ফলে সমাজে পানদোষ, ভণ্ডামি, বিজাতীয় ভাব, স্বধর্ম্মদ্রোহ ইত্যাদির উপদ্রব ঘটে, সেগুলিকে ধিক্কৃত করিয়াও কতকগুলি নাটক রচিত হয়। এইগুলি ছাড়া, কুঠিয়াল, জমিদার ও অন্যান্য প্রবল ব্যক্তির অত্যাচার, লাম্পট্য, কুসংস্কার, সন্ন্যাসী ও গুরুশ্রেণীর লোকদের ভণ্ডামি ইত্যাদি অনেক নাটকের উপজীব্য হয়। ইঙ্গবঙ্গ সমাজ ও কুসংস্কারান্ধ হিন্দুসমাজ উভয় সমাজকেই ব্যঙ্গ করিয়া ও ধিক্কৃত করিয়া বহু প্রহসন রচিত হয়। এইভাবে রঙ্গমঞ্চ ৫০ বৎসর ধরিয়া এদেশে সমাজসংস্কারের কাজ করিয়াছে। ভারতের ইতিহাস মন্থন করিয়া যেখানে যতটুকু বৈচিত্র্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া নাট্য রচিত হইয়াছে।

কুমারের প্রতিভায় উচ্চাঙ্গের অভিনয়বিদ্যাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সুদক্ষ নটনটীর অভাব নাই। কিন্তু ২।৪ খানা ছাড়া উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হইতেছে না। নাটকের প্রমোদের দিকের ক্ষতিপূরণ করিতেছে সিনেমা, ।কিন্তু সাহিত্যের দিক হইতে ক্ষতিপূরণ হইতেছে না। যাঁহাদের নাটক রচনার শক্তি আছে—তাঁহারা সিনেমাব্যবসায়ীদের নির্দেশ অনুসারে চিত্রনাট্য রচনা করিতেছেন । উৎকৃষ্ট নাটকের অভাবে ইদানীং শরৎচন্দ্রের ও অন্যান্য কথাশিল্পীদের উপন্যাসগুলিকেও নাট্যাকাবে পবিণত করা হইতেছে।

এই নাটকগুলির প্রধান কাজ হইযাছে অপরোক্ষভাবে দেশাত্মবোধের প্রবোধন। প্রত্যক্ষভাবে দেশপ্রীি জাগরণ অথবা স্বাধীনতা লাভেব আগ্রহ সৃষ্টির উপায় ছিল না। এ২ অপরাধের জন্য সরকার দুই তিনখানি উৎকৃষ্ট নাটকের প্রচাব ও অভিনয বন্ধ করিয়া দিয়াছি়লেন।

ক্রমে বিষয়বস্তু নিঃশেয হইয়া আসিল। এদিকে জাতীয় জীবনে অভিনব বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু ঘটে নাই। এখন কোন অবান্তব উদ্দেশ্য আশ্রয না কবিযা কেবলমাত্র সাহিত্যরস পরিবেষণের জন্য নাট্যরচনাব দিন আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ধারা বক্ষা কবিবাব উপযুক্ত লোক কই ? ইদানাং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম অবলম্বনে ২।১খানা ভালো উপন্যাস হইয়াছে, কিন্তু ভালো নাটক হয় নাই। গত মহাযুদ্ধে আমাদের জাতীয জীবনে একটা ওলটপালট হইযা গিয়াছে, স্বাধীনতা আসিয়াছে, বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হইযাছে, বাস্তুহারাদেব অ র্ত্তনাদে সমগ্রদেশ মুখরিত, বাঙ্গালী হিন্দুর দুর্গতির সীমা নাই—বর্ষাব আবিল ফেনিল উত্তাল নদীজলের ন্যায এখন আমাদের জাতীয় জীবন আলোড়িত, তাহাতে শরতের প্রশান্তি, প্রসন্নতা ও স্বচ্ছতা আসিলে হয়ত জাতীয় জীবনের নবপ্রবুদ্ধ বৈচিত্র্য, সাহিত্যসৃষ্টির উপাদান হইয়া উঠিবে। কবিদের ত্বর সহে না, তাঁহারা অগ্রগামী, তাঁহাদের পশ্চাতে ঔপন্যাসিকরা আসিতেছেন—নাট্যকারদের একটু দেবীই হয়। আশা কবা যায জাতীয জীবনেব ঐ বৈচিত্র্য কিছুদিন পবে নাট্যরূপ লাভ করিবে।

গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল

বঙ্কিমচন্দ্র দেশীভাবাপন্ন অভিজাত-সম্প্রদায়ের, রবীন্দ্রনাথ উচ্চ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, শরৎচন্দ্র দরিদ্র অল্পশিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের সাহিত্যিক। আর গিরিশচন্দ্র মধ্যবিত্ত অর্দ্ধ শিক্ষিত ভদ্রসমাজের প্রতিনিধি সাহিত্যিক। বলা বাহুল্য, সাহিত্যসৃষ্টির উপাদান ও উপজীব্যের প্রাধান্যের দিক হইতেই এ-কথা বলিলাম। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্য জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের কথা এত ব্যাপক ও বিস্তারিত ভাবে,—এমন দরদের সহিত আর কোন প্রাক্তন সাহিত্যিকের রচনায় পাওয়া যায় না।

প্রফুল্ল নাটকে যোগেশ বলিয়াছে—

"আমার বিবেচনায় কলিকাতায় গৃহস্থ ভদ্রলোকমাত্রই দুঃখী, এই পাড়ায় দেখ চাকরি ' বাকরি ক'রে আন্ছে নিচ্ছে, খাচ্ছে। যেই একজন চোখ বুঁজ্‌ল, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'ল, কি খায় তার উপায় নেই।"

যোগেশ যাহাদের কথা বলিতেছে—গিরিশচন্দ্রের দরদ ছিল তাহাদেরই প্রতি অসীম। তাহাদের প্রাণের কথা তিনি নানা নাটকে রূপ দিয়াছেন। তাহাদের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি সমস্ত খবরও তিনি রাখিতেন। সামাজিক নাটকে তিনি তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতার গণ্ডীর বাহিরে যান নাই। এই সতর্কতার যে সুফল তাহা তাঁহার সামাজিক নাটকগুলি পাইয়াছে। এই মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনযাত্রায় এযুগে অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নগরে খাঁটি বাঙ্গালী ভাব আর নাই। তাহার ফলে গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলিকে হয়ত বর্ত্তমান যুগের মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনচিত্র বলা চলিবে না।

এই সমাজের লোককে আনন্দ দিবার জন্য, প্রধানতঃ তাহাদের জীবনযাত্রার মধ্যে যে-সকল অনাচার ও দোষত্রুটী ছিল, গার্হস্থ্য জীবনে যে-সকল গলদ ছিল, সেইগুলির সংস্কার-সাধনের জন্য রঙ্গমঞ্চের দানের ও প্রয়াসের কথা বলিতে গেলে গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলির নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়।

গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির উপভোক্তাও ছিল প্রধানতঃ তাঁহার নাটকরচনার উপজীব্য সমাজের নরনারী। তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া, তাহাদের রুচিপ্রবৃত্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গিরিশচন্দ্রকে নাটকগুলি রচনা করিতে হইয়াছে।

কবি সামসময়িক রুচিপ্রবৃত্তির প্রতি উদাসীন হইতে পারেন,—ঔপন্যাসিক অগ্রদূতরূপে পরবর্ত্তী যুগের সমাজের বার্ত্তা ঘোষণা করিতে পারেন। কিন্তু অভিনয়োপযোগী নাটকে নাট্যকার তাঁহার পারিপার্শ্বিক সমাজকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। অভিজাতীয় বা অধি-জাতীয় সাহিত্যিকগণের রচনা সামসময়িক সমাজের রুচিপ্রবৃত্তি ও নৈতিক আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইতে পারে, কিন্তু জাতীয় সাহিত্যিকগণ, যে সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, রুচিপ্রবৃত্তিকে বাণীরূপ দেন, তাঁহাদের রচনা সে সমাজের রুচিপ্রবৃত্তি ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং কতকটা পরিচ্ছিন্ন না হইয়া পারে না। গিরিশচন্দ্র ছিলেন আমাদের জাতীয় কবি। সেজন্য

তাঁহার নাট্যরচনা নাট্যাভিনয়ের দর্শকগণের শিক্ষাদীক্ষা রুচিপ্রবৃত্তির দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত।

আপন সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ হিতসাধনকে লক্ষ্য করিয়া তিনি যে কয়খানি সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'প্রফুল্ল' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র তাঁহার চারি-পাশের সমাজে যে সকল নৈতিক অনাচার লক্ষ্য করিয়াছিলেন—তাহাদের মধ্যে তিনটিকে অবলম্বন করিয়া প্রফুল্ল নাটকে তিন ভ্রাতার চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। একটি—সুরাপান। যোগেশ-চরিত্রের মধ্য দিয়া তিনি সুরাপানের দারুণ কুফল দেখাইয়াছেন। তরলাগ্নির আঁচ লাগিয়া কেমন করিয়া 'সাজানো বাগান শুকাইয়া যায়'—তাহাই তিনি যোগেশ-চরিত্রের মধ্য দিয়া চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন। এমনও মনে হইতে পারে—অতিরিক্ত সুরাপানের বিষময় ফল দেখাইবার জন্যই প্রধানতঃ এই নাটকখানি রচিত।

প্রফুল্ল নাটকে সুরাসক্তির শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া সে-কালের কোন কোন লোকের চৈতন্য হইয়াছিল—এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নয়।

তাঁহার সামসময়িক সমাজে বিলাতী আইনে দক্ষতা লাভ করিয়া অনেকে তাহার অপব্যবহার কবিত। এই শ্রেণীর লোক সমাজে ও গার্হস্থ্য জীবনে নিশ্চয়ই একটা দারুণ উপদ্রব হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা আইনকেই অস্ত্রস্বরূপ আশ্রয় করিয়া বহু পরিবারের শান্তি. ও স্বস্তি নষ্ট করিত। ইহারা কৃতবিদ্য, কিন্তু "মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ।" আইনের খুঁটিনাটি জানিযা বাঙ্গালী উকিল এটর্ণিরা দণ্ড এড়াইয়া কতদূর আইন ভঙ্গ করিতে পারিত—তাহা গিরিশচন্দ্র অতি প্রখব দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই অভিনব উপদ্রবটিকে গিরিশচন্দ্র মূর্ত্তি দিযাছেন রমেশে। রমেশের চরিত্র এতই কদর্য্য, এতই জঘন্য করিয়া গিরিশ-অঙ্কন করিয়াছেন—যে পাঠকমাত্রেরই ঐ চরিত্রের প্রতি দারুণ ঘৃণা জন্মে। এইরূপ ঘৃণা ও জুগুপ্সার উদ্রেক করিয়া গিবিশচন্দ্র সমাজ-সংস্কারের দিকে পাঠকচিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের সামসময়িক সমাজের একান্নবর্ত্তিতা প্রাধান্য ছিল। এইরূপ একান্নবর্ত্তী পরিবারে অনেক সময় অন্নবস্ত্রের চিন্তা না থাকায় কোন কোন যুবক উন্মার্গগামী হইত, বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে পরিবারের প্রধান উপার্জ্জক কেবল উপার্জ্জনেই তদ্গত হইয়া থাকিতেন এবং আত্মীয়বাৎসল্যবশতঃ স্বজনপ্রতিপালক হইতেন। সেই পরিবারে পাকা গৃহিণী না থাকিলে কোন কোন যুবক স্বৈরাচারী হইয়া পড়িত। বিদ্যার্জ্জনে বিমুখতা, বেশ্যাসঙ্গ, সুরাপান ইত্যাদি এই শ্রেণীর যুবক-চরিত্রের অঙ্গ ছিল। গিরিশচন্দ্রের সুরেশ এই শ্রেণীর চরিত্র। এইরূপ কর্ম্মবিমুখ অলস উন্মার্গগামী যুবকদের শোচনীয় পরিণতি দেখাইয়া গিরিশচন্দ্র সমাজেব কল্যাণসাধনেরই চেষ্টা করিয়াছেন।

একান্নবর্ত্তিতা-সমস্যা বাঙলা সাহিত্যের একটি প্রধান উপজীব্য। সাধারণতঃ একান্নবর্ত্তী পরিবারে অশান্তি ও উপদ্রব ঘটায় বধূগণ ও তাহাদের শ্বাশুড়ীর চরিত্র,—এই রূপই নানা গ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র প্রফুল্ল নাটকে দেখাইয়াছেন—প্রধানতঃ পুরুষদের মতিবুদ্ধির

অনৈক্যই এই দুর্ঘটনা ঘটায়। হিন্দু-কুলবধূদের প্রতি গিরিশচন্দ্রের অগাধ শ্রদ্ধা এই নাটকে পরিস্ফুট হইয়াছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের পুরুষেরা যদি উপদ্রব না করে, তাহা হইলে একান্নবর্ত্তী পরিবারের শান্তিরক্ষা করিতে পারে আদর্শ গৃহিণী। বঙ্কিম এ তথ্য কৃষ্ণকান্তের উইলে প্রকারান্তরে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। প্রফুল্ল নাটকের সূত্রপাতেই নাট্যকার এই আদর্শ গৃহিণীর একটা পরিকল্পনা দিয়াছেন—

উমা—মা, এতদিন লক্ষ্মীর কৌটাটি আমার কাছে ছিল, আজ তোমায় দিলুম, তুমি যত্ন ক'রে রেখ, মা লক্ষ্মী ঘরে অচলা থাক্‌বেন। তুমি এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিন্নী হ'লে। দেওর দু'টিকে পেটের ছেলের মতো দেখো। সেজ বৌ-মাকে যত্ন ক'রো। মা, আপনার পর সব যত্নের, তুমি সেজ বৌ-মাকে যত্ন কর্‌লে তোমাকে মা'র মত দেখবে। আর নিত্য-নৈমিত্তিক পাল-পার্ব্বণ বারব্রত যেমন আছে, সকলগুলি বজায় রেখ। এখন গিন্নী হ'লে, সব দিক বুঝে চলো। বরং দু-কথা শুনো, তবু কাউকে উঁচু কথা বোলো না, কারো মনে দুঃখ দিও না। সকলের আশীর্ব্বাদ কুড়িও। আর কি বল্‌ব মা, পাকা চুলে সিঁদূর প'রে নাতি নাতনী নিয়ে সুখে ঘরকন্না কর।

উমাসুন্দরীর মত অশিক্ষিতা অথচ স্বভাবতঃ সহৃদয়া হিন্দুগৃহিণীর মুখে যে কথা যতটুকু স্বাভাবিক তাহাই দিয়া গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে।

সমস্ত নাটকের মূল সূত্র লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য। লক্ষ্মী তাঁহার পেচকটিকে রাখিয় চলিযা গেলেন—এই কথাই নাটকের মূল কথা। উমাসুন্দরীর মুখে "এতদিন লক্ষ্মীর কৌটা অচলা হয়ে থাকবেন," এইবাক্যে নাটকের সূত্রপাত নাট্যকলাসঙ্গত। ইহাকেই বলে Classical Irony.

যোগেশচরিত্রের সামান্য অংশই আমরা দেখিতে পাই মৈনাকের চূড়ার মত, তাহার অধিকাংশ সুরাসাগরে মগ্ন। যতটুকু আমরা দেখিতে পাই ততটুই বিচার্য্য—অর্থাৎ যতটুকু Paychological গণ্ডীর মধ্যে পড়ে, ততটুকুই আলোচ্য—Pathology-র গণ্ডীতে যে অংশ পড়িতেছে—তাহা সাহিত্যের বিচার্য্য নয়। এই অংশ সমাজহিতসাধনে সহায়তা করিয়াছে। প্রকৃতিস্থ যোগেশের চরিত্রটিতে গিরিশচন্দ্রের চরিত্রাঙ্কন-ক্ষমতার ও অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু সংসারের সম্ভ্রান্ত গৃহকর্ত্তার একটা উদার আদর্শ আমাদের সমাজে বরাবর প্রচলিত ছিল। প্রকৃতিস্থ যোগেশ সেই আদর্শের প্রতীক। জননী উমাসুন্দরীর প্রতি যোগেশের সশ্রদ্ধ অনুযোগ তাহার চরিত্রের সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি।

"প্রাণের জন্য ? তুচ্ছ প্রাণ যেতই বা। মা, তুমি কাঞ্চন ফেলে কাঁচ গেরো দিয়েছ। মান খুইয়ে প্রাণের দরদ করেছ। সমস্ত বেচে যদি আমার দেনা শোধ না হ'ত, আমি যদি জেলে যেতাম, যদি টাকার শোকে আমার মৃত্যু হ'ত, আমার মনে এই শান্তি থাকৃত—এ জীবনে আমি কারো সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিনি। সে শান্তি আজ বিদায় দিয়েছি—আর ফিরবে না। বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে তার দোর খুলে দিয়েছি।"

এই পুরুষসিংহের পৌরুষ তাহার বিষয়-বুদ্ধিহীনতা ধ্বংস করে নাই,— ধ্বংস করিয়াছে

সুবা। যোগেশ যদি প্রকৃতিস্থ থাকিত, তাহা হইলেও বমেশের ষড়্যন্ত্র তাহাব ক্ষতি করিতে পাবিত, কিন্তু তাহাকে পথেব ফকির কবিতে পাবিত না।

অপ্রকৃতিস্থ যোগেশ একটি composite characte1, অনেকগুলি সুবাসক্তেব জীবনের খণ্ড খণ্ড অংশ যোগ দিয়া বচিত। সুবাপানেব দুর্গতিতে Emphasis দেওয়াব জন্য এইরূপ composition

বমেশও একটি composite chaiacter. অনেকগুলি আইনী বিবেব সাপের বিষ একত্র কবিয়া রমেশেব দন্তে সঞ্চিত বাখা হইযাছে। বমেশ একজন অর্বাচীন এটর্ণি, আইনকে মাবণাস্ত্র কবিয়া প্রয়োগ কবিবাব এত দক্ষতা তাহার থাকিবাব কথা নয়। বমেশ Individualistic characte1 হইলে তাহাব মধ্যে কিছু কিছু মনুষ্যত্ব থাকিত। কিন্তু সে বহু চবিত্রেব কদয্যতাব সমবায়। কেবল দুষ্টবুদ্ধি আইনজীবী নয়, খুনে, জালিয়াৎ ইত্যাদি ভীষণ প্রকৃতির লোকদেব জিঘাংসাপ্রবৃত্তিও তাহাব মধ্যে সমাবিষ্ট কবা হইয়াছে। গিবিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন—তথাকথিত বিদ্যা পৈশাচিক মনোবৃত্তিকে আবও শাণিতই কবে,—শমিত কবে না।

এইরূপ অবিমিশ্র পৈশাচিকতা Romantic নাটকে অশোভন নয়—সামাজিক নাটকে কেবল বসসৃষ্টি ছাড়া কোন অবান্তব উদ্দেশ্যসিদ্ধিব জন্যই অবতাবণা কবা হয়।

বলা বাহুল্য, সমাজসংস্কাবক গিবিশচন্দ্র বি ষ্ট উদ্দেশ্যসাধনেব জন্যই এইরূপ চবিত্রেব সৃষ্টি কবিযাছেন। বমেশ কাপুরুষ, আইনেব আশ্রযে ও অন্তবালে থাকিয়াই সে সমস্ত আক্রমণ চালাইয়াছে। তাহাব দ্বাবা বিষপ্রযোগে খুনও অস্বাভাবিক নয—কিন্তু অনেকেব সাক্ষাতে পত্নীব গলা টিপিযা মাবা অস্বাভাবিক। কিন্তু গিবিশচন্দ্রেব মতে যে মানুষই নয়, হিংস্রজন্তু, তাহাব পক্ষে কিছুই অস্বাভাবিক নয।

নিদারুণ অর্থলোভ,—নিজস্ব সামর্থ্যেব দ্বাবা অর্জ্জন কবিতে না পাবিয়া শঠতাব দ্বাবা পবস্বাপহবণেব নেশা কেমন কবিযা মানবকে আত্মবিস্মৃত পিশাচ কবিয়া তুলে, বমেশ-চবিত্রে নাট্যকাব তাহা দেখাইযাছেন। অর্থলোভ ও শঠতাব জাল বিস্তারে কৃতিত্বেব উৎসাহ বমেশেব হৃদযেব প্রত্যেক সুকুমাব মনোবৃত্তি কবলিত কবিয়াছিল—সুশীলাসুন্দবী পত্নীকেও সে ভালবাসিতে পাবে নাই। Shylock এব তবু কন্যা Jessica ছিল, বমেশের অর্থ ছাড়া ত্রিসংসারে কেহই ছিল না। বমেশেব চবিত্র নিববচ্ছিন্ন পাপপবম্পরার নরকযাত্রা। এইরূপ চরিত্র কেবল নিবপবাধা প্রফুল্লব নয়, পাঠকেব মনেব প্রফুল্লতারও শ্বাসরোধ করে।

প্রফুল্ল নাটকে আইন আদালতেব বৈষয়িক (civil and criminal) জটিলতার অন্ত নাই। জানি না সেগুলি কত দূর যথাযথ—আইনজ্ঞ লোকেরা তাহার বিচার কবিবেন। আমরা এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লক্ষ্য কবিয়া বিস্মিত হই।

সুবেশচবিত্র স্বাভাবিক ভাবেই অঙ্কিত। তবে এ চবিত্র এখনো অপবিণত—তারুণ্যেব জন্য সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। তাহাকে অবলম্বন করিয়া নাটকে জটিলতা বাড়িয়াছে, নাটকও অনেকটা আগাইযাছে, কিন্তু সে নিজে সজ্ঞানে নাটকেব বৈষয়িক

জটিলতায় যোগ দেয় নাই—তাহার শক্তি ও বুদ্ধির অভাবে। নাটকের যৌগিকতায় সে অনেকটা catalytic agent-এর কাজ করিয়াছে। এই চরিত্রের বিন্যাসে Didactic Element-ই বেশী। সুরেশ জেলে যাইবার আগে তাহার বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া যে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছে—তাহার মধ্যেই didactic element-টা বিশেষ করিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। কথাগুলি বুদ্ধিহীন সুরেশের মুখের ঠিক উপযোগী নয়। বলা বাহুল্য, এগুলি লোকশিক্ষক গিরিশচন্দ্রের নিজেরই মুখের কথা।

যোগেশের পত্নী জ্ঞানদা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক চরিত্র। স্বামী সুরাসক্ত ও বিপথগামী হইলে পতিব্রতা অশিক্ষিতা হিন্দু মহিলা যে কতদূর নিরুপায় ও অসহায় হইয়া পড়ে, গিরিশচন্দ্র তাহাই জ্ঞানদা-চরিত্রে দেখাইয়াছেন। হিন্দুসংসারে এই শ্রেণীর সাধ্বী-সতীদের এই দুঃখ সেকালে অনিবার্য্য ছিল। এ-কালেও তাহাদের দশা অনেকটা এইরূপ হয়, তবে অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মহিলারাও আপন আপন ভবিষ্যৎ কিছু কিছু বুঝিয়া সতর্ক হইতে শিখিয়াছে। যৌবনকাল হইতে নিজের সংসারে কর্ত্রীত্বলাভ না করিলে, এইরূপ বিড়ম্বনা ঘটাই স্বাভাবিক। যে সমাজে নারীগণ পুরুষের উপর সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল, গিরিশচন্দ্র সেই সমাজের কথাই বলিয়াছেন।

প্রফুল্লকে যে-ভাবে গিরিশচন্দ্র নাটকে অবতারিত করিয়াছেন—তাহাতে মনে হয় বয়স তাহার যাহাই হউক, সে এখনো একটি অশিক্ষিতা বালিকা মাত্র। রমেশের উপযুক্ত গৃহিণী হইতে পারিত জগমণির চরিত্রের সারাংশ দিয়া গঠিত কোন নারী।

প্রফুল্লের দুর্ভাগ্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের পুরুষের সহিত পরিণয়। প্রফুল্ল বুদ্ধিহীনা, স্বভাবতই সরলা সুশীলা হিন্দুনারী। তাহার চরিত্রে কোন জটিলতা নাই। অথচ তাহার জীবনেই ঘটিল দারুণ সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান করিবে কি—সমস্যার গুরুত্বই সে বুঝিতেই পারিল না। তাহার ব্যক্তিত্ব নাই—আছে হৃদয়। সে বলির ছাগ মাত্র। প্রফুল্ল নাটকের নামও 'বলিদান' হইতে পারিত। প্রফুল্ল-চরিত্রটি সুপরিণত চরিত্র না হইলেও গিরিশচন্দ্র তাহার নামে নাটকের নামকরণ করিয়া তাহাকে মর্য্যাদা দিয়াছেন। স্বামী সুরাসক্ত হইলে যেমন স্ত্রী নিরুপায়, স্বামী দানব-প্রকৃতির হইলেও সুশীলা স্ত্রী তেমনি নিরুপায়। পাতিব্রত্যের মর্য্যাদা কাঁটায় কাঁটায় রক্ষা করিয়া প্রফুল্লকে চলিতে বলিতে হইয়াছে। তাই তাহার জীবনে দারুণ সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র অতি সন্তর্পণে তাহাকে লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন—পতিভক্তির মর্য্যাদা কিছুতেই ক্ষুন্ন না হয়, সে-দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাই সে কেবল 'হায় হায়' করিয়াছে। তাহার ফলে প্রফুল্ল একটি সুপরিপুষ্ট ও জীবন্ত চরিত্র হইয়া উঠে নাই। এ যুগে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ সমাজে ও সাহিত্যে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এ যুগের সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের অবলম্বিত সতর্কতার প্রয়োজন হয় না। সকল চরিত্রই এ যুগে ব্যক্তিত্বে মণ্ডিত হয়। ব্যক্তিত্বের সহিত পাতিব্রত্যের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ঘটে—তাহাতে পাতিব্রত্যের পরাজয়ও ঘটিতে পারে। ট্র্যাজেডিকে তাহাতেও এড়ানো যায় না,—তবে ছাগবলিদান না—সংগ্রামেই পতন হয়। প্রফুল্লের আগে বঙ্কিমের, প্রফুল্ল না হউক, ভ্রমরই ত পথ দেখাইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত প্রফুল্লের মুখের কথায় ও আচরণে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা না দেখাইয়া পারেন নাই, কিন্তু তাহা সেই চরম ও চূড়ান্ত অবস্থায়,—সেটা কেবল তাহার মৃত্যুবরণের অনিবার্য্য আয়োজন, প্রদীপের নিভিবার আগে একটা অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যের মত।

এক পুত্র যখন অন্য পুত্রের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত, পুত্রে পুত্রে যখন দ্বন্দ্বসংঘর্ষ, তখন স্নেহশীলা জননীর যে অবস্থা হয়, উমাসুন্দরীর তাহাই হইয়াছে। দারুণ সঙ্কটের মধ্যে সে দিশাহারা হইয়া পাগলিনী হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র তাহাকে উন্মাদিনী করিয়াই রাখিয়াছেন—তাহার চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত দেখাইবার আর প্রয়োজন হয় নাই।

সমস্ত চরিত্রগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ normal বা প্রকৃতিস্থ চরিত্র পীতাম্বরের। রমেশের চরিত্রের antithesis দেখাইবার জন্য পীতাম্বরের চরিত্রের প্রয়োজন ছিল। পুরুষ মাত্রই কেন্দ্রভ্রষ্ট বা পশু নয়, মানবসমাজও একেবারে মনুষ্যত্বহীন নয়। গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, সহোদরও গলায় ছুরি দিতে পারে, আবার একটি নিঃসম্বল ভৃত্যও প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে পারে। সহজাত বন্ধনও উদ্বন্ধনে পরিণত হইতে পারে, বহিরাগত বন্ধনও চিরস্থায়ী হইতে পারে।

কাঙ্গালী ডাক্তারের কোন ব্যক্তিত্ব নাই,—তাহার ব্যক্তিত্ব তাহার পুরুষভাবাপন্না স্ত্রী জগমণিই গ্রাস করিয়াছিল। কাঙ্গালী একটা উপকরণ মাত্র। জগমণির মত নারীচরিত্র সাহিত্যে বা সমাজে দেখা যায় না। সম্ভবতঃ ইহা গিরিশচন্দ্রের কল্পনা-প্রসূত। নারীর সর্ব্ববিধ সৌকুমার্য্য ও মাধুর্য্য নিঃশেষে হরণ করিয়া, এমন কি তাহার নারীত্ব পর্য্যন্ত নিষ্কাশন করিয়া গিরিশচন্দ্র এই চরিত্রটির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই জন্যই বোধ হয় তাহাকে আধা-পুরুষ আধা-নারীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। জগমণির ব্যক্তিত্ব থাকিলেও সে রমেশের হাতে জীবন্ত উপকরণ মাত্র। জগমণি নাটকে জুগুপ্সা ও হাস্যরসের কিছু উপাদান যোগাইয়াছে। জ্ঞানদা ও প্রফুল্লর মনে সে যে জুগুপ্সার ভাব জাগাইয়াছে, তাহা সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাহাও নাটকের পরিপুষ্টিতে সাহায্য করিয়াছে।

মদন একটি পাগল, তাহার চরিত্র আলোচনার বিষয়ীভূত নয়। তাহাকেও রমেশ ও জগমণি উপকরণস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছে। পাগল হইলেও সে একেবারে মনুষ্যত্ববর্জ্জিত নয়।

কলিকাতার সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজ ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের ভাষায় গিরিশচন্দ্রের অধিকার ছিল অসাধারণ। ভাবপ্রকাশে কোথাও কোথাও গিরিশচন্দ্র নিজস্ব ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে যাহার মুখে যে ভাষাভঙ্গী বা যে কথা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাহাই বসাইয়াছেন। এ বিষয়ে স্বাভাবিকতার সীমা কোথাও বড় একটা অতিক্রম করেন নাই। কলিকাতা অঞ্চলে যে সকল লক্ষ্যার্থক বাক্যাঙ্গ (idiom and slang) ব্যবহৃত হয়—নাটকের ভাষায় তাহাদের ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। নাটকের রচনা-কৌশলের ইহাও একটী বিশিষ্ট অঙ্গ।

Sheridan এর The Rivals নামক নাটকে Mrs. Malaprop বলিয়া একটী চরিত্র

আছে, সে অযথার্থ অর্থে শব্দের ভ্রান্ত প্রয়োগ করিত—উচ্চারণ সাম্যে এইরূপ ভ্রান্ত প্রয়োগ অনেকেই করিয়া থাকে। ইহাকে বলে 'Malapropism'. গিরিশচন্দ্র একটি দৃশ্যে কাঙ্গালী চরণের মুখে এইরূপ শব্দ প্রয়োগের দ্বারা হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন; যেমন—

"আপনাকে আমি যে দিন প্রদর্শন করেছি, সেই দিন অবধি আপনার প্রতি মন আড়ষ্ট হয়েছে। আপনি অতিসজ্জন ও প্রকাণ্ড অজ্ঞ। আপনার বন্ধুত্ব যাজ্ঞা করি, আপনার সৌহার্দ্দ জন্য আমি একান্ত সুললিত, আপনি ভদ্রলোক এবং বিশিষ্ট ধূষ্ট।...যাতে আপনি কিঞ্চিৎ অর্থ সংযম করে প্রদেশে গিয়ে বসতে পারেন, আর নিরুদ্বেগে কালকবলিত হ'ন তার উপায় আপনাকে উদ্‌ভ্রান্ত করতে এসেছি।"

উপন্যাসের অগ্রগতিতে যে মন্থরতা আছে—নাটকে তাহার অবসর নাই, নাটকের প্রবাহ দ্রুতসঞ্চারী। দ্রুতসঞ্চারী হওয়ার জন্য অনেক ফাঁক পড়িয়া যায়, অভিনয়ের দর্শক তাহা কল্পনার দ্বারা ভরিয়া লয়। উপন্যাসের তুলনায় নাটকের অনেক অঙ্গে Emphasis দিতে হয়—নতুবা দর্শকের অবধান অবসন্ন হইয়া পড়ে, দ্রুত সঞ্চারের ক্ষতিপূরণও হয় না। এই Emphasis এর মাত্রা দর্শকের শিক্ষা দীক্ষা ও রসবোধের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। মার্জ্জিতরুচি, সুশিক্ষিত নরনারী নাটকের উপভোক্তা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প Emphasis দিয়া রচনাকে যতদূর সম্ভব স্বভাবানুগামী করিলেই চলে, কিন্তু দর্শকশ্রেণী শিক্ষা, রস-বোধ ও বিচারবোধে অনুন্নত হইলে Emphasisএর মাত্রা বাড়াইতে হয়। অত্যুক্তি, অতিরঞ্জন ও বর্ণপ্রাখর্য্য ছাড়া তাহাদের চিত্তকে উদ্দীপিত করা যায় না—নাটকাঙ্গকেও মর্ম্মস্পর্শী করা যায় না। গিরিশচন্দ্র তাঁহার দর্শকশ্রেণীর বিদ্যাবুদ্ধি, রস-বোধ ইত্যাদির পরিমাণ ও প্রকৃতি ভালো করিয়াই জানিতেন, সে জন্য তিনি অনেক অঙ্গেই অতিরিক্ত Emphasis দিয়াছেন। রমেশের দুষ্ক্রিয়া-পরম্পরায়, যোগেশের মত্ততায় ও আত্মবিস্মৃতিতে, জগমণির কুবুদ্ধির ক্রিয়ায়, সুরেশের দণ্ডভোগে ও নির্য্যাতনে Emphasisএর মাত্রা সে জন্য খুব বেশি।

আজকালকার পাঠকের মন বড় বেশি critical হইয়াছে। দেশে উৎকৃষ্ট নাটকের সৃষ্টি না হইলেও সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গের অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার ফলে পাঠকদের বিচার-বুদ্ধি শাণিত হইয়াছে, আগেকার পাঠকদের মত তাহারা স্বল্পে সন্তুষ্ট নয়। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। তাহা ছাড়া, আগে যেমন বঙ্গসাহিত্যের বিবিধ সৃষ্টির মধ্যেই নিজেদের তুলনামূলক বিচার পরিচ্ছিন্ন রাখিত, এখন আর তাহা করে না। স্বদেশের বিবিধ রচনার মধ্যে কোন' রচনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেই আগে যথেষ্ট মনে করা হইত। লোকে এখন বিদেশের সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া রচনার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করে। যে যুগের জন্য সাহিত্যবিশেষ রচিত, নিজের মনকে ঠিক সেই যুগে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া সে সাহিত্যকে উপভোগ করার মত উদার সংস্কৃতি অনেকেরই নাই। তাহারা—রচনা যে যুগেরই, হউক, তাহাতে সার্ব্বজনীন আবেদন ও দেশকালাতীত ব্যঞ্জনার অনুসন্ধান করে। Romantic যুগ চলিয়া গিয়াছে, Romance এর প্রতি কাহারও প্রীতি নাই,—Idealismও ক্রমে ক্লান্তিকর হইয়াছে, পাঠকের মন দিন দিন Realism এর পক্ষপাতী হইতেছে। অভিনয়বিদ্যার যথেষ্ট

উন্নতি হইয়াছে, এই বিদ্যার মধ্যে Realism এর আধিক্যই এই উন্নতির ও তাহার সমাদরের কারণ। পাঠক নাটকের মধ্যে বিশেষতঃ সামাজিক নাটকে বাস্তবনিষ্ঠতার প্রাধান্য দেখিতে চায়। কথাসাহিত্যে Realism-এরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; পাঠকের মন তাহার দ্বারাই আবিষ্ট ও অভিরঞ্জিত। এই মনোভাবের দ্বারা নাটকেরও প্রত্যেক অঙ্গটি পাঠক পরীক্ষা করিয়া লইতে চায়। এখনকার পাঠক আকস্মিক পতন ও মৃত্যু, মৃত্যুর আগে বা হত্যার আগে ওথেলোর মত একটা বড় বক্তৃতা, শেষ দৃশ্যে সমস্ত জীবিত চরিত্র গুলির একত্র সমবায়, মৃত্যুর দ্বারা ট্রাজেডি ঘটানো, অপ্রকৃতিস্থ চরিত্রের আধিক্য ও ঐরূপ চরিত্রের অসম্বন্ধ উক্তিপরম্পরা, চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব ইত্যাদিকে কলাসঙ্গত বলিয়া মনে করে না। আজকালকার পাঠক সারল্য চায় না, চায় জটিলতা, চায় বক্রিমা, চায় তরঙ্গায়িত গতি।

এই সকল কারণে বর্ত্তমান যুগে গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্লর মত নাটকেরও সম্যক্ আদর নাই।

—০—

মায়াবসান

গিরিশচন্দ্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন—তাঁহার চারি পাশের সমাজে শঠতা, নীচতা, ধূর্ত্ততা, স্বার্থপরতা ও পাপাসক্তির তাণ্ডব নৃত্য চলিয়াছে। ইংরাজি শিক্ষা সমাজের লোকের পাপ-বুদ্ধিকে আরও শাণিত করিয়াছে। তাই গিরিশচন্দ্র একাধিক নাটকে উকিল, এটর্নী, ডাক্তার, ইংরাজি শিক্ষিত কংগ্রেসসেবী ইত্যাদির ঘৃণিত চরিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাইয়াছেন—তাহাদের দ্বারা দেশের, সমাজের ও সংসারের কি দারুণ অনিষ্টই না সাধিত হইতেছে! প্রফুল্লের মত মায়াবসান ঐ শ্রেণীর একখানি নাটক। এই নাটকে তিনি দেখাইয়াছেন, সমাজের অর্দ্ধ-শিক্ষিত বহু লোকও ঐ শ্রেণীর শিক্ষিত পাষণ্ডদের সহায়তা করে। তাহাদের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্যই তাঁহার ঐকান্তিক প্রয়াসই এই শ্রেণীর নাট্যের রূপ ধরিয়াছে। লোকশিক্ষার জন্যই এই শ্রেণীর নাটকের সৃষ্টি। নাটকের ঘটনাচক্র ও ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া তিনি মহাপাপের শোচনীয় পরিণাম যেমন দেখাইয়াছেন—তেমনি নিরীহের লাঞ্ছনা, নিষ্পাপের নির্য্যাতন ও পাপের জঘন্যতা দেখাইয়া তেমনি পাপের প্রতি একটা জুগুপ্সার সঞ্চার করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন।

মায়াবসানে গিরিশচন্দ্র প্রথমেই আমাদিগকে এমন একটা রাজ্যেব অন্তঃস্থল দেখাইলেন, যেখানে মনুষ্যত্বের নামগন্ধ নাই—যেখানে এটর্নী পাষণ্ড, ডাক্তার পাষণ্ড, প্রতিবেশী পাষণ্ড, গণৎকার পাষণ্ড, পুত্রবৎ প্রতিপালিত ভ্রাতুষ্পুত্রেরা পাষণ্ড, যাহারা কংগ্রেসের দোহাই দেয় তাহারাও তাই। সকলে মিলিয়া কেমন করিয়া একটি মহাপুরুষকে অর্থলোভে পাগল বানাইয়া তুলিল—এমন কি তাঁহার মৃত্যু ঘটাইতে চেষ্টা করিল—তাহাই এই নাটকে দেখানো হইয়াছে। এইরূপ পাপের রাজত্ব দেখিয়া পৃথিবী তথা মানবসমাজ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু এই জগৎটায় শুধুই পাপেরই জয়জয়কার নয়—এখানে মনুষ্যত্বও আছে, গিরিশচন্দ্র ক্রমে তাহা দেখাইলেন। ধীরে ধীরে এক একটি করিয়া প্রকৃত মানুষের দেখা পাওয়া গেল। সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রকৃত মানুষের অভাব বটে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর নরনারীর মধ্যে অনেকেরই মনুষ্যত্ব আছে। আর প্রফুল্লের মত এই নাটকে তিনি দেখাইয়াছেন—পুরুষ যেখানে মহাপাপকে আশ্রয় করিয়া দানব হইয়া উঠিয়াছে—সেখানে অন্তঃপুরে রমণী তাহার অঞ্চলের আড়ালে মনুষ্যত্বের দীপটিকে পাপের ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে রক্ষা করিতেছে।

তিনি আরও দেখাইয়াছেন—ইউরোপীয় শিক্ষায় অনেকের পাপবুদ্ধি শাণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু দুই একজন মানুষকে ঐ শিক্ষা ধর্ম্ম ও নীতির উচ্চতম আদর্শের স্তরে উন্নীতও করিয়াছে। এই শ্রেণীর মানুষ পাপের ও স্বার্থপরতার জগতে রবীন্দ্রনাথের 'সাক্ষী' গল্পে রামকানাইএর মত লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত ও পাগল বলিয়াই গণ্য হয়। পাষণ্ডেরা কেবল নিজেরাই মনুষ্যত্ব হারায় নাই, তাহারা মনুষ্যত্বকে স্বীকার করিতেও ভুলিয়াছে।

মনুষ্যত্ব যাহার আছে—সে ঘরভরা অন্ধকারের এককোণে একটি প্রদীপের মত। ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর উপমা—উহা বিদ্যুৎচমকের মত। ঐ বিদ্যুৎচমকে অন্ধকার দূরীভূত হয় না—অন্ধকারকে দ্বিগুণিত বলিয়াই বোধ হয়। কালীকিঙ্কর ইংরাজি শিক্ষার প্রকাণ্ড বিষবৃক্ষে অমৃতময় ফল।

যে দুই ভাইকে লইয়া নাটকের ক্রমোন্মেষ—সেই দুই ভাই শিক্ষিত মূর্খ, বঙ্কিমের ভাষায় 'কৃতবিদ্য কুলাঙ্গার।' গিরিশচন্দ্র ইহাদের অতি নির্বোধচরিত্রের লোকরূপেই গোড়া হইতে চিত্রিত করিয়াছেন। অতি অকিঞ্চিৎকর বিতর্ক লইয়া তাহাদের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত। তাহারা এতই নির্বোধ যে ভুয়ো সাহেবি সভ্যতার মোহে ঘরের লক্ষ্মীদের ও সেই সঙ্গে লক্ষ্মীশ্রীকে বিদায় দেয়,—ঋষিতুল্য, পিতৃকল্প পিতৃব্যের মর্য্যাদা বুঝে না, আপন গৃহের অন্তঃপুরের মর্য্যাদাও তাহারা রাখিতে জানে না। গিরিশচন্দ্রের এই নাটকে ঐরূপ দুইটি নির্বোধ জীবেরই প্রয়োজন হইয়াছিল। ফলে, এটর্নী, উকিল ও শঠ প্রতিবেশীরা উহাদের বাঁদর-নাচ নাচাইয়াছে। এই বাঁদর নাচের জন্য একটা Semi-farcical atmosphere সমগ্র নাটকখানিকে জুড়িয়া আছে। হলধর ও গণৎকার এই আবেষ্টনীসৃষ্টির সহায়তাই করিয়াছে। যাহাদের লইয়া এই বাঁদর নাচ তাহাদের চরিত্রকে নাট্যকার সচেতন চরিত্র বলিয়াই স্বীকার করেন নাই—সেজন্য তাঁহাদের চরিত্রের উন্মেষও তিনি দেখান নাই।

গিরিশচন্দ্র কালীকিঙ্কর চরিত্রে নৈতিক দৃঢ়তার আদর্শ দেখাইয়াছেন। সেই সঙ্গে তাঁহার প্রতিপাদ্য,—এরূপ আদর্শবাদী জ্ঞানচর্চ্চায় মগ্ন ঋষিতুল্য ব্যক্তিরা সংসারসংগ্রামের পক্ষে অনুপযুক্ত। এইরূপ উৎকেন্দ্রিক চরিত্র ভারসাম্যের অভাবের জন্য এ সংসারে দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য। গিরিশচন্দ্র কালীকিঙ্করকে নিঃসন্তান রূপে চিত্রিত করিয়া সংসারসংগ্রাম হইতে কতকটা অব্যাহতি দিয়াছিলেন, কিন্তু সংসারের অনুকল্প তাঁহার ছিল, তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন অনাসক্ত গৃহী। শুধু গৃহী নয়, গৃহকর্ত্তা। গৃহকর্ত্তা অনাসক্ত হইলে তাঁহাকে এইরূপ দণ্ডভোগ করিতে হয়। তিনি তাঁহার প্রতিপাল্য ও আশ্রিতগণকে উপদেশ দিতেন, কিন্তু উপদেশ পালন করাইতে পারিতেন না।

তাঁহার শক্তি-সামর্থ্য, অবধান ও বুদ্ধিশক্তি জ্ঞানানুশীলনেই নিঃশেষিত, লৌকিক বা ব্যবহারিক জগতের জন্য কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। সেজন্য Tragedyর বীজ তাঁহার চরিত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল।

কালীকিঙ্করই গিরিশচন্দ্রের নমস্য পুরুষ। তাঁহার মুখের কথাই গিরিশচন্দ্রের প্রাণের কথা। গিরিশচন্দ্রের সমাজধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে নিজস্ব মতবাদ কালীকিঙ্করের মুখ দিয়াই ব্যক্ত হইয়াছে। নাটকের অধিকাংশেই কালীকিঙ্কর অপ্রকৃতিস্থ। কিন্তু এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তাঁহার মুখে যে-সকল বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে, সেগুলি শ্লেষ ও ব্যঙ্গের সংযোগে অধিকতর জোরালো হইয়াছে। ব্যারিষ্টার, উকিল, এটর্ণীদের লক্ষ্য করিয়া কালীকিঙ্কর বলিতেছেন "এরা না থাকলে পরের বিষয় ঘরে আস্‌ত না। ঘর জ্বালানো, গ্রাম লুট চল্‌ত না, প্রজায় জমিদারে ঝগড়া বাধ্‌ত না, ভায়ে ভায়ে কাটাকাটি হ'ত না, ভাইপো বিষ খাওয়াত না।* *

সাহেব ধ্যান, সাহেব জ্ঞান, সাহেবি মন, সাহেবি প্রাণ, সব সাহেবি—শুধু কালা রঙটুকু ঢাকতে পারেন নি। এরা নতুন সাহেব, পূজা খাবার জন্য এদের আত্ম প্রচার। এঁরা চান—যত সাহেব সব চলে যাক—শুধু জজসাহেব থাকুক। গ্রামে গ্রামে হাইকোর্ট হোক—ওঁরা বক্তৃতা দিন, বাড়ীঘর বেচে ওঁদের পূজা দাও।"

আইন ব্যবসায়ের অপচারের প্রতি এগুলি গিরিশচন্দ্রের নিজেরই ধিক্কার-বাক্য।

কালীকিঙ্করের চরিত্রে ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত ছিল—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ট্র্যাজেডি হয় নাই। Didactic নাটকে ধর্ম্ম ও সত্যের জয় দেখাইতে হয়—Poetic justice এর প্রয়োগ করিতে হয়। তাই অপ্রকৃতিস্থ কালীকিঙ্কর আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং তাঁহার সংসারে শান্তি ফিরিয়া আসিল।

সত্যের জয় ঘোষিত হয় পাপের দণ্ডে ও অসত্যের পরাজয়ে। তাহার চেয়ে সত্যের জয় অধিকতর প্রকট হয় যখন পাপীর চিত্তে সংস্কার সাধিত হয়, অসত্য আপন ভ্রান্তি বুঝিতে পারে —পাষণ্ডেরা ধর্ম্মপথে ফিরিয়া আসে। গিরিশচন্দ্র এই শেষোক্ত উপায়ে সত্যের জয় ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন—পাষণ্ডের দল একে একে ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিয়া অগ্নিশুদ্ধ হইল।

ডারুউইন বলিয়াছেন বানর হইতে নরের সৃষ্টি। গিরিশচন্দ্র বানর হইতে নরের সৃষ্টিই এই নাটকে দেখাইয়াছেন। যাদব ও মাধব এই দুই বানর ক্রমে নরে পরিণত হইয়াছে।

হিন্দু নারীর প্রতি গিরিশচন্দ্রের শ্রদ্ধা ছিল অসীম। এই নাটকে প্রত্যেকটি নারী-চরিত্রের মধ্যে গিরিশ সতীত্ব ও মহত্ত্বের বিকাশ দেখাইয়াছেন। অবিমিশ্র মহত্ত্ব দেখাইতে হইলেই কোন চরিত্রকেই জীবন্ত করিয়া তোলা যায় না। ফলে, নারীচরিত্রগুলির কোনটিই Realistic হয় নাই,—সবই Idealistic,

অতিরিক্ত রঙ চড়ানো হইলেও এই নাটকে সাতকড়ি চরিত্রটিই গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি। সঞ্জীবচন্দ্র একবার পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন—"বঙ্গে প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা। প্রতিবাসীরা পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়, লোভী, কৃপণ ও বঞ্চক।" গিরিশ চন্দ্র বাঙ্গালী প্রতিবাসিচরিত্রের অন্তর্নিহিত জঘন্যতা এই নাটকে চমৎকার ভাবে ফুটাইয়াছেন। বহুদর্শী বিচক্ষণ নাট্যকারের এবিষয়ে গভীর অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রতি-বাসিচরিত্রের প্রকৃত স্বরূপটি সাতকড়ির মুখেই প্রকাশিত—

"একটা কৌশল কর্‌লুম, সরিকান বিবাদ বাধিল, ঝমাঝম মামলা মোকদ্দমা চল্‌তে লাগল—দু'পক্ষ উস্‌কাতে লাগলাম—আমোদ হ'ল। কারু বৌ-ঝি বেরুল—একটা দলাদলি বাধ্‌ল, আমোদ হ'ল। এই বুকের ছাতি ফুলিয়ে গাড়ী চড়ে আফিস চলেছে—সাহেবের কাছে চুকলি ক'রে এক বেনামী চিঠি লেখা গেল, চাকরি জবাব দিলে—মুখ চূণ করে বাড়ী এল—ছুটে গিয়ে আত্মীয়তা করলুম, গাড়ী ঘোড়া বেচে দিলুম। বাড়ী বন্ধক দেয়ালুম। একটু আমোদ হ'ল।"

যে সহজাত ঈর্ষা আত্মশ্রীসম্পাদনে প্রণোদিত করে না—কেবল পরের সর্ব্বনাশ সাধন

করিয়া কিংবা পরের বিপদ আপদ দুঃখক্লেশ দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করে, ইহা সেই ঈর্ষার কথা। পরের অনিষ্টসাধন ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে উৎসাহ, অধ্যবসায় বা সক্রিয়তা নাই যে বাঙ্গালী চরিত্রের—সেই চরিত্রের মূর্তিমান বিগ্রহ সাতকড়ি। সাতকড়ি কবিকঙ্কণের ভাঁড়ুদত্তের উত্তরাধিকারী—খাঁটী বাঙ্গালী। গিরিশচন্দ্র এই চরিত্ররচনায় একটু বেশিমাত্রায় রঙ চড়াইয়াছেন মাত্র।

গিরিশচন্দ্র যে মানুষগুলির চরিত্র এই নাটকে চিত্রিত করিয়াছেন—তাহারা সকলেই কলিকাতাবাসী পশ্চিমবঙ্গের লোক। পশ্চিমবঙ্গের লোকদের চরিত্রে, কর্ম্মজীবনে, ভাষায় ও আচরণে যে বৈশিষ্ট্য আছে—তাহাই ফুটিয়াছে এই নাটকে। পাশ্চাত্য প্রভাবপুষ্ট সেকালের ব্রাহ্ম সমাজে যে নৈতিক আদর্শ অনুসৃত হইত—তাহাই আমরা পাই কালীকিঙ্করের চরিত্রে। স্বভাবতঃ সজ্জন অশিক্ষিত বাঙ্গালীর নৈতিক আদর্শ আমরা পাই শান্তিরাম চরিত্রে। হিন্দু-নারীর স্বাভাবিক সহৃদয়তার সহিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নৈতিক আদর্শের মিলন হইয়াছে রঙ্গিণী চরিত্রে।

সেক্সপীয়ারের King Lear, Macbeth, As you like it, Merry wives of Windsor ইত্যাদি নাটকের প্রভাব গিরিশচন্দ্রের অনেক নাটকেই পাওয়া যায়। Romantic নাটকের Technique গিরিশচন্দ্র সামাজিক নাটকে প্রয়োগ করিয়াছেন।

এই নাটক Realistic নাটক নয়—কাজেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতার সন্ধান ইহাতে না করাই ভালো। অথচ ইহা পুরা Idealistic নাটকও নয়। ভাবের গভীরতাও ইহার মধ্যে সন্ধান না করাই ভালো। ইহা Didactic নাটক—লোকশিক্ষার জন্য রচিত—তাঁহার অভিনয়ের দর্শকগণ ইহাতে যুগপৎ আনন্দ ও সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছে। এই নাটকের সার্থকতা তাহাতেই।

গিরিশচন্দ্রের তপোবল

তপোবল গিরিশচন্দ্রের একখানি পৌরাণিক নাটক। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির বিচার করিতে গেলে মনে রাখিতে হইবে—গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক আখ্যানের কোন Symbolical বা Allegorical Interpre tation দে। নাই। দেশে নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়া ধর্ম ও নীতিপ্রচারই তাঁহার ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি পৌরাণিক যুগের কোন পরিবেষ্টনী বা পটভূমিকাও সৃষ্টি করেন নাই। পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে তিনি সাধারণ নরনারীর চরিত্রেই পরিণত করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, তাহারা যেমন বর্তমান যুগের বাংলা ভাষায় কথা বলিতেছে—তেমনি তাহারা বর্তমান যুগের বাঙ্গালী নরনারীর মতই অধিকাংশস্থলে আচরণ করিতেছে, ইহাতে চরিত্রগুলি রক্তমাংসে অনেকটা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু পৌরাণিক রোমান্স তাহাদের চরিত্রে নাই। পৌরাণিক নাট্য তাঁহার হাতে অনেকটা সামাজিক নাটকে পরিণত হইয়াছে। অতিপ্রাকৃত ব্যাপারগুলিকে তিনি বর্জন করেন নাই। সেগুলির কথা বাদ দিলে এবং স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল, সুমেরু, গন্ধর্বলোক, যমপুরী ইত্যাদিকে ভিন্ন ভিন্ন দেশ প্রদেশ মনে করিলে পৌরাণিক আখ্যান সামাজিক আখ্যানের মতই হইয়া পড়ে।

পৌরাণিক নাট্যরচনায় গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত নাট্যকারদেরও অনুসরণ করেন নাই, ইংরাজি নাট্যকারদেরও অনুসরণ করেন নাই। দেশে যে যাত্রাভিনয় প্রচলিত ছিল—সেই যাত্রার নাট্যকলাকে তিনি যত দূর সম্ভব মার্জিত করিয়া নগরের রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র প্রত্যেক নাটকখানিকেই রঙ্গমঞ্চের অভিনয়োপযোগী করিয়াই সৃষ্টি করিতেন, শ্রব্য কাব্য হিসাবে তাহা সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিবে এবং মেঘনাদবধ বা বৃত্রসংহারের মত অধীত হইবে—ইহা মনে করিয়া কোন নাটকই লেখেন নাই। তিনি কোন দিন মনেও করেন নাই—রঙ্গমঞ্চের বাহিরে ইহার কোন সার্থকতা আছে। ইহা যে একদিন নাট্যমঞ্চ ত্যাগ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যমঞ্চে আরোহণ করিবে তাহাও তিনি ভাবেন নাই।

তাঁহার দৃষ্টি দূর ভবিষ্যৎত নয়ই, অদূর ভবিষ্যতের পানেও ছিল না। তাঁহার সামসময়িক-সমাজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া এবং যে শ্রেণীর শ্রোতা ও দর্শক সেকালে রঙ্গমঞ্চের অনুরাগী ছিল, তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, প্রকৃতি ও তাহাদের রসবোধের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি এই নাটকগুলি রচনা করিয়াছেন।

তপোবল নাটকখানি বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠের দ্বন্দ্ব অবলম্বন করিয়া রচিত। ঐতিহাসিকগণ বলিবেন, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য লইয়া প্রাচীনকালে একটা সংঘর্ষ বহুদিন ধরিয়া চলিতেছিল—বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্ব তাহারই একটা প্রতীক বা নিদর্শন মাত্র। কোন পুরাবৃত্তজ্ঞ হয়ত বলিবেন—ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা বাড়াইবার জন্য, জন্মাভিমানী ব্রাহ্মণেরা হয়ত এ কাহিনীর সৃষ্টি

করিয়াছে। ব্রাহ্মণত্ব এমনি দুর্লভ যে ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র সর্বস্বত্যাগ করিয়া বহুবর্ষ তপস্যা করিয়াও তাহা পায় নাই। সাহিত্যিকরা বলিবেন, জ্ঞানবল আর পশুবলের যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব, শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র জগতেই চিরদিন চলিয়াছে—বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র দ্বন্দ্ব তাহারই প্রতীক।

গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, তপোবলের সঙ্গে তপোবলেরই দ্বন্দ্ব। বশিষ্ঠের কামধেনু তপোবলেরই গোমূর্তি। তপোবলের দ্বারাই বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে পরাজিত করিলেন। বিশ্বামিত্র দেখিলেন—তাঁহার রাজশক্তির বল তপোবলের কাছে তুচ্ছ। তিনি এই তপোবল অর্জনের জন্য রাজ্যসম্পদ ও ঐহিক সুখসম্ভোগ সমস্ত ত্যাগ করিলেন। এই তপোবল অর্জনে বহু বাধাবিঘ্ন আসিয়া জুটিল। একে একে সেইগুলিকে জয় করিতে হইল তাঁহাকে। ক্রমে তিনি বশিষ্ঠের চেয়েও প্রবলতর তপোবল লাভ করিলেন। এই তপোবলে অসাধ্য সাধন করা যায়। কিন্তু বিশ্বামিত্র শেষ পর্যন্ত দেখিলেন,—এই তপোবলও তুচ্ছ, ইহার চেয়ে ব্রহ্মবল বড়। এই ব্রহ্মবল জন্মগত ব্রাহ্মণত্বের বল মাত্র নয়, ইহা ব্রহ্মজ্ঞানের বল—আদর্শ ব্রাহ্মণের যাহা কাম্য। এই বলের দ্বারা ঐহিক ঐশ্বর্য বা শক্তিসামর্থ্য লাভ হয় না ঐন্দ্রজালিক বিভূতি লাভ হয় না, ইহাই চরম আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, মানবাত্মার চরম সাধনার ধন। বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-লাভের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ।

দ্বন্দ্বের প্রারম্ভে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ বশিষ্ঠেরও ঘটে নাই। তিনিও তপোবলের উপর নির্ভর করিয়া সংঘর্ষে নামিয়াছিলেন—ক্রমে তিনিও বুঝিলেন তপোবল তুচ্ছ। ইহাতে আমিত্বই প্রবল হয়, চরম কাম্য ইহাতে লাভ করা যায় না। তপস্যার বলেরও একটা সীমা আছে। ইহার দ্বারা সর্বদুঃখ জয় করা যায় না। তিনিও ক্রমে বহু দুঃখকষ্ট, শোকতাপ, পরাজয়-পরাভবের মধ্য দিয়া প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিলেন। তখন হইলেন সর্বদ্বন্দ্বাতীত,—ক্রোধ, দ্বেষ, প্রতিহিংসা, আত্মাভিমান ইত্যাদি সমস্ত জয় করিয়া উঠিলেন।

এই ব্রহ্মজ্ঞান বশিষ্ঠ প্রথমে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বামিত্র শেষ পর্যন্ত বশিষ্ঠের কাছেই ব্রহ্মজ্ঞতার চরম দীক্ষালাভ করিলেন। গিরিশচন্দ্র ব্রহ্মজ্ঞানের কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, কিন্তু বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বের যে যে লক্ষণের তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি ব্রহ্মজ্ঞতারই লক্ষণ।

ব্রহ্মবল লাভ করিতে হইলেও তপস্যার প্রয়োজন হয়। এই তপস্যা দুইজনেই করিলেন। কিন্তু তপোবলই ব্রহ্মবল নয়। এই তপোবলের প্রয়োগ বিশ্বের অহিতের জন্যও হইতে পারে, ইহা অধর্মের পথেও চালিত হইতে পারে, ঐহিক প্রাধান্যলাভের জন্যও প্রযুক্ত হইতে পারে, মানুষে মানুষে ঘোরতর বৈরিতা-সাধনে আয়ুধ হইয়া উঠিতে পারে। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বৃত্র, শুম্ভ, নিশুম্ভ, ত্রিপুর, তারকাসুরও তপস্যা করিয়াছিল—তাহাদেরও তপোবল ছিল। বিশ্বামিত্র এই তপোবলের প্রয়োগ করিয়াছিলেন, আত্মপ্রাধান্য লাভের জন্য। ইহাই তপোবলের অপপ্রয়োগ।

এই তপোবলই বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক বল। ইহার দ্বারা যে বিশ্বের কত অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা বর্তমান যুগে কাহারও অবিদিত নাই। ব্রহ্মার মুখ দিয়া গিরিশচন্দ্র

বলাইয়াছেন—

ক্রমবিকাশের ক্রম শক্তির নিয়ম
কলিযুগে রহস্য দেখিবে বিজ্ঞানপ্রভাবে
নব ফল পুষ্প কত মানব সৃজিবে।
সে বিজ্ঞান, জড়জ্ঞানে শক্তিআরাধনা
জড়শক্তি বিশ্বামিত্র করেছে অর্জন।
প্রকৃত সাধক তাহা না করে গ্রহণ॥

প্রকৃত সাধকের যাহা কাম্য, শেষ পর্যন্ত বিশ্বামিত্র তাহা লাভ করিলেন।

প্রকৃত সাধকের কাম্য যে ব্রহ্মবল তাহা লাভ করিবার একটি পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন বশিষ্ঠ, আর একটি পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন বিশ্বামিত্র। বশিষ্ঠের পথ আদর্শ ব্রাহ্মণের পথ, ইহাই সাত্ত্বিকতার পথ। বিশ্বামিত্রের পথ পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়ের পথ,—রাজসিকতার পথ। এই পথে বাধাবিঘ্ন জয় করিতে হয় মুহুর্মুহুঃ। এ পথ বড়ই দুর্গম। এ পথে সঞ্চিত তপ কিছু থাকে না। সেজন্য আগে তপ অর্জন করিয়া চিত্তশুদ্ধি ঘটাইতে হয়।

গিরিশচন্দ্র বিশ্বামিত্রের কাহিনী বিবিধ পুরাণের মধ্য হইতে যাহা যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাদের প্রায় সমস্তই এই নাটকে সুন্দরভাবে গুম্ফিত করিয়াছেন। ২।১টি অঙ্গ বাদ গিয়াছে। একটি হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, আর একটি শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের জীবনে শক্তিসঞ্চার। বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে 'বলা অতিবলা' বিদ্যা দান করেন, এই বিদ্যা দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা, নিদ্রা, ক্লান্তি, জড়তা ইত্যাদি জয় করা যায়। ইহা ছাড়া, তিনি রামলক্ষ্মণকে জৃম্ভকাস্ত্র দান করেন—এ সমস্তই বিশ্বামিত্রের তপোলব্ধ। ইহা ছাড়া, শতদ্রু নদীকে ঋক্‌মন্ত্রের দ্বারা বিশ্বামিত্র সুপ্রতর ও নাব্য করিয়াছিলেন। তপস্বী বিশ্বামিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—

দেশে দেশে ব্রহ্মক্ষত্র বিশ্বগোত্রী বিশ্বামিত্র তব জাগরণ,
তব ঋঙ্‌মন্ত্রে রথি সুপ্রতরা নদনদী বিজিত ভুবন।
জন্মবলে নহে তব পুষ্করে দুষ্কর তপে ব্রহ্মপদ-লাভ,
রাষ্ট্রজ তি নবনব যুগেযুগে গড়ে তব তপের প্রভাব।
তব যোগভঙ্গফলে চতুঃষষ্টি কলাশিশু জন্মে কালে কালে,
শিল্পিশকুন্তেরা যারে বক্ষপুটে স্নেহসারে পক্ষচ্ছায়ে পালে।
প্রমূর্ত্ত পুরুষকার, তোমার জৃম্ভক আজো অশিবে তাড়ায়।
তব রাজপরীক্ষার বহ্নিকুণ্ড জলে শত মণিকর্ণিকায়।
অভিশপ্তা মুক্তি লভে, যজ্ঞদ্রোহী মহাহবে পুড়ে দলে দলে
দেশবৈরী সৃষ্টিত্রাস মাতৃহার দর্পনাশ তোমারি কৌশলে।
আজো গায়ত্রীর সহ অতিবলা বিদ্যা কহ তরুণ শ্রবণে,
সত্যশিব-শুরসতী-মিলনের প্রজাপতি রাজর্ষি-ভবনে।

ইহাতে বিশ্বামিত্র-চরিত্রে একটা সার্ব্বভৌম ব্যাখ্যান আরোপ করা হইয়াছে।

পুরাণোক্ত উপাখ্যানে কোন কোন স্থলে গিরিশচন্দ্র নিজের কল্পসৃষ্টির সংযোগ করিয়াছেন। যেমন—শুনঃশেফের কাহিনীতে। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মজ্ঞানের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার চরম কাম্য লাভে বিলম্ব নাই, ইহা বুঝাইতে বিশ্বামিত্র শুনঃশেফের পরিবর্ত্তে

আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। ইহা পুরাণে নাই। বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে যে ঋক্‌মন্ত্র দান করিয়াছিলেন তাহাই উচ্চৈঃস্বরে গান করিবামাত্র স্বয়ং ইন্দ্র অপহৃত ছাগ লইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। ইহাই পুরাণোক্ত কাহিনী। কল্মষপাদের কাহিনীতেও কবির কল্পনাতূলীর সংযোগ আছে।

গিরিশচন্দ্র বেদমাতা গায়ত্রী, ব্রহ্মণ্যদেব, ধর্মরাজ ইত্যাদির ভাববিগ্রহ কল্পনা করিয়াছেন। এই ভাববিগ্রহগুলি নাটকখানির পৌরাণিকতার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে।

যাহাই হউক, অনেকগুলি কাহিনীকে নাট্যে স্থান দেওয়ার জন্য নাট্যের গতি হইয়াছে বড়ই দ্রুতচারী। এতই দ্রুতচারী যে কোথাও মনোবেগের উচ্ছলতার অবসর হয় নাই। কি শোকে, কি ক্রোধে, কি মোহমুগ্ধতায়, কি পরাভবে, কি জয়োল্লাসে, কোথাও হৃদয়োচ্ছ্বাসের স্থান হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ—

দূত আসিয়া বলিল—"শত রাজপুত্র হত বশিষ্ঠের বলে।"

ইহা শুনিয়া বিশ্বামিত্র শুধু বলিলেন—"পুত্রহন্তা ব্রাহ্মণের আজ নিস্তার নাই।"

এত বড় ব্যাপারের প্রসঙ্গে, আর কোন কথা নাই।

বশিষ্ঠ অরুন্ধতীকে শক্তির মৃত্যু সংবাদ দিলেন। অরুন্ধতী কেবল বলিলেন—

"হা জগদীশ্বরি! কি কর্‌লি। কি হ'ল? প্রভু, দারুণ শোকে কি ক'রে জীবন ধারণ কর্‌ব?"

গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক আবেষ্টনী হইতে নাটকের পাত্রপাত্রীগুলিকে আমাদের চারি-পাশের জগতে নামাইয়া আনিয়াছেন। অযোধ্যার রাজারা সাধারণ ভূস্বামী, ঋষিরা সাধারণ যজমানিয়া বামুন, স্বর্গের অপ্সরারা সাধারণ নগরবেশ্যায় পরিণত হইয়াছে। বিশ্বামিত্রের বয়স্য সদানন্দ একজন ঔদরিক ব্রাহ্মণ। ইহার ঔদরিকতার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য বোধ হয় তিনি ঔদরিক ব্রাহ্মণের ভোজন-লালসার সাহায্যে রঙ্গরসের সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। নাটকের বিষয়বস্তু যেরূপ গুরুগম্ভীর তাহাতে ইহার দ্বারা রসাভাসেরই সৃষ্টি হইয়াছে! পক্ষান্তরে, বিষয়গুরুত্বে ভারাক্রান্ত শ্রোতাদের চিত্তে সাময়িক লঘুত্ব-সম্পাদনের জন্য তিনি ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে—গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাট্যে একজন করিয়া বিদূষক থাকে, এবং এই বিদূষকের রঙ্গভঙ্গীর অন্তরালে একজন বৈরাগী মহাপুরুষ প্রচ্ছন্ন থাকে! সদানন্দের মধ্যেও সেইরূপ একজন মহাপুরুষ অধিষ্ঠিত ছিল। ত্রিশঙ্কুর রাণীর রাজ্ঞী-মর্যাদা কবি রাখেন নাই বটে, কিন্তু বিশ্বামিত্রের রাণীর চরিত্রের পৌরাণিক গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। অরুন্ধতীকে বশিষ্ঠের উপযুক্তা সহধর্মিণীরূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। সহধর্মিণীত্ব অপেক্ষা মাতৃত্বের প্রাধান্য তাঁহার চরিত্রে দেখাইলে হয়ত আরো চমৎকারই হইত।

নাটকের দুই একস্থলে লিরিক্যাল মাধুর্য্য ফুটিয়াছে। যেমন—১। রম্ভার শিলাময়ী মূর্তি দেখিয়া উর্বশীর খেদোক্তি। ২। মেনকার স্বর্গসুখে অরুচি ও মর্ত্ত্যজীবন-প্রীতি।

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কাছে পরাজিত হইয়া বুঝিলেন,—বশিষ্ঠ তপোবলেই তাঁহাকে

পরাজিত করিলেন। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন "আমি তপস্যার দ্বারা সেই বল লাভ করিয়া বশিষ্ঠকে পরাজিত করিব।" বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করিলেন। তপের শক্তিতে তিনি ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে প্রেরণ করিলেন, ত্রিশঙ্কুর পতন হইলে তাহার জন্য তিনি নূতন স্বর্গ রচনা করিলেন। ইহা মহাশক্তির আরাধনা করিয়া একটা বিভূতিলাভ মাত্র। ইহাতে বিশ্বামিত্রের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় নাই, শরণাগতকে আশ্রয়দান, ইহা তাঁহার ক্ষত্রোচিত কার্য্যমাত্র। কল্মষপাদকে তপঃপ্রভাবে বিশ্বামিত্র রাক্ষসী শক্তি দান করিলেন। সে মহা-অনিষ্টসাধন করিতে আরম্ভ করিলে, বিশ্বামিত্রের মনে একটু সামান্য অনুতাপ জন্মিয়াছিল মাত্র।

তপঃপ্রভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় নাই বলিয়াই বিশ্বামিত্রকে মেনকার রূপে মুগ্ধ হইয়া তপশ্চর্য্যা বিসর্জন দিতে হইল। সাধ্বীপতিব্রতা মহিষীকে প্রবঞ্চিত করিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করিলেন না। মেনকা শকুন্তলাকে প্রসব করিয়া ঋষিকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বিশ্বামিত্রের তখন চৈতন্য হইল। সেই নবপ্রসূতা কন্যার মায়াতে মুগ্ধ না হইয়া হিমাদ্রিশৃঙ্গে কঠোরতর তপস্যার জন্য তিনি চলিয়া গেলেন। কঠোর তপস্যায় তিনি ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করিলেন। রম্ভা তাঁহার তপোভঙ্গ করিতে গিয়া প্রস্তররূপে পরিণত হইল। ক্রমে তিনি কাম জয় করিলেন। এখনো ক্রোধ জয় করিতে পারেন নাই। তিনি তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইলেন। তাঁহার চিত্তে অনুতাপবহ্নি জ্বলিল। কল্মষপাদ বশিষ্ঠের শতপুত্রকে বধ করিয়াছে—কল্মষপাদকে বশিষ্ঠদ্রোহী জানিয়া তাহাকে রাক্ষসী শক্তি দিয়াছেন; সুতরাং বশিষ্ঠের শতপুত্রবধের জন্য তিনিই দায়ী। রম্ভাকে অভিশপ্ত করিয়াও তাঁহার মনে নির্বেদ জন্মিল। এই নির্বেদই হইল অভিনব তপস্যা।

ক্রমে তিনি বুঝিলেন—ইন্দ্রিয়ের অসংযমে যেমন তপঃক্ষয় হয়, অভিশাপ প্রদানেও তেমনি তপঃক্ষয় হয়, বিভূতিপ্রদর্শনে তপঃশক্তি নিয়োগ করিলেও তেমনি তপঃশক্তির ক্ষয় হয়। ইন্দ্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ত্রিশঙ্কুর ব্যাপার লইয়া তিনি বহু তপঃক্ষয় করিয়াছেন। প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে কোন অলৌকিক কিছু ঘটাইতে গেলেই তপঃশক্তির ব্যয় করিতে হয়। অরুন্ধতী যখন বশিষ্ঠকে তাঁহার তপঃশক্তির প্রয়োগ করিয়া শতপুত্র পুনর্জীবিত করিতে অনুরোধ করেন, তখন বশিষ্ঠ প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে তপঃশক্তির প্রয়োগ করিতে চাহেন নাই। একদিন যখন তিনি তাহা করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে নাই।

শুনঃশেফ যখন বিশ্বামিত্রের শরণ গ্রহণ করিল, বিশ্বামিত্র তখন আধ্যাত্মিক পথে অনেক দূর অগ্রসর। প্রথমতঃ তিনি শরণাগত বালককে আশ্রয় ও অভয়দান করিলেন, দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তপঃশক্তির প্রয়োগ করিলেন না। তৃতীয়তঃ তিনি নিজেই ঋচীকপুত্রের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইলেন। দেহের অনিত্যতা তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন—এই দেহবিসর্জনে আর তাঁহার সঙ্কোচ নাই। তিনি প্রায়োপবেশনে বসিলেন। ধর্মরাজ আসিয়া তখন দেহত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন—

"এ প্রায়োপবেশন নয়, যে পুণ্যবান্ ঈশ্বরলাভাশায় অনশনে দেহত্যাগ করেন,

প্রায়োপবেশন তাঁহারই হয়। আপনি অভিমানে দেহত্যাগে প্রবৃত্ত হয়েছেন, মানসিক আত্মহত্যাপাপে আপনি লিপ্ত।"

ইন্দ্র ছদ্মবেশে ছলনা করিতে আসিলেন। বিশ্বামিত্র হিমালয়শৃঙ্গে কোন খাদ্য না পাইয়া সেখানে প্রস্ফুটিত একটি মাত্র পদ্মের মৃণালের দ্বারা জীবনরক্ষায় উদ্যত, এমন সময় ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র তাহা প্রার্থনা করিলেন। বিশ্বামিত্র অম্লানবদনে তাহা দিয়া দিলেন। বিশ্বামিত্রের মৃত্যুকাল উপস্থিত। ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। বিশ্বামিত্র যোগৈশ্বর্যহীন নিরভিমান হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে চাহিলেন। তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইয়াছে দেখিয়া—ব্রহ্মা তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করিলেন।

ইন্দ্র আসিয়া বলিলেন—আমি তোমার পরীক্ষার জন্য ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণবেশ ধরিয়াছিলাম,—তুমি ব্রহ্মর্ষি, তুমি সমস্ত নিয়মের বহির্ভূত। বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন—

কুদৃষ্টান্তস্থাপনে বাসনা নাহি মম তথাপি যা বিধির নিয়ম
শাস্ত্রের বচন, ত্রিকালজ্ঞ হয় যেই জন লঙ্ঘন উচিত নহে তার।
ইচ্ছামাত্র সাগর লঙ্ঘিতে ক্ষম। ধাতার নিয়ম করি মস্তকে ধারণ।

বিশ্বামিত্র তাঁহার যোগৈশ্বর্যের প্রয়োগ আর করিতে চাহেন না—কারণ, উহা ব্রহ্মজ্ঞগণের বর্জনীয়।

বিশ্বামিত্র এখনও বশিষ্ঠ সম্বন্ধে নিরভিমান হইতে পারেন নাই। ব্রহ্মার বর সত্ত্বেও তাঁহার সম্পূর্ণ ব্রহ্মত্বলাভ হইতে বিলম্ব আছে। তাঁহার গুরুকরণ হয় নাই। তপের গুরু নয়, ব্রহ্মজ্ঞানের গুরু এখনো তাঁহার ভাগ্যে জুটে নাই।

যতদিন না বশিষ্ঠ তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া স্বীকার করিবেন, ততদিন তিনি ব্রহ্মর্ষি নহেন। বশিষ্ঠ হইতেই যে যাত্রার সূত্রপাত, বশিষ্ঠেই সেই যাত্রার অবসান হইল! বশিষ্ঠ জানিতেন বিশ্বামিত্র এখনো অভিমান ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে শেষ শিক্ষা দিতে হইবে। তার পর বিশ্বামিত্রের ও বশিষ্ঠের বাদানুবাদ এবং বশিষ্ঠমারণ যজ্ঞ। সেই যজ্ঞের হোতৃপদ স্বীকার করিলেন বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ হোতৃপদে অধিষ্ঠিত হইয়া যখন যজমান বিশ্বামিত্রের ইচ্ছা অনুসারে নিজকেই উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইলেন—তখনই বিশ্বামিত্রের গুরুকরণ হইল। ইহাতেই তাঁহার প্রকৃত ব্রহ্মর্ষিত্বলাভ। তিনি ব্রহ্মর্ষি বলিয়া স্বীকার করিয়া প্রণতি জানাইলেন।

ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিলে জীবন্মুক্তি ঘটে। বিশ্বামিত্রের সেই জীবন্মুক্তি আগেই ঘটিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র তাহা শুনঃশেফের পরিবর্তে আত্মবলিদানে এবং ছদ্মবেশী ইন্দ্রকে মৃণালদানে অর্থাৎ নিজের জীবনের বিনিময়ে ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের জীবনরক্ষার চিত্রে দেখাইয়াছেন। ইহাতেই বিশ্বামিত্র প্রকৃত আদর্শ ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। ইহা বিশ্বামিত্রের সাধনার দ্বারা অর্জিত। ব্রহ্মার বর একটা উপলক্ষ্যমাত্র।

গিরিশচন্দ্র এখানে ক্ষান্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু নাটকে একটা সুসংযত উপসংহার হওয়া চাই। শেষ পর্যন্ত বশিষ্ঠের কাছেই বিশ্বামিত্রের চরম দীক্ষা, ইহাই দেখানো কবির

উদ্দেশ্য। সে জন্য তিনি ঐখানে ক্ষান্ত না হইয়া বশিষ্ঠের মারণযজ্ঞের একটা দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন বিশ্বামিত্র এখনো সম্পূর্ণ নিরভিমান হইতে পারেন নাই। এই অভিমান এখনো বর্তমান থাকার জন্য বশিষ্ঠ তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাহার ফলেই বশিষ্ঠমারণ যজ্ঞ। সেই যজ্ঞে যখন বশিষ্ঠ নিজেই নিজের মারণের জন্য আহুতি দিতে প্রস্তুত, তখন বিশ্বামিত্রের চৈতন্য হইল। বিশ্বামিত্র তখন বশিষ্ঠের চরণতলে পড়িয়া চিবপরাভব স্বীকার করিলেন। এই পরাভব স্বীকারেই সম্পূর্ণরূপ আমিত্ব-বর্জন ও চবম দীক্ষা। বশিষ্ঠও বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া প্রণাম জানাইলেন।

এখন কথা হইতেছে—গিরিশচন্দ্র বলিতে চাহিয়াছেন ইতিপূর্ব্বে বিশ্বামিত্র যে দুইবার আত্মোৎসর্গ করিতে চাহিয়াছিলেন—তাহাতে অভিমান মিশ্রিত ছিল। অভিমানবশেও আত্মোৎসর্গ করা যায়। বশিষ্ঠের নিরভিমান আত্মোৎসর্গ দেখিয়া বিশ্বামিত্রেব মনে অভিমান নিশ্চিহ্নভাবে দূরীভূত হইল। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হইলেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মর্ষি এক নয়, একথা গিরিশচন্দ্র বহুবার বলিয়াছেন। অথচ কেন যে দুইএর মধ্যে মাঝে মাঝে নাটকে গোলযোগ ঘটিয়া গিয়াছে তাহা বুঝা যায় না!

শক্তি ক্রোধভরে অভিশাপ দিয়াছিলেন, অতএব তিনি ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রহ্মর্ষি নহেন। ঋষিদের মধ্যে যাঁহারা অভিমানী, যাঁহারা অভিশাপ দিতেন—তাঁহারা ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রহ্মর্ষি নহেন। বশিষ্ঠ যখন ঐশ্বর্যপ্রসবিনী শবলাকে ত্যাগ কবিতে পারেন নাই, আত্মরক্ষার্থে বা শবলার রক্ষার্থে যুদ্ধ করিলেন ও বিশ্বামিত্রের শতপুত্রকে হত্যা করিলেন, তখন তিনিও ব্রহ্মর্ষি ছিলেন না, পরে তিনি ব্রহ্মর্ষি হইলেন। অতএব ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মর্ষি এক নহে। যে উচ্চস্বরে গিরিশচন্দ্র তাঁহার তন্ত্রী বাঁধিয়াছিলেন, কাঁটায় কাঁটায় পুবাণের অনুসবণ করিতে গিয়া তাহা মাঝে মাঝে নামিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন বিশ্বামিত্রকে—তাহার ব্রাহ্মণত্বলাভ জগতে প্রচারের কি প্রয়োজন? বিশ্বামিত্র বলিলেন—

> বর্ণান্তবে জন্মি যদি উচ্চচেতা জন
> করে আকিঞ্চন ব্রাহ্মণত্ব করিতে অর্জন
> তপের প্রভাবে তাহা লভিবে নিশ্চয়।
> ব্যাপিয়া সংসার আছে যে সংস্কার
> ব্রাহ্মণ ঔরসে মাত্র জনমে ব্রাহ্মণ।
> আদর্শ আমার হবে ভুবনে প্রচার
> শ্রেষ্ঠ নীচ আচারে মানব,
> তপশ্চারী যেই নর, ব্রাহ্মণত্ব তার।
> শ্রেষ্ঠ হয় সর্বাপেক্ষা আচারে ব্রাহ্মণ
> জন্ম লভি ব্রাহ্মণের ঘরে
> বাল্যাবধি সুদীক্ষিত হয় নিষ্ঠাচারে
> এইমাত্র বিপ্রগৃহে জনমে গৌরব।

যে ব্রাহ্মণ্য বিশ্বামিত্রের কাম্য, তাহার জন্য চাই তপস্যা, সে ত সবার প্রয়োজন ব্রাহ্মণবংশে জাত সন্তানেরও যেমন,—বর্ণান্তরে জাত সন্তানেরও তেমনি।

বিশ্বামিত্র যখন বশিষ্ঠের কাছে পরাজিত হইয়া ব্রাহ্মণবংশে জন্মের জন্য সংকল্প করিয়া ত্রিবেণীতে প্রাণোৎসর্গ করিতে চাহিলেন—তখন গিরিশচন্দ্রের ব্রহ্মণ্যদেব বলিতেছেন—

"তা হ'লে কি হবে? তোমার চারটা হাত বেরোবে, না ল্যাজ বেরোবে? এখন কোনটা কম আছে—যে তখন সেটা বেশি হবে? * * আত্মা সবার সমান। যে তপস্যায় আত্মদর্শন করে—সেই-ই ব্রাহ্মণ, নচেৎ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে তুগাছা সুতো গলায় দিয়ে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ করলে কি ব্রাহ্মণ হয়?"

পুরাণে অবশ্য জাতি-ব্রাহ্মণের কথাটাই বড় করিয়া বলা আছে। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু বেদাধিকারে ব্রাহ্মণে ও ক্ষত্রিয়ে খুব বেশি প্রভেদ নাই। বেদমাতা গায়ত্রী ব্রাহ্মণেরও যেমন মাতা, ক্ষত্রিয়েরও তেমনি। ব্রহ্মবিদ্যার চর্চায় ব্রাহ্মণদের চেয়ে ক্ষত্রিয় ন্যূন ছিল না। পুরাণে ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণের চেয়ে অনেক বেশি হীন করা হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র যদি এই বিষয়ে পুরাণকে অনুসরণ না করিয়া ব্রহ্মজ্ঞতার উপরই বেশি জোর দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নাটকখানি সার্বজনীন আবেদন (Universal appeal) লাভ করিতে পারিত। বিশ্বামিত্রে বশিষ্ঠ দেখিতে চাহিয়াছিলেন—শম, দম, তিতিক্ষা, অহিংসা, যজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ। এইগুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। ব্রহ্মজ্ঞ যাঁহারা, তাঁহারা শেষ পাঁচটির বহু ঊর্ধ্বে—প্রথম চারিটি ব্রহ্মজ্ঞদের অন্যান্য লক্ষণগুলির মধ্যে পড়ে। গিরিশচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে যে স্তরে আরোপিত করিয়াছেন সে স্তরে শেষ পাঁচটির কথা না উঠিলেই চলিত।

তপোবলে ঘোর তমঃ নাহি হয় দূর।

কেবল তপস্যাতেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয় না, তপস্যার চেয়েও উচ্চতর সাধনা আছে, একথা যথাযোগ্যই বটে। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কৃপাও চাই। ইহাতে সার্বজনীন সত্য আছে। তবে তপস্যায় কতটা হয়?

নাহি জাতির বিচার
লভে নর উচ্চপদ তপোবলে।
তপ দৃঢ় সহায় জীবনে।
প্রভাবে যাহার
ঘুচে নীচ সংস্কার
মলিনত্ব হয় বিদূরিত
জন্মে আত্মবোধ
ঘুচে যায় জনমমরণ ভ্রম

উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে
তপোবলে করে আরোহণ।
তপ অতুল সম্পদ
দানে সেই উচ্চপদ
সেই পদ আকাঙ্ক্ষা যাহার
সাধ্যাসাধ্য নাহিক বিচার
পায় সর্ব অধিকার
হীনজন অতি উচ্চ হয় তপোবলে।

বশিষ্ঠের কাছে চরম দীক্ষালাভ না করিলে, কেবল তপোবলে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হইতে পারিতেন না। বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া নয়—ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া বিশ্বামিত্রকে চরম দীক্ষা দিতে পারিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে তপোবলই শ্রেষ্ঠ। ইহাতে ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার একটা আদর্শ নাট্যরূপলাভ করিয়াছে!

সিরাজউদ্দৌলা

বাঙ্গালা ভাষায় আসল ঐতিহাসিক উপন্যাস বঙ্কিমের রাজসিংহ, ঐতিহাসিক রমন্যাস রমেশচন্দ্রের *মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত ও রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা, ঐতিহাসিক কাব্য নবীনচন্দ্রের* পলাশীর যুদ্ধ এবং ঐতিহাসিক নাটক গিরিশচন্দ্রের সিরাজউদ্দৌলা। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ সিরাজের চরিত্রকে মসীকলঙ্কে অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছিল—সিরাজের মত অত্যাচারী প্রজা-পীড়ক দুশ্চরিত্র নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইংরাজরা বাঙ্গালা দেশকে নিরাপদ, নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব করিয়া তদ্দ্বারা বাঙ্গালা দেশের অশেষ কল্যাণসাধনই করিয়াছিল। ইহাই ইংরাজ ঐতিহাসিকদের প্রতিপাদ্য। নিখিলনাথ রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার ইত্যাদি ঐতিহাসিকগণ বিদেশী ইতিহাসের মিথ্যা দোষারোপ খণ্ডন করিয়া সিরাজের প্রকৃত চরিত্র উদ্ঘাটন করেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সিরাজচরিত্র অবলম্বনে এই নাটক রচনা করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র এই নাটকে আসল ঐতিহাসিক তথ্যগুলিকেই নাট্যরূপ দিয়াছেন—কল্পনার লীলার বিশেষ কিছু সাহায্য ল'ন নাই। অবিমিশ্র ঐতিহাসিক তথ্যকে নাট্যরূপদানেই গিরিশচন্দ্র অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। সিরাজের জীবনের 'facts are stranger than fictions'. কাজেই তথ্যগুলি সহজেই একটা রোমাণ্টিক রূপ ধারণ করিয়াছে।

সিরাজউদ্দৌলা একখানি National Tragedy. সিরাজের পতনে বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা লোপ—এই হিসাবে ইহা National Tragedy. হিন্দু-মুসলমানে মিলিত সমগ্র জাতির প্রতিনিধিবর্গ আত্মঘাতী ষড়্‌যন্ত্রের দ্বারা বিদেশী বণিকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করিয়া সমগ্র দেশকে বিদেশী বণিকের হস্তে সমর্পণ করিল! ইহারা যে ষড়্‌যন্ত্র করিল তাহা প্রজার কল্যাণসাধনের জন্য নয়, নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এই ষড়্‌যন্ত্রের ক্রমবিকাশ ও চরম পরিণতিই নাটকের উপজীব্য। গিরিশচন্দ্র এই ষড়্‌যন্ত্রের ক্রমপরিণতি গর্ভাঙ্কে গর্ভাঙ্কে অসামান্য দক্ষতার সহিত দেখাইয়াছেন এই নাটকে। নাটকখানির প্রাণসঞ্চার করিয়াছে,—সিরাজের মানসিক দ্বন্দ্বসংঘর্ষ।

সিরাজ নবাবী তখ্‌ত পাওয়ার আগে যে সুরাপায়ী, ইন্দ্রিয়াসক্ত, খামখেয়ালী ও অত্যাচারী যুবক ছিলেন, গিরিশচন্দ্র তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, তখ্‌ত পাওয়ার পর হইতে, আলিবর্দির মৃত্যুশয্যায় শপথগ্রহণের পর হইতে সিরাজ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত প্রজাবৎসল দেশভক্ত নবাব। কিন্তু প্রাক্তন কর্মফল তাহাতে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। চরিত্রের পরিবর্তন হইলেও হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিগণ সিরাজকে ভালবাসিতে পারেন নাই—তাঁহার দুষ্কর্মের স্মৃতি অহরহ জাগরূক থাকিয়া তাঁহাদের বিরূপতা ক্রমে বাড়াইয়াই দিতেছিল। মুসলমান নরনারীর স্বার্থ ছিল অন্যরূপ। ঘসেটি বেগম আলিবর্দির জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং জ্যেষ্ঠা ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ। সে তাহার পোষ্যপুত্র এক্রামুদ্দিনের জন্য সিংহাসন দাবি করিয়াছিল। এই

এক্রামুদ্দিনও সিরাজেরই ভ্রাতা। এক্রামের মৃত্যু হইলেও সে দাবী ঘসেটি ভুলে নাই, তাহার শিশুপুত্রের জন্য তখ্‌ত দাবি করিতেছিল। বিশেষতঃ এক্রামুদ্দিনের জীবদ্দশায় যে বৈরিতার সূত্রপাত করিয়াছিল তাহা সে ভুলিতে পারে নাই। পূর্ণিয়ার নবাব শওকতজঙ্গ আলিবর্দির দ্বিতীয় কন্যার পুত্র—সেও মাতামহের তখ্‌তে দাবি পেশ করিয়াছিল। কিন্তু সে এতই অপদার্থ ছিল যে তাহাকে দমন করা কঠিন হয় নাই, যদিও ষড়্‌যন্ত্রীরা প্রথমে তাহাকেই আশ্রয় করিয়া সিরাজকে মসনদ হইতে তাড়াইতে চাহিয়াছিল। মির্জাফর আলিবর্দির ভগিনীপতি, সে আলিবর্দির আমলেই বিদ্রোহী হইয়াছিল এবং বাঙ্গালার মসনদ অধিকারের ফিকিরেই ছিল বরাবর। সেনাপতি ইয়ার লতিফেরও মসনদে লোভ ছিল। ইহারা সকলেই ঐতিহাসিক চরিত্র—ইহাদের সমস্ত আচরণই ইতিহাস-সম্মত। গিরিশচন্দ্র ইহাদের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াছেন—হোসেন কুলীখাঁর পত্নী জোহরাকে। হোসেন কুলিখাঁকে সিরাজ গুরুতর অপরাধের জন্য হত্যা করেন। জোহরা তাহার প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার জন্য ষড়্‌যন্ত্রীদের সহায়তা করিল। এই জোহরা গিরিশচন্দ্রের কল্পনাপ্রসূতা। ইহা ছাড়া, ইংরাজরা ষড়্‌যন্ত্রে যোগ দিয়াছিল রাজ্যাধিকারের জন্য নয়, অবাধ বাণিজ্যাধিকারের জন্য এবং অর্থলোভে। সিরাজের পক্ষে ছিল দুইজন প্রভুভক্ত সেনাপতি, একজন মীরমদন আর একজন মোহনলাল। ইহা ছাড়া, একজন সভাসদ্‌, সে বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করিলেও সে ছিল সিরাজের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। নাট্যকার তাহার নাম দিয়াছেন করিম চাচা। এই চরিত্রটি নাট্যকারের নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত।

সিরাজকে প্রায় নিঃসহায়ই বলা যাইতে পারে। তবু বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাবের প্রতাপ ত সামান্য নয়। সে প্রতাপের বিলোপসাধন করিতে হইলে অষ্টবজ্রের সমাবেশের প্রয়োজন। অষ্টবজ্রের সমাবেশ গিরিশচন্দ্রকে করিতে হয় নাই—নিয়তিই তাহা করিয়াছিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাহাকে যে বাণীরূপ দিয়াছেন—তাহা অপূর্ব।

কেবল বাহিরের উপকরণে বাস্তব জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের ট্র্যাজেডি সংঘটনের জন্য প্রয়োজন হয় অন্তরেরও উপকরণ। সেই উপকরণের কথাটি এখানে বলি। সিরাজের চরিত্রের মধ্যেই ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত ছিল, নাট্যকার তাহা দেখাইয়াছেন।

সিরাজ অপরিণতবয়স্ক, অপরিণতবুদ্ধি—সুমন্ত্রণা দিবার কোন লোক তাঁহার ছিল না। চারিদিকে শত্রু—চারিদিকে চক্রান্ত। তাহার মধ্যে সিরাজ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেন। অপাত্রে ক্ষমা তাঁহার অক্ষমতারই নামান্তর। সর্বদাই দ্বিধায় দোলাচলচিত্ত হইয়া হ্যামলেটের মত "To be or not to be that is the question' এইরূপ চিন্তা করিতেন। একটা ক্ষিপ্র সিদ্ধান্ত স্থির করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া পুরুষকারের প্রয়োগ তিনি করিতে পারেন নাই, নিয়তির বিধান-স্রোতে তিনি ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছিলেন। আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব ও নিরন্তর অসহায়তার ভাব তাঁহার চিত্তকে দুর্বল করিয়া তুলিয়াছিল। সিরাজের চরিত্রের আসল দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে ফরাসী মুসালার প্রতি করিম চাচার উক্তিতে "তোমাদের ইতিহাসে শুনি সিজার ঝড়-তুফানে রুবিকান পার হয়েছিল, বীর সেকন্দার শাহ্ শত্রুর মাঝখানে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়তো, হানিবল না কে ছিল শুনতে পাই

হিমালয় পর্বতের ন্যায় আল্পস্ পর্বত পেরিয়ে শত্রু জয় করেছিল, আর চোখের উপর দেখলেম ক্লাইব ছ'শো সৈন্য নিয়ে এক লাখ নবাবী সৈন্যকে ভেকো করে ছেড়ে দিল, এর কোন কাজটা বিবেচনার কাজ? অত বিবেচনা না ক'রে হুকুম ঝাড়লে আর এক রকম হ'য়ে যেত।''

করিম চাচাব মুখে সিজার-হানিবলের কথা অসঙ্গত হইলেও এই উক্তিতে নবাবের মানসিক দৃঢ়তার অভাব ও দ্বিধাগ্রস্ত মনোবৃত্তির কথাই ব্যক্ত হইয়াছে।

রায় দুর্লভের প্রতি করিমের উক্তিতেও সিরাজের দুর্বলতা ব্যক্ত হইয়াছে :—

"নবাব বুড়ো মাতামহের কথা মনে ক'রে আর বুড়ী বেগমের অনুরোধে বার বার মাফ করেছে। এবারও মাফ করবে। তোমরা যত গাঁঠ পাকাচ্ছ, নবাব তত গাঁঠ পাকালে অমন জোড়া জোড়া বুলি ঝাড়ত না। আঁধার রেতে তোপের মুখেই কথা কইত। নবাব রাগলেই ত গর্দান নিতে চায়, ক'টা গর্দান নিয়েছে বলত? যদি গর্দান নিতো কন্ধকাটা হ'য়ে পরামর্শ আঁটতে হ'ত। কালকের ছোঁড়া, মাতামহের আদরে আদরেই বেড়িয়েছে। তোমাদের প্রবীণ ছক্কাবাজির মধ্যে কোন দিন সেঁধোয়নি। রাগে দু কথা ব'লে আবার বাড়ী বাড়ী গিয়ে পায়ে ধ'রে সাধে—এই দু নৌকায় পা দিয়েই ছোঁড়া মজতে চলেছে। যদি তেরিয়া হয়েই চলত, যাহোক চোটপাট একদিক দিয়ে একরকম হ'য়ে যেত। আর যদি নরমের উপর দিয়ে চলত, কেউ না কেউ যত্ন করত। এ ছোঁড়া পায়ে ধরলেও পাজী, আর কড়া হলেত পাজীর পাজী।''

করিম চাচা মুক্ত পুরুষ হইলেও নবাব সম্বন্ধে তাহার পক্ষে এভাবে বাক্য প্রয়োগ একটু অস্বাভাবিক। তাহা হইলেও নবাবের চরিত্রের আসল দুর্বলতা এই কথাগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে।

এই উক্তিতে দেখা যায়—সিরাজচরিত্রের দুর্বলতা অপাত্রে ক্ষমায়, অতিরিক্ত সরলতায়, সাংসারিক অনভিজ্ঞতায় ও চিত্তের অপ্রকৃতিস্থতায়। সিরাজ সহসা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া মান্য ব্যক্তিকেও অপমানিত করে, আবার রাগ পড়িয়া গেলে নিজের নিঃসহায়তার কথা স্মরণ অতি দীনভাবে অপমানিতের তুষ্টি সাধন করে। ইহাতে তাহার ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তার অভাবই সূচিত হয়।

মীরমদন রায়দুর্লভকে বলিয়াছিলেন—"নবাব বিপজ্জালে পতিত হ'য়ে যৌবনসুলভ চপলতায় সর্বদা মতি স্থির রাখতে পারেন না।''

আকবর ১৪ বৎসর বয়সে রাজ্যলাভ করেন বৈরাম খাঁর বীরত্বে। তখন তাঁহার চারিদিকে শত্রু। সেই বয়সে আকবর চিত্তের যে প্রকৃতিস্থতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, সিরাজের যদি তাহার দশমাংশও থাকিত—তাহা হইলে ট্র্যাজেডি ঘটিত না।

সিরাজ ইংরাজবিদ্বেষী ছিলেন—ইংরাজকে প্রথম প্রথম তিনি ভয়ও করিতেন না। ক্রমে ইংরাজের শৌর্যবীর্য্য, সংহতি ও জাতীয়তার পরিচয় পাইয়া তিনি ইংরাজদের ভয়ে বড়ই ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সিরাজ মীরমদনকে বলিতেছেন :

"মীরমদন, মীরমদন, আমি ভীরু নই। দুর্গম রণসন্ধিতে আমাকে নির্ভয়ে প্রবেশ

করতে দেখেছ। কিন্তু ফিরিঙ্গির নামে আমার দেহ কম্পিত হয়। সহস্র সহস্র তোপধ্বনির মধ্যে যদি একটি ইংরাজের তোপের শব্দ হয়, আমি তা বুঝতে পারি—সে শব্দে আমার আপাদমস্তক কম্পিত হয়। দৈত্য-দানব, প্রেত, ভূত সকলে আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'লে আমি অসি হস্তে তাদের আক্রমণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু ইংরাজের কোন্ শয়তানবংশে জন্ম কে জানে! এরা কি যাদুকর?"

করিম চাচা বারবারই বলিয়াছে—'কোরাণ স্পর্শ করিয়া নবাব মদ ছাড়িয়া ভাল করে নাই, মদ খাওয়া অভ্যাস থাকিলে তাহার এ দুর্দশা হইত না'। এ কথার ব্যঙ্গার্থ এই—মদে উত্তেজনা আনে, সুপ্ত-পৌরুষকে জাগাইয়া তোলে, দ্বিধাভাব দূর করিয়া দেয়, অবসন্ন দেহমনকে চাঙ্গা করিয়াই তোলে। সিরাজ যদি মাঝে মাঝে মদ খাইতে পারিতেন, তাহা হইলে সঙ্কটকালে হতবুদ্ধি হইয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন না। ইহাতেও সিরাজচরিত্রের দুর্বলতাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

সিরাজ কলিকাতার নৈশ যুদ্ধে জিতিয়াও ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ইহা বিচক্ষণতার লক্ষণ—না—দুর্বলতার লক্ষণ? ইহাকে বিচক্ষণতাই বলা যাইতে পারিত—যদি সিরাজের অমাত্যেরা বিশ্বাসঘাতক না হইত। কিন্তু তাহা যখন নয়, তখন ইহাতেও সিরাজের দুর্বলতাই প্রকাশিত হইয়াছে।

সিরাজের প্রকৃতিগত এই দুর্বলতাই সিরাজের পতনের অন্তরঙ্গীয় কারণ। গিবিশচন্দ্র সিরাজের চরিত্রে মাঝে মাঝে বিচক্ষণতারও আরোপ করিয়াছেন। সিরাজ বলিতেছেন:

জন্মভূমির আশা বিলুপ্ত। যদি কখনো সুদিন হয়, যদি কখনো জন্মভূমির অনুরাগে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম-বিদ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে পরস্পরের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হয়। উচ্চ স্বার্থে চালিত হ'য়ে সাধারণের মঙ্গল যদি আপন মঙ্গলের সঙ্গে বিজড়িত জ্ঞান করে, যদি ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, নীচ প্রবৃত্তি দলিত ক'রে স্বদেশবাসীর অপমানে আপনার অপমান জ্ঞান করে। যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় খড়্গহস্ত হয়, এই দুর্দম ফিরিঙ্গি দমন তবেই সম্ভব, নচেৎ অভাগিনী বঙ্গমাতার পরাধীনতা অনিবার্য।

সেকালে ফিরিঙ্গিদমনের কথা সিরাজ ছাড়া অন্য কেহই ভাবে নাই, ইহা সেকালের কথা নয়, ইহা একালেরই কথা, সিরাজের মুখে বসানো।

গিরিশচন্দ্র সিরাজচরিত্রে একটা মাধুর্যের দিকও উন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। সিরাজের মাতামহী, পত্নী ও কন্যার সম্পর্কেই এই মাধুর্য বিগলিত হইয়াছে। সিরাজচরিত্রের দুর্বলতার সঙ্গে এই মাধুর্যেরও সংযোগ আছে।

ষড়্‌যন্ত্রীদের চরিত্র নাটকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। তাহাদের সকলের সম্মিলিত চরিত্র অখণ্ড-ভাবেই রূপলাভ করিয়াছে। কেবল উমিচাঁদের চরিত্রটি ইহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। উমিচাঁদ টাকার জন্য করিতে পারে না, এমন দুষ্কর্ম নাই। টাকার শোকে তাহার হাহাকার ষড়্‌যন্ত্রীদের জয়জয়কারকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে।

লুৎফউন্নিসার চরিত্রটি ইতিহাস-সম্মত—গিরিশচন্দ্র ইহাতে রঙের উপর রসান দিয়াছেন।

বাঙ্গালী পতিব্রতা প্রেমময়ী কুলবধূর সকল মাধুর্য, সৌকুমার্য ও সহৃদয়তা দিয়া গড়া এই চরিত্রটি। এ যেন মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যানের ছায়া—এ যেন মহাশ্মশানের মধ্যে নর-করোটিতে সঞ্জাত একটি ফুল।

লুৎফউন্নিসার নারীধর্মের মহাসঙ্কটকালে ওয়াটস্-পত্নীর আবির্ভাব নাট্যকলাকৌশলের একটি চমৎকার নিদর্শন। ইহা গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব কল্পনার অপূর্ব সৃষ্টি। এক সময় ওয়াটস্-পত্নীর অনুরোধে লুৎফউন্নিসা ওয়াটসকে কারাগার হইতে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। লুৎফউন্নিসার ইহাই একমাত্র বেগমগিরির নিদর্শন। লুৎফউন্নিসার চরিত্রের কমনীয়তা ও সিরাজচরিত্রের সৌকুমার্য ইহাতে যেমন একদিকে অভিব্যক্ত হইয়াছে—অন্য দিকে তেমনি ইহা ওয়াটস্-পত্নীর চরিত্রে কৃতজ্ঞতার ভাবটি নারীত্বের মহিমায় সুপরিণতি লাভ করিয়াছে। এই দুইয়ের সুসংগত মিলন নাটকের সৌন্দর্য বাড়াইয়াছে।

দানশা ফকিরও ঐতিহাসিক চরিত্র। এই দানশা এক সময়ে সিরাজের দ্বারা কোন অপকার্যের জন্য দণ্ডিত হয়। প্রতিশোধের জন্য দানশা সিরাজকে মীরকাসিমের হাতে ধরাইয়া দেয়। ইহা ইতিহাসেরই কথা। গিরিশচন্দ্র এই দানশাকে অন্যভাবেও কাজে লাগাইয়াছেন। সিরাজের চরিত্রকে মসী-কলঙ্কিত করিয়া দেখাইবার জন্য বহু নিষ্ঠুরতার গল্প রচিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র এই গল্পগুলিকে দানশার মারফতে ব্যক্ত করিয়াছেন।

ঘসেটি বেগমের চরিত্রও ইতিহাস-সম্মত। ঘসেটি বেগম অন্তঃপুরিকা, তিনি অন্যভাবে সিরাজের পতনে সহায়তা করিতে পারেন নাই—তাঁহার ধনভাণ্ডার চক্রীদের কাজে লাগিয়াছিল—একথাও অনেকটা ইতিহাস-সম্মত।

নাটকের প্রথম অঙ্কেই সমগ্র নাটকের উপজীব্যের একটা পূর্বাভাস দেওয়ার পদ্ধতি আছে। গিরিশচন্দ্র ঘসেটি বেগমের অভিশাপের মধ্য দিয়া সে পূর্বাভাস দান করিয়াছেন। ঘসেটি সিরাজকে বলিতেছেন—

পতিহীনা অসহায়া রমণীকে বাসচ্যুত করা তোমার প্রথম নবাবির পরিচয়। কুলনারীর সম্পত্তি অপহরণ তোমার প্রথম রাজকার্য। তোমার প্রথম কার্যের প্রতিফলে কুল-নারীর অশ্রু বারিধারার ন্যায় এই বাঙ্গালায় পতিত হবে, অট্টালিকা দগ্ধ হবে, রাজ্য ভস্মীভূত হবে, হাহাকার ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হবে। তোমার নিজের কুলনারী আবাসহীন হবে, পথে পথে ভ্রমণ করবে, ভিক্ষা অন্নের জন্য ব্যাকুল হবে, আকাশ ব্যতীত অপর আচ্ছাদন থাকবে না।

সিরাজউদ্দৌলা নাটকে দুইটি চরিত্র—ইতিহাস-সম্মত নয়। এই চরিত্র দুইটি গিরিশচন্দ্রের সৃষ্টি। একটি জোহরা ও আর একটি করিম চাচা। নাটকের মূল আখ্যান-ভাগের সহিত এই চরিত্র দুইটির অপরিহার্য সম্পর্ক নাই। নাটকের ক্রমবিকাশের জন্য বা তাহার বিয়োগান্ত পর্যবসানের জন্য জোহরার কোন প্রয়োজনই ছিল না। করিম চাচার জবানিতে সেকথা বলাও হইয়াছে :—

ভ্যালা মোর চাচী, খুব কারখানা দেখালে। তোমার অতটা না করলেও চল্‌ত। এই

রাজারাজড়া আমির ওমরাহ আর ঘসেটি বেগম হতেই কাজ রফা হ'ত। এত ক'রেও ইতিহাসে স্থান পেলে না চাচী, নাটকে আর গল্পের কেতাবে শোভা পাবে। বেইমানী কালিতেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভ'রে যাবে, তোমার আমার জায়গা হবে না।

জোহরা-চরিত্র নাটকের ক্রমবিকাশের জন্য নয়, নাটকের 'শোভা' বা অলঙ্করণের জন্যই রচিত। জোহরা হোসেন কুলিখাঁর পত্নী। সিরাজ হোসেনকে হত্যা করেন। জোহরা দেওয়ানা হইয়া সিরাজের রক্তে প্রতিহিংসা সাধন করিতে চায়। জোহরা সম্বন্ধে আমির বেগ বলিয়াছে—

"একি ভীষণ দেওয়ানা! হোসেনের প্রতি এর এত ভালবাসা! হোসেন ত ঘসেটি ও আমিনা বেগমকেই নিয়ে ছিল—এর প্রতি ত ফিরেও চাইত না।" ইতিহাসের দিক হইতে জোহরার এত বেশি পতিপ্রাণা, পতিবিয়োগে দেওয়ানা এবং সিরাজের রক্তপিপাসিনী হইবার কথা নয়। সামাজিক হিসাবে সে সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা, তাহার পক্ষে পথে-ঘাটে মজলিসে, রণক্ষেত্রে, ইংরাজ দুর্গে অবাধভাবে নিঃসঙ্কোচে পরিভ্রমণ করাও কথা নয়। ঐতিহাসিক ও সামাজিক দিকের কথা এই, কিন্তু সাহিত্যেরও একটা দিক আছে—সাহিত্যের দিক হইতে জোহরার প্রয়োজন ছিল। জোহরার আবিভাব-তিরোভাব নাটকে মুহুর্মুহুঃ চমকের সৃষ্টি করিয়াছে। প্লটের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে জোহরাকে যোগসূত্ররূপেও স্থান দেওয়া হইয়াছে। জোহরা নাটকের প্লটের উপর ভাসিয়া বেড়ায় নাই, তাহাকে প্লটের অঙ্গীভূত করিয়াই তোলা হইয়াছে। এ শ্রেণীর নাটকে উদ্দীপনার জন্য নারীশক্তিকে আমন্ত্রণ করা হয়। ইহা একটা conventionএর মত। জোহরাকে দিয়া নাট্যকার উদ্দীপনার কাজ করিয়াছেন। জোহরা চরিত্র অবাস্তব, রক্তমাংসে সে শরীরিণী নয়, একটা ভাববিগ্রহ মাত্র। এরূপ চরিত্রের দ্বারা নাটকের ঐতিহাসিক পরিবেশ ক্ষুণ্ণই হইয়াছে। তবু দৃশ্যকাব্যে এইরূপ চরিত্রের দ্বারা বাস্তবতা রোমাণ্টিক রূপ ধরে, নাট্যকলার শ্রীবৃদ্ধি হয়, বোধ হয় ইহাই চিন্তা করিয়া নাট্যকার এই চরিত্রটির সৃষ্টি করিয়াছেন। অবশ্য একথাও স্বীকার করিতে হয়—চরিত্রটিকে অযথা অনাবশ্যক প্রাধান্য দেওয়াও হইয়াছে। বাস্তবতার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াও চরিত্রটিকে কাজে লাগানো যাইত। জোহরাকে লইয়া একটা আতিশয্য-দোষ ঘটিয়া গিয়াছে।

যেখানেই প্লটের গ্রন্থি একটু শিথিল হইয়াছে গিরিশচন্দ্র এই চরিত্রের অবতারণায় সেখানেই গ্রন্থি বন্ধন করিয়াছেন। এজন্য নাট্যকার অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে জোহরাকে কলিকাতায় ইংরাজ দুর্গে ও পলাশীর রণপ্রান্তরে লইয়া গিয়াছেন। জোহরা সত্যই পাগলিনী হয় নাই, সে পাগলিনী সাজিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সে ই সব চেয়ে প্রকৃতিস্থ। তাহার প্রতিহিংসা-সাধনের পরিকল্পনা অত্যন্ত গূঢ়, সুচিন্তিত ও সুপরিন্যস্ত। সে নবাবী মোহরের ছাপ সংগ্রহ করিয়া জাল করিতেছে, ঘসেটি বেগমের গুপ্ত অর্থভাণ্ডার হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া চক্রীদের সাহায্য করিতেছে, প্রয়োজনমত উৎকোচ দান করিতেছে। সর্বোপরি তাহার মুখের উক্তি চিন্তাশীল বিচক্ষণ ব্যক্তির মত। ক্লাইবকে জোহরা বলিতেছে:

সাহেব, তুমি এতদিন বাঙ্গালায় আছ, আজও কি বাঙ্গালীর চরিত্র অবগত হও

নি ? তোমার কি মনে হয়, কারো হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ আছে ?:তোমার কি মনে হয় কারো হৃদয়ে জাতীয়তা আছে? তোমার কি মনে হয় মাতৃভূমির ভালোমন্দ কেউ চিন্তা করে ? না, যদি বাঙ্গালার হিন্দুমুসলমানের কিছুমাত্র হৃদয় থাক্‌ত, স্বদেশের উপর তাদের যদি কিছুমাত্র স্নেহ থাক্‌ত, যদি স্বদেশের উন্নতির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাক্‌ত, তাহ'লে কি পরস্পর পরস্পরের প্রতি দ্বেষাদ্বেষি করে ? তুমি কি এখনো বোঝনি যে যারা তোমার সহায় হয়েছে, তাদের সকলের এক স্বার্থ নয়, বিশ্বাসঘাতক ষড়্‌যন্ত্রকারীরা এক স্বার্থে চালিত নয়, তাকি বুঝতে পারনি ? তাদের রাজ্য করগত করা রাজ্যের মঙ্গলার্থে নয়, দুর্দান্ত নবাবকে দমন কর্‌বার জন্য নয়, প্রজার শান্তির জন্য নয়, স্বার্থের জন্য। সাহেব, তোমাদের স্বার্থ একরূপ। পরস্পর স্বার্থের জন্য বিবাদ কর, কিন্তু ইংরাজের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সকলে মিলেমিশে ভ্রাতৃভাবে অস্ত্র ধারণ কর। সে স্বার্থ বাঙ্গালার হিন্দুমুসলমানের নয়, অতি হীন স্বার্থ, সেই হীন স্বার্থের আবরণে সকলে অন্ধ হয়েছে, তোমার কৌশলে নয়। যদি নিজ নিজ স্বার্থে এরূপ অন্ধ না হ'তো তাহলে বুঝতো, যে দূরদেশ হ'তে ছমাস সমুদ্রে ভেসে নিজ স্বার্থ নিমিত্ত এসেছ, তাদের স্বার্থের জন্য নয়। যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে তাদের গদী দিতে এসো নাই, আপনাদের প্রভুত্বের জন্যই এসেছ। সকলেই বুদ্ধিমান্‌, কিন্তু স্বার্থ এরূপ বলবান যে তোমাদের স্বরূপ মনোভাব কেউ বুঝতে সক্ষম হয়নি।

জোহরা নিজের অভিসন্ধিকে স্বার্থপ্রণোদিত বলিতে চায় না। সে জানে তাহার পতিহত্যার প্রতিহিংসাসাধন তাহার কর্তব্য, তাহার ধর্ম, তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত। সে অবলা নারী, সে নিজে প্রতিহিংসা সাধন করিতে পারে না; সে দুর্গেশনন্দিনীর বিমলা নয়। বঙ্কিম ইতিহাস অনুসরণ করেন নাই, গিরিশচন্দ্রকে কাঁটায় কাঁটায় ইতিহাস অনুসরণ করিতে হইয়াছে। জোহরাকে বাধ্য হইয়া চক্রান্তকারীদের সহায়তা লইতে হইয়াছে। সে কেবল অভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য। কিন্তু সে এই চক্রান্তকারীদের আরো ঘৃণা করে। কারণ, তাহারা সিরাজের প্রাণহরণ করিতে চায় তুচ্ছ স্বার্থের জন্য, কোন' মহান্‌ অভিপ্রায় তাহাদের নাই। তাই রায় দুর্লভ যখন তাহাকে বলিতেছে—দরবারে এসো, নূতন নবাব তোমায় বিস্তর পুরস্কার দিবেন। জোহরা উত্তর দিল :

স'রে যাও, স'রে যাও, বিশ্বাসঘাতক প্রভুহন্তা, স'রে যাও। এ পবিত্র কবরভূমি কলুষিত ক'রো না—দূর হও। নারীর পতিই সর্বস্ব, পতি সার, পতি ধর্ম, পতি স্বর্গ, আমি সেই পতির তৃপ্তির জন্য দুর্নীতি-কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। আর তোমরা ? স্বার্থপর, তুচ্ছ পদ ও ক্ষণস্থায়ী অর্থের জন্য জন্মভূমি কলঙ্কিত করেছ, হিন্দুনাম কলঙ্কিত করেছ, মুসলমাননাম কলঙ্কিত করেছ। ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষণিক ঐশ্বর্য্যলালসায় আলিবর্দির অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে আলিবর্দির বংশধরের সর্বনাশ করেছ—তার পরিবারবর্গেকে পথের ভিখারিণী করেছ। জেনো ভগবান আমাকে মার্জনা কর্‌বেন, আমি পতিপরায়ণা। তোমাদের মার্জনা নাই, তোমরা বিশ্বাসঘাতক !

এখানে একটা কথা উঠে—হোসেন কুলি খাঁ গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল—তাহার জন্য তাহার প্রাণ গিয়াছে। হত্যাকারী অন্যে নয়—স্বয়ং নবাবপুত্র। এই হত্যায় আলিবর্দি

বেগমের—এমন কি ঘসেটি বেগমেরও সম্মতি ছিল। ইহা রাজকীয় দণ্ড। এইরূপে দণ্ডিত ব্যক্তির জন্য পত্নীর বা অন্য কোন প্রিয়জনের প্রতিহিংসা গ্রহণ স্বাভাবিক নয়। অপরাধীর দণ্ড হইলে প্রতিহিংসার কথা উঠে না। তলাইয়া দেখিলে অন্য কথাও মনে আসে। প্রকৃতপক্ষে হোসেন কুলি খাঁর অপরাধ গুরুতর নয়। হোসেন ঘসেটি বেগমের একজন অমাত্যমাত্র। প্রকৃত পক্ষে দূষিত কার্য্যে সে ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগমের অনুজ্ঞা পালন মাত্র করিয়াছে। তাহার হয়ত গত্যন্তর ছিল না। ঠিক এই ভাবেই জোহরা ভাবিয়াছে এবং নিজের স্বামীকে অপরাধী মনে করে নাই। নিরপরাধের দণ্ডই তাহাকে প্রতিহিংসায় উদ্দীপিত করিয়াছে। সিরাজও পরে এই ভাবেই ভাবিয়াছিলেন—তাই তিনি হোসেন কুলি খাঁর হত্যার জন্য বারবার অনুতাপ করিয়াছেন—ইহা ইতিহাস-সম্মত।

সংস্কৃত নাটকে বিদূষক থাকিত। সে নাটকে হাস্যরস যোগাইত, রাজসভার মনোরঞ্জন করিত, মন্ত্রীরও কাজ করিত। সাধারণতঃ এই বিদূষক হইত রাজার বয়স্য। গিরিশচন্দ্রের নাটকেও বিদূষক আছে—তবে সে বিদূষকের রূপ স্বতন্ত্র। বিশেষতঃ জনার বিদূষক, সিরাজউদ্দৌলার করিম চাচা—মহাপ্রাজ্ঞ মুক্তপুরুষ, বিদূষকের অভিনয় করিতেছে মাত্র। সেক্সপীয়ারের নাটকের 'ফুল' (fool) ও সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের সমবায়ে এই চরিত্রগুলির সৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব মৌলিকতাও আছে। করিম চাচা নাটকেরই মধ্যবর্তী দর্শক, সমালোচক ও ব্যাখ্যাতা। নাটকে তাহার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার কথা নয়। সে কেবল সিরাজের সঙ্গে বেশ বিনিময় করিয়া সামান্য একটু সক্রিয়তা দেখাইয়াছে। করিম সিরাজের শুভাকাঙ্ক্ষী, সে সিরাজকে ঠারেঠোরে রঙ্গব্যঙ্গের মধ্য দিয়া বার বার সতর্ক করিয়া দিতেছে—চক্রীদেরও অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়া তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের প্রয়াস করিয়াছে। ইহার বেশি তাহার করিবার কিছু নাই। সে দ্বন্দ্বাতীত মুক্ত পুরুষ, সে যেমন নিজের সুখদুঃখে উদাসীন—তেমনি অন্যের সুখদুঃখে, উত্থানপতনেও সে নির্বিকার —তাহার কাছে সবই মায়া কিংবা নিয়তির খেলা, প্রাক্তন কর্মের ফলপ্রসব মাত্র। মানুষের বিশেষ কিছু করিবার নাই। সে নির্বিকার মুক্তপুরুষ বলিয়া দারুণ দুর্যোগে, জীবন-মরণের সঙ্কটকালে, দারুণ শোকাবহ ব্যাপারেও তাহার রঙ্গরসিকতা স্তম্ভিত হয় না। সে অপক্ষপাত বিচারক ও সমালোচক। তাই তাহার চোখে সিরাজ দেবতাও নয়, দানবও নয়, নবাব হইলেও সে সাধারণ মানুষ মাত্র। তাহার দোষও আছে, গুণও আছে। সিরাজের আসল চরিত্রটি তাহার উক্তিতেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সিরাজ চরিত্রে দুর্বলতা কোথায় তাহা সে নানা উক্তির মধ্য দিয়া বুঝাইয়াছে। সে বলে,—নবাবি পাওয়ার আগে—সত্যই সে দুর্দান্ত দুঃশাসন আদুরে দুলাল ই ছিল, পরে তাহার চরিত্রের পরিবর্তন হইয়াছিল, যদিও প্রাক্তন দোষ একেবারে তাহাকে বর্জন করে নাই। দোষে গুণে জড়িত সিরাজ সহানুভূতি ও দয়ার পাত্র। সে যতটা দুর্জন, তদপেক্ষা দুর্বল বেশি। যাহারা তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়াছে, তাহাদের দুর্জনতার কিন্তু সীমা নাই।

গিরিশপ্রসঙ্গ আপাততঃ শেষ করিলাম। গিরিশচন্দ্র বহু নাটকই রচনা করিয়াছেন;

তিনি এত দ্রুত রচনা করিতেন যে, কোন নাটকের রচনাতেই অধিক সময় ও মনোযোগ দিতে পারিতেন না। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখানোই তাঁহার অজস্র নাটকরচনার উদ্দেশ্য ছিল। দীপান্বিতার রজনীর অবসানের পর মৃৎপ্রদীপগুলিকে গৃহস্থ যে চোখে দেখে, তিনি সেগুলিকে যেন সেই চোখেই দেখিতেন। যেগুলি তৈজস প্রদীপ সেগুলি বঙ্গসরস্বতীর মন্দিরে অবশ্যই সংরক্ষিত হইবে। তাঁহার সমস্ত নাটকগুলির সমালোচনা করিতে পারিলে তাঁহার প্রতিভার প্রতি হয়ত সুবিচার করা হইত। তাঁহার প্রতিভার অভিব্যক্তি কোন একখানিতে ঘনীভূত হইয়া নাই। উহা অজস্র রচনার মধ্যে বিকীর্ণ ও বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। তাঁহার রচনার সুবর্ণরেখার সৈকতে যিনি স্বর্ণকণাগুলি আহরণ করিতে পারিবেন তিনিও গিরিশচন্দ্রের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবেন। আমি তাঁহার চারিশ্রেণীর চারিখানি নাটক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলাম, ইহার বেশী পরিসর আমার গ্রন্থে নাই।

গিরিশচন্দ্র সুকবি ছিলেন। তাঁহার কয়েকটি কবিতাও সুরচিত। তাঁহার গানগুলির মধ্যেও কবিত্ব আছে। গিরিশচন্দ্রের প্রহসন সম্বন্ধে কিছু বলা হইল না। তাঁহার শিষ্যস্থানীয় অমৃতলালের প্রহসন-রচনার দীক্ষা তাঁহার কাছেই। অমৃতলালের প্রহসনরচনার কৃতিত্বের অনেকটুকু গৌরব গিরিশচন্দ্রের প্রাপ্য। অমৃতলালের প্রহসন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। গিরিশচন্দ্রের সম্বন্ধে বক্তব্য সংক্ষেপে ছন্দে বিবৃত করিয়া গিরিশপ্রসঙ্গের উপসংহার করিলাম।

সমাজের মধ্যস্তরে যাহারা পেয়েছে ঠাঁই বৃত্তি জাতিকুলে,
সুপ্রসন্ন ন'ন বাণী, কমলা তাদের পানে চান নাক ভুলে।
শত শত গূঢ় ব্যথা তাদের জীবনখানি করেছে বিক্ষত,
সমাজের উপেক্ষায় শাস্ত্রের শস্ত্রের ঘায় তাহারা বিব্রত।
সকল লাঞ্ছনা গ্লানি লোকভয়ে মুখ বুজে লুকাইয়া রাখে,
ঢাকবার সজ্জা নাই যত ক্ষত যত ক্ষতি লজ্জা দিয়ে ঢাকে।
কে চায় তাদের পানে ? কারো প্রাণ কাঁদেনিক তাহাদের দুখে,
মাপিয়া দেখেনি কেহ কত যে গভীর ব্যথা তাহাদের বুকে।
তাহাদেরি অগ্রগণ্য হে গিরিশ,পুণ্যশ্লোক, তোমার হৃদয়,
কাঁদিল তাদের তরে, আজ তারা মুক্তস্বরে গাহে তব জয়।
যারা ব্যথা পুষে বুকে তাহাদের মূক মুখে সমর্পিলে ভাষা।
যারা দীন আশাহীন তাহাদের প্রাণে পুন দিলে তুমি আশা।
তাতাইলে মাতাইলে রসাইলে তুমি দিলে আশ্বাস সান্ত্বনা।
সমাজের দুষ্টিগ্লানি, মোচন করিতে দিলে কল্যাণ-প্রেরণা।
অলস বিনোদ দানে ভুলায়ে রাখনি শুধু, লোকগুরু তুমি,
তব রঙ্গমঞ্চমঠে অর্চ্চনা লভেছে পটে মাতা বঙ্গভূমি।
দিলে পরমার্থ ধন মহান্ আদর্শ ধারা ধর্ম্মনীতিপথে,
আনন্দের সাথে সাথে যা দিয়েছ নাই তার তুলনা জগতে।

পতিতপাবন প্রভু পরমহংসের বাণী লভেছে কোথায়
সব চেয়ে পূর্ণরূপে সার্থকতা, কেহ যদি আমাকে শুধায়,—
হে গিরিশ রসরাজ, করিব তোমার নাম অকুণ্ঠিত চিতে,
আপনি তরিয়া তুমি কে না জানে, চিরদিন তরেছ পতিতে ?
পশ্চিমের প্রচারিত লোকায়ত জড়বাদ শাসিছে ভুবন,
লালসার পঙ্ককূপে লুটায় শূকররূপে এ পৌর জীবন।
অলস বিলাসভোগে সর্বগ্রাসী ভবরোগে সবে মুহ্যমান
তার মাঝে কে শুনিবে আত্মার কল্যাণবাণী, প্রভুর আহ্বান ?
হে কৌশলী কলকণ্ঠ একথা বুঝিতে তুমি, রসালশাখায়
বিলাসের কুঞ্জবনে ব্রতেরে গোপন করি বাঁধিলে কুলায়।
লীলায় খেলায় রঙ্গে নৃত্যগীতি নানা ঢঙ্গে ভুলাইয়া ধীরে,
আনিলে হে নটরাজ, সবারে মন্দিরতলে সুরধুনীতীরে।
নিভৃতে গোপনে দেশে রঙ্গরসে ছদ্মবেশে দিয়াছ যে ধন
তার পরিমাণ কেহ জেনেছে কি ? জানে শুধু জাতীয় জীবন।
মঠে মঠে বিঘোষিত ইতিহাসে প্রকাশিত অনেকেরই কথা,
জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে শুধু তব বাণী লভে সার্থকতা।
যখন তোমার এই অধ্যাত্মদানের কথা ভক্তচিত্তে ভাবি
ভুলে যাই মহাপ্রাণ কতখানি আছে তব সুসাহিত্যে দাবি।
ভুলে যাই কত বড় তুমি কবি নাট্যকার সে সব বিচার,
প্রণত হইয়া পড়ে আমার উদ্ধত শির উদ্দেশে তোমার।

অমৃতলাল

অমৃতলাল ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী অর্থাৎ বাঙ্গালীজাতির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য, তাহার স্বধর্ম, তাহার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার পক্ষপাতী। তাঁহার চোখে বাঙ্গালীর যে সকল আচরণ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বিরোধী, জাতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী, বিসদৃশ বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হইত, তিনি সেইগুলিকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করিতেন। এই ব্যঙ্গের বাচিক রঙ্গই তাঁহার প্রহসনগুলির প্রধান অঙ্গ। সধবার একাদশীর মত সম্প্রদায়বিশেষ, আনন্দবিদায়ের মত ব্যক্তিবিশেষ তাঁহার ব্যঙ্গবাণের লক্ষ্য নয়। অসঙ্গত বা বিসদৃশ কতকগুলি আচরণের সমবায়ে তিনি এক একটি চরিত্রের কল্পনা করিতেন—এই চরিত্র একটা বাস্তব চরিত্র নয়, একটা ভাববিগ্রহ মাত্র। পরিহাস্য ও উপহাস্য করিয়া তুলিবার জন্য তিনি অসঙ্গতিগুলিতে একটু বেশি Emphasis দিতেন। ইহাতে ব্যঙ্গ অপেক্ষা রঙ্গেরই প্রাধান্য হইত বলিয়াই তাঁহার প্রহসনগুলি আজিও উপভোগ্য।

রঙ্গরসের বাক্যগুলি যেন লেখকের রসভাণ্ডারে আগে হইতেই সংগৃহীত থাকিত। লেখক সেইগুলিকে কল্পিত চরিত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পাত্রপাত্রীর মুখে বসাইতেন। স্বভাবতঃ রঙ্গরসিকের মুখে কৌতুকময় বাক্য খুব ঘন ঘন আসে না। লেখক নাট্যোক্তির অল্প পরিসরের মধ্যে সেইরূপ বাক্যাবলী বেশ ঘন করিয়া সাজাইয়া দিতেন—তাহার ফলে হাস্যের উদ্দীপনা শিথিল হইতে পাইত না।

অমৃতলালের প্রহসনগুলি অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য নয়। সাধারণতঃ বিজাতীয় ভাবাপন্ন উচ্চইংরাজিশিক্ষিত ইঙ্গবঙ্গসমাজ (যাহাদের মাতৃভূমি বঙ্গদেশে ধাত্রীভূমি লণ্ডনে) ও নানা শ্রেণীর রাজনীতিক সম্প্রদায়ের বিসদৃশ চিত্রই তিনি অঙ্কন করিয়াছেন। ঐ সমাজ ও সম্প্রদায়ের চালচলন গতিপ্রকৃতির সহিত যাঁহারা পরিচিত নহেন এবং ইংরাজি ভাষার সঙ্গে যাঁহাদের বিশেষরূপ পরিচয় নাই, এ প্রহসনগুলি তাঁহাদের উপভোগ্য হয় না। বিজাতীয় ভাবাপন্ন সমাজদ্রোহী ও ভণ্ড রাজনীতিক নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযানটা তাঁহাদের তৃপ্তি দিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের উপভোগ স্বতন্ত্র জিনিস। অমৃতলাল প্রহসনগুলির বাগ্‌বিন্যাসের কুহরে কুহরে যে বাচিক রসের সঞ্চার করিয়াছেন, তাহা উচ্চশিক্ষিত লোকদেরই উপভোগ্য। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের সম্পর্কে নাট্যকার যে সকল অল্পশিক্ষিত লোকদের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাদের মুখে ইংরাজি শব্দের বিকৃত রূপ ও বিকৃত উচ্চারণ, ইংরাজি ভাষার ব্যাকরণ ও ইতিহাসের ভুল বসাইয়া যে হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশেষতঃ ইং Malapropism এর নিদর্শনগুলির মধ্যে যে কৌতুকরস আছে—তাহা উচ্চইংরাজিশিক্ষিত লোকেরাই উপভোগ করে—সামান্য ইংরাজি জানিলে সে রস উপভোগ্য হইবে না। ইংরাজি সাহিত্য হইতেও অনেকস্থলে উৎকলন আছে। উৎকলনের ভুলভ্রান্তিগুলিও কৌতুকাবহ। অনেকস্থলে ইংরাজী কথার আক্ষরিক তর্জ্জমার দ্বারাও কৌতুকসৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায়।

অমৃতলালের ঐ শ্রেণীর চরিত্রগুলি—Mininster কে monster, Infamous কে Infectious, Bleeding কে Building, misappropriation কে misapprobation, uprightnessকে uprightment, straightforwardness কে straight forwardity, Imperative dutyকে Interrogative duty বলে। তাহারা Frailty, thy name is woman, Shakeshpeare এর এই লাইনকে Woman, Fraternity is thy name, Pay him in his own coin স্থলে Pay him in his own queen বলে। মুচিরামের মুখের কলিকাতাবর্ণনা—And have you condistanted to confirm the inestimatable grass of hononrable honour of this city of palaces and policies? This sanititarium of stables and statues? Of this town of taxes and taxicabs? Of rates and rats, of riches and ditches and rupees and রূপসীজ্—এই সমস্তের মধ্যে যে wit, humour আছে তাহা সুশিক্ষিত ইংরাজিনবীশদেরই উপভোগ্য।

শব্দের ঘনঘটার সৃষ্টি করিয়া অল্পশিক্ষিত লোকদের চমক লাগাইবার চেষ্টাকে অমৃতলাল ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ঐরূপ অর্থশূন্য নিঃসার শব্দাডম্বরের বহু উদাহরণ আছে। যেমন—

Most serious serpentine problem of poetical paradox. The Corinthian catacombs of concoursive conclusion. The future fate of feberile India hangs on the hair of Dococles.

সেকালের অনেকের ইংরাজি লেকচার ছিল শরদভ্রের মত অন্তঃসারশূন্য। কতকগুলি নিরর্থক শব্দাডম্বরের সমবায়মাত্র। মুখস্থ করা শব্দের ঘনঘটায় বক্তা অল্পশিক্ষিত লোকদের তাক লাগাইয়া দিতে চাহিত। অমৃতলাল তাহাদের ইংরাজি ভাষাকেও মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

যেমন 'বাবু নাটকে' ষষ্ঠী লেকচার অভ্যাস করিতেছে—If I live—if I am permitted to breathe the air of this terrestrial globe—if the steam that animates this corporal machanism is not exhausted, if the scarlet fluid called blood flows in any veins, if pulsation remains regular in my radial artery—then I promise you—I give you my most solemn assurance—Ladies and gentlemen, with all the emphasis and command that I wield, I will shake the Empire to its very foundation.

অনেক নকল সাহেবের দল বাংলা ভাল জানি না বলিয়া গৌরব করিতেন…তাঁহারা ইংরাজি বাক্যের আক্ষরিক তর্জ্জমা করিয়া বহু কষ্টে বাংলায় ভাবপ্রকাশ করিতেছেন, এইরূপ ভাব দেখাইতেন। কোন কোন চরিত্রের মুখে এইরূপ ভাষার প্রয়োগ আছে। ইহা খুবই কৌতুকোদ্দীপক। ইংরাজী নামকরণের মধ্যেও রসিকতা আছে—Swindle Smuggle and Co., Humbug Brothers ইত্যাদি।

ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অনেক হাস্যোদ্দীপক শব্দরচনার দৃষ্টান্ত এবং বাংলায় Malapropism এর দৃষ্টান্তও অনেক পাওয়া যায়;—বিদুষীর পুংলিঙ্গে বিদুষক, স্বর্গীয়ের স্থলে স্বর্গীয়ান, অনুপ্রাসের স্থলে হনুপ্রয়াস, উচ্চারণের স্থলে পুরশ্চরণ, জবাইএর স্থলে জবাধ্যায় ইত্যাদি।

অল্পশিক্ষিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের ব্যঙ্গপ্রসঙ্গে অমৃতলাল সংস্কৃত শ্লোকের ভ্রান্ত উৎকলন, একাধিক শ্লোক মিলাইয়া অর্থহীন শ্লোক রচনা, সংস্কৃতের ভ্রান্ত উচ্চারণ, সংস্কৃত শ্লোকাংশের ভুল ব্যাখ্যা (যেমন—স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী ও স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাপি—এই ছত্রের মিলনে হইল—স্ত্রীবুদ্ধি দুষ্কুলাদপি—এবং তাহার অর্থ হইল স্ত্রীলোকের বুদ্ধিতে দুকূল যায়), গ্রন্থের নামকরণে ভ্রান্তি, অকারণে সংস্কৃত বুলিঝাড়া ইত্যাদির দ্বারা রসিকতার সৃষ্টি করিয়াছেন। বাংলা চলতি কথাকে সংস্কৃতরূপ দিয়াও নাট্যকার কৌতুকের সৃষ্টি করিয়াছেন—যেমন—পটোল তোলা, শিঙা ফোঁকা স্থলে পটোল উৎপাটনম্, শৃঙ্গনিনাদনম্। ভৃত্যের উদ্দেশে হলাহলানন্দ স্বামীর সংস্কৃতে বিদ্যাবত্তা প্রকাশের মধ্যেও যথেষ্ট কৌতুক আছে।

সূক্ষ্ম ধরণের রসিকতাও এমন অনেকস্থলে আছে, যাহা ইংরাজি শিক্ষার অপেক্ষা করে না বটে, কিন্তু স্বদেশীয় কালচারের অপেক্ষা করে। খাসদখলে একস্থলে কঠোপনিষদ্‌কে Dramatise করার কথা আছে। বিদুষীর পুংলিঙ্গ বিদূষক, স্বর্গীয়ের বদলে স্বর্গীয়ানের মত ব্যাকরণের নিয়মলঙ্ঘন করিয়া নূতন নূতন শব্দ রচনার কথা আছে।

মোক্ষদা গিরিবালাকে আলিঙ্গন করিতেছে। কবি মোহিত বলিতেছে—'এ যেন কমলে কুমুদে আলিঙ্গন। একদেহে আমি রবিচন্দ্র নই কেন?' এই ধরণের রসিকতা রবীন্দ্রনাথের চিরকুমারসভার রসিকতার মত। এই ধরণের রসিকতা অমৃতলালের রচনায় বহু স্থলেই আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদের প্রহসনের তুলনায় এইগুলি যথেষ্ট মার্জ্জিত ধরণের এবং সাহিত্যাংশে উৎকৃষ্টতর। এইগুলি ছাড়া অমৃতলাল যে সকল স্থলে অন্যোপায়ে কৌতুকরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনেরই উপভোগ্য।

যেমন—কথার মুদ্রাদোষকে অবলম্বন করিয়া রসিকতা,—খাসদখলের নিতাইএর 'Is the' ব্যবহার, যদিও এই Is the ব্যবহার অবশ্য একটু বেশী ঘন ঘন হইয়া গিয়াছে। দাসদাসীদের মুখে গ্রাম্য ভাষা, নিম্নশ্রেণীর লোকদের অস্বাভাবিকরূপ শুদ্ধ ভাষায় কথা বলিবার চেষ্টা, তোৎলার মুখের কথা, হাবা ও খোনার মুখের কথা, বাঙ্গালীর মুখে অশুদ্ধ ইংরাজির মত অশুদ্ধ হিন্দী বুলি, হিন্দুস্থানীর মুখে অশুদ্ধ বাংলা বুলি, বহুকাল পশ্চিমপ্রবাসী বাঙ্গালীর মুখের অদ্ভুত বাংলা, মুসলমানের মুখে ফারসীআরবি শব্দে বোঝাই ভাষা, সবচেয়ে যে চরিত্র প্রকৃতিস্থ, সে চরিত্রের মুখে তীব্র শ্লেষবাক্য ইত্যাদির দ্বারা যে কৌতুকের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সর্ব্বজনের অধিগম্য।

অমৃতলালের প্রহসনে কতকগুলি চরিত্রই থাকে মূলতঃ কমিক। তাহাদের আচরণই হাস্যোদ্দীপক। কতকগুলি চরিত্রের বাচনভঙ্গীই কৌতুকাবহ। এই চরিত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি কৌতুকরস সম্বন্ধে সচেতন, কতকগুলি সচেতন নয়। যাহারা সচেতন তাহারা

পরিহাসরসিকতার জন্যই কৌতুকাবহ কথা বলে। যে সকল টুকরা টুকরা রসিকতা লেখকের বহু দিন হইতে সংগৃহীত ছিল, সেইগুলি তাহাদের ভাষণে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যে সকল চরিত্র কৌতুকসৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন নয়—তাহারা হাসাইবে বলিয়া কথা কয় না। ব্যঙ্গরসিকতা সৃষ্টি তাহাদের উদ্দেশ্য নয়, তাহাদের বাচনভঙ্গী স্বভাবতই এমন যে, তাহা শ্রোতার হাস্য উদ্রেক করে। পল্লীগ্রাম হইতে আগত দাসদাসীর কথা, পূর্ব্ববঙ্গের লোকের কথা, উড়িয়া পাচক ও চাকর, তোৎলা, খোনা ইত্যাদির মুখের কথা এই শ্রেণীতে পড়ে।

অমৃতলালের প্রহসনের গানগুলি স্বরচিত এবং ব্যঙ্গরসে ভরা। এই গানগুলিতে দ্বিজেন্দ্রলালের মত তিনি অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত মিলের আমদানি করিয়াও হাস্যরসের উদ্দীপন করিয়াছেন। দুইজনের বাক্যবিনিময়ের মধ্যে মিল দিয়া কথা বলাও উচ্চশ্রেণীর না হইলেও প্রহসনগুলির একপ্রকার রসিকতা। যেমন—

প্রকাশ—১৩৩এর C D. F, ব্যাঙ্ক বইয়ে বোঝাই ব্যারিষ্টারের সেফ।

সারদা—সারারাত তোমার মেসোর মতন পোষমা'তে পাশা খেলে মুড়ি দিয়ে লেপ।

অমৃতলালের ব্যঙ্গরসিকতার বিষয়বস্তু যাহা কিছু অসঙ্গত, বিসদৃশ, অপ্রকৃতিস্থ, যাহা কিছু ন্যাকামি, ভণ্ডামি এবং বানরবৎ পরের অন্ধ অনুসরণ। অসঙ্গত বলিতে বুঝিতে হইবে—নাট্যকারের মত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, স্বজাতিভক্ত, জাতীয়স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পক্ষপাতী, খাঁটি বাঙ্গালী হিন্দুগৃহস্থের চোখে যাহা অসঙ্গত ঠেকিয়াছে তাহাই। অমৃতলালের ব্যঙ্গের পাত্র—অতিরিক্ত স্ত্রৈণ স্বামী, স্বার্থান্বেষী দেশনেতা, তথাকথিত সমাজসংস্কারের দল, ভণ্ড ব্রাহ্মভাবাপন্ন ব্যক্তি, অর্থলোভী অল্পবিদ্য শঠ চিকিৎসক, সাহেবিয়ানার ভক্ত উচ্চশিক্ষিত নাগরিক (বঙ্কিমের ভাষায় কৃতবিদ্য কুলাঙ্গার), সদাচারভ্রষ্টা বিলাসিনী ইংরাজিশিক্ষিতা মহিলা, স্বপ্নবিলাসী অক্ষম কবি সাহিত্যিক, ব্যসনাসক্ত সমাজদ্রোহী যুবক, লম্বশাটপটাবৃত মূর্খ, ভোটভিখারীর দল ইত্যাদি।

অমৃতলালের প্রহসনগুলিতে সমাজসংস্কারের প্রয়াস কোথাও সুপ্রকট হয় নাই। সামাজিক অসঙ্গতি, ভণ্ডামি, ইতরতা লইয়া ব্যঙ্গব্যঙ্গের সৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা নির্ম্মল আমোদ পরিবেষণ ছাড়া প্রহসনগুলির অন্য উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

লেখক পরোক্ষভাবে বলিতে চাহিয়াছেন—ইংরাজিশিক্ষায় দোষ নাই, কিন্তু ইংরাজের পদলেহন করিও না, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিও না। নারীগণকে শিক্ষিতা কর, কিন্তু নারীকে হিন্দুনারীর আদর্শ হইতে ভ্রষ্টা হইতে দিও না, দেশ উদ্ধার করিতে পার,—কর, আগে নিজের গ্রামকে অন্ততঃ নিজের পরিবারকে বাঁচাও। পতিতের উদ্ধার করিবে কর, কিন্তু উন্নতকে অযথা নামাইও না। সমাজসংস্কারের নামে যাহা প্রচার করিতেছ—নিজে তদনুসারে আগে চল, ভণ্ডামি করিও না। দেশের বিধবা ভগিনীদের জন্য 'ভগিনীপতির' অন্বেষণ করিবে কর, কিন্তু নিজের কুমারী ভগিনীর বিবাহের চেষ্টা কর আগে এবং পতি থাকিতে যে সধবা ভগিনী বিধবার মত কালযাপন

করিতেছে: তাহার উপায় কর। খদ্দর পরিবে পর, কিন্তু খদ্দরের মান রাখিও। ডাক্তার হইয়া ফী বাড়াইবে বাড়াও, কিন্তু রোগীকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা কর। ঠাকুরদেবতাকে না মান না-ই মানিবে, তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি নাই, কিন্তু স্ত্রী, উপস্ত্রী, গাড়ী, বাড়ী, ব্যাঙ্ক ও সাহেবদের ঠাকুর-দেবতা বানাইয়া পূজা করিও না।

অমৃতলাল কেবল ইংরাজি শিক্ষায় বিকৃতবুদ্ধি লোকদেরই ব্যঙ্গ করেন নাই—সম্পূর্ণ স্বদেশীয় ভাবের লোকদের অসঙ্গত আচরণকেও অব্যাহতি দেন নাই। খাসদখলে পূর্ববঙ্গীয় কবিরাজ, বিবাহবিভ্রাটে ঘটক, অবতারে অর্থলোভী ভোজনলুব্ধ কপট স্বামীজি এবং একাধিক নাটকে ব্রাহ্মণপণ্ডিতও তাঁহার ব্যঙ্গের পাত্র হইয়াছে। ইহাদের প্রসঙ্গে রসিকতার মর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য উচ্চইংরাজিশিক্ষার প্রয়োজন হয় না, আপন সমাজের সঙ্গে পরিচয় থাকিলেই চলে।

প্রায় প্রত্যেক নাটকে একটি করিয়া প্রকৃতিস্থ চরিত্র থাকে—সে গম্ভীরভাবে অসঙ্গতির শাসন করে না, সে অসঙ্গতিগুলির রস উপভোগ করে। সে যেন নাটকের ভিতরকার দ্রষ্টা। নাট্যকার নিজে ঐ চরিত্রের অন্তরালে বাস করেন।

অমৃতলালের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে যাজ্ঞসেনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর হইতে প্রথমদ্যূত-সভার অবসান পর্য্যন্ত আখ্যায়িকা এই নাটকের উপজীব্য। চরিত্রগুলির মধ্যে দ্রৌপদীর অপূর্ব্ব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ইহাতে সুপরিস্ফুট হইয়াছে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ রোধ করিবার জন্য গান্ধারীর অন্তঃপুর হইতে রাজসভায় আগমনের দৃশ্যটি এই নাটকের সর্ব্বপ্রধান অবদান। ইহাতে মহাভারতেরও মানরক্ষা হইয়াছে। মহাভারতে আছে—দ্রৌপদীর কাতর আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় স্বয়ং ধর্ম্ম অন্তরিত থাকিয়া দ্রৌপদীর বস্ত্রের দৈর্ঘ্য অন্তহীন করিয়া দিলেন। দুঃশাসন বস্ত্রাকর্ষণে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। অমৃতলাল দেখাইয়াছেন—বিকর্ণের কাছে সংবাদ পাইয়া গান্ধারী অন্তঃপুর হইতে ছুটিয়া আসিয়া দ্রৌপদীকে বক্ষে ধরিয়া তাঁহার নারীমর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। আমরা মহাভারতের বর্ণনায় ক্ষুব্ধ হইয়া যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, অমৃতলাল তাহা তাঁহার নাটকে দিয়াছেন। যাজ্ঞসেনী নাটকখানি পূর্ব্ববর্ত্তী পৌরাণিক নাটকগুলির তুলনায় সাহিত্যাংশে উৎকৃষ্ট, রঙ্গমঞ্চে ইহার সাফল্যলাভের কথা নয়। কারণ, ইহার ভাষা দৃশ্যকাব্যের মত নয়, শ্রব্যকাব্যের মত। বাচন-ভঙ্গীর পারিপাট্য, ঐশ্বর্য্য, আলঙ্কারিকতা ও অর্থগৌরব কাব্যেরই উপযোগী, অভিনয়োচিত নাট্যের পক্ষে গুরুভার।

১। শকুনি—সর্ব্বনাশ সূত্রপাত দেখিলে সম্মুখে
অর্দ্ধেক করিবে ত্যাগ, যুক্তি পণ্ডিতের।
দুঃশাসন—রাজকোষ নহে শব্দকোষ, সিংহাসন নহে ব্যাকরণ।

২। দুর্য্যোধন—বাণমুখে ব্যঙ্গ রাখে চতুরঙ্গপতি দুর্য্যোধন।

৩। ভীষ্ম—কদম্বের দন্ত কভু হয় কি মলিন
পার্শ্বের সরসীজলে কমলদলের হ'লে বৃদ্ধি প্রসারের?

৪। দুর্য্যোধন—আশীবিষে জ্বলে যার দেহ
কি করিতে পারে তার ভ্রমরদংশন।

৫। কর্ণ— অক্ষে নাহি মম পক্ষপাত,
আছে বক্ষ, আছে বাহু, দক্ষমাত্র ধরিতে ধনুক।

৬। দুর্জ্জনে দমিতে বিধি উর্দ্ধে তোলে তারে
পাতনের আঘাতেতে চূর্ণ ক'রে দিতে।

এইরূপ চরণ ইহাতে অজস্র।

ধৃতরাষ্ট্র—প্রবোধের জন্য হেন খাণ্ডবকানন
পাণ্ডবে করিতে দান কোথা অপমান?

দুর্য্যোধন—অপমান অধিকার করিতে স্বীকার,
অপমান ন্যায্য ব'লে গ্রাহ্য করা প্রস্তাব তাহার।
অপমান ত্যাগপত্র করিতে অঙ্কিত
রাজহস্ত কলঙ্কিত করি। রাজধর্ম্মে
শত্রুর শাসন তরে অস্ত্র নহে একমাত্র অসি,
অসির আঘাতে হ'লে অস্থিভেদ
আয়ুর্বেদে আছে যোগ্যবিধি আরোগ্য করিতে ক্ষত,
কিন্তু ভেদমাত্র নামে আছে যন্ত্র, মন্ত্রণা আগারে
শলাকার ফলা যার সিক্ত তীব্র বিষে,
বিষের আকারে বিষ পশিলে হৃদয়রক্তে
মুক্তি নাই মানবের জীবন থাকিতে।

এইরূপ অংশগুলি রবীন্দ্রনাথের মহাভারতীয় গীতিনাট্যগুলির রচনারীতিকে মনে পড়ায়।

অমৃতলাল গৈরিশ ছন্দেই এই কাব্য খানি লিখিয়াছেন—কিন্তু ইহার অধিকাংশ চরণ পয়ার ছন্দে এবং মাঝে মাঝে ১৮ অক্ষরের চরণও অনেক আছে। ইহার ফলে ইহার গতিবেগ ও প্রবাহশীলতা আরো স্বচ্ছন্দ হইয়াছে—এবং মিল না থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের বলাকার ছন্দের কাছাকাছি গিয়াছে। মিলান্ত চরণও এই ছন্দোরচনায় অনেক আছে—অনেক স্থলে ইচ্ছা করিয়া মিল বর্জ্জন করা হইয়াছে। অমৃতলাল শিল্পী কবি ছিলেন মিলের দৈন্য কখনও তাহার ঘটিত না—মিল দিলে প্রবাহচ্ছেদ হইবে বলিয়া মিল সহজে আসিলেও বর্জ্জন করিয়াছেন। মিল যে তিনি অজস্র দিতে পারিতেন তাহার নিদর্শনও মাঝে মাঝে আছে যেমন—মাতৃরক্ত মাতুলে না করহ বিশ্বাস? তবে রুদ্ধ দ্বারে কর বাস, ফলে দীর্ঘশ্বাস কর হাহুতাশ, পেলে অবকাশ, কর্ণ মহেষ্বাস পাশে বসে করাবে বিশ্বাস, ভারত আকাশে যশের উচ্ছ্বাস।

অমৃতলালের কৌতুকনাট্যগুলি সবই ক্রমবিবর্ত্তনশীল নাগরিক সমাজ লইয়া রচিত। ইহাই তাঁহার বঙ্গব্যাঙ্গের লক্ষ্য। বিবাহবিভ্রাটের উপজীব্য নাগরিক সমাজের পণপ্রথা। ইহাতে পণ প্রথার কুফল দেখানো এবং পণমূলক বিবাহের একটা চিত্র দেখানো হইয়াছে, ইহা সমাজসংস্কারমূলক নাটক নয়। বিবর্ত্তনের যুগে পিতা পুত্রের মধ্যে আদর্শের দূর ব্যবধান ঘটিয়া যাইতেছে ইহাতে তাহারই সমস্যা দেখানো হইতেছে। সে হিসাবে নাটকখানির মূল্য এখনো সমানই আছে। ঐ সমস্যা বরং আরও বেশী ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। বিদুষী মহিলার চিত্রটি ইহাতে গর্ভাবলম্ব স্বরূপ আসিয়াছে। ইহাকে হাস্যদীপক করিবার জন্য একটু বেশি Emphasis দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে এই চিত্রটির আর মূল্য নাই। এখন নাগরিক সমাজে ঘরে ঘরে গ্র্যাজুয়েট নারী। বিলাসিনী কারফর্ম্মার চিত্র এখন আর অসঙ্গতির সৃষ্টি করে না।

একাকার নাটকখানি জীবিকাসমস্যা ও জাতিগত দ্বেষাদ্বেষি লইয়া রচিত। নাট্যকার জাতিবৈষম্যকে মানিয়া লইয়া জাতিগত বৃত্তি অনুসরণকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন। কর্ম্মকারপুত্র রাধানাথ বলিতেছে 'এই গ্রামার ছেড়ে হ্যামার ধরেই ভাই সাম্যভাব গিয়ে গ্রাম্যভাব এসেছে, দেশোদ্ধার ছেড়ে কার্য্যোদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়েছি। ভদ্রলোক হয়ে সাহেবের উমেদারি করতে গিয়ে তার দরওয়ান চাপরাশীর খিঁচুনি খেয়ে এসেছি। এখন ছোট লোক হয়ে এইটুকু লাভ হয়েছে যে, নিজেও দু'পাঁচজন দরওয়ান কর্ত্তে আসে।" প্রফুল্লচন্দ্রের প্রচারিত আর্থনীতিক সত্যের কথাই এখানে বলা হইয়াছে। অবশ্য নাটকখানির পক্ষে ইহাই বড় কথা নয়। বিষয়বস্তু যাহাই হউক ইহাতে প্রচুর রসসৃষ্টি হইয়াছে। গঙ্গার ঘাটে কলু বৌ ও ধোপা বৌএর বক্রোক্তিমূলক বাক্কলহটি বড়ই উপভোগ্য। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে যাদব ও রাধানাথের কথোপকথন একটি জীবিকাসমস্যা সম্বন্ধে সুরচিত প্রবন্ধ। নাট্যকারের নিজস্ব অভিমত রাধানাথের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে। সরকারী আফিসের দরজার দৃশ্য ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসের দৃশ্যও উপভোগ্য। জাতি লইয়া ইহাতে বেশি বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে সেজন্য বর্ত্তমান যুগে ইহার মূল্য কমিয়া গিয়াছে। সাহেবি আমলের কেরাণী জীবনটি সরসরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সমাজের গতিপ্রকৃতির পরিবর্ত্তনে কালাপানির মত কৌতুকনাট্যের মূল্য আরও কমিয়া গিয়াছে।

অমৃতলালের 'বাবু' নামক কৌতুকনাটকটির একসময়ে খুবই আদর ছিল। এই নাটকে ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব খুব স্পষ্ট। নাট্যকার তাঁহার সময়ে যেগুলিকে আমাদের শিক্ষিতসমাজের পক্ষে অসঙ্গত আচরণ মনে করিয়াছিলেন—সেইগুলিকে লইয়া ব্যঙ্গপরিহাস করিয়াছেন। রসিকতাসৃষ্টির জন্য অনাচারগুলিতে একটু বেশি মাত্রায় Emphasis দিয়াছেন—তাহাতে ব্যঙ্গবিদ্রূপ খুব তীব্রপ্রখর হইয়াছে—কিন্তু সাহিত্য হইয়া উঠে নাই। কেবল দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কটি Emphasis সত্ত্বেও সাহিত্যের পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। অন্যান্য অংশগুলিতে সার্ব্বজনীন আবেদন নাই— যে সময়ের চিত্র সেই সময়েই উহার আবেদন পরিচ্ছিন্ন। এই গর্ভাঙ্কে কেবল গর্ভধারিণী ও সন্তানের বাগ্‌বিনিময়ের মধ্যে আবেদনের চিরন্তনতা আছে।

অমৃতলাল সমাজদ্রোহীদের সাধারণতঃ হিন্দুসমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতীয় লোক রূপে চিত্রিত করিয়াছেন,—ইহার মধ্যে কিছু সত্য আছে। লেখাপড়া শিখিলেও নিম্নজাতীয় লোকেরা হিন্দু সমাজে জাতিজন্মের জন্য উপেক্ষিত হইত। সে জন্য তাহারা সমাজ ত্যাগ করিবার জন্য উৎসাহিতও হইত। ইহা কল্পনামাত্র নয়। হিন্দুসমাজের এই অবিচার নাট্যকারের মনে পীড়াদায়ক হয় নাই। এই জন্য নিম্নজাতীয় শিক্ষিত লোকেরা নাট্যকারের সহানুভূতি পায় নাই, তাহারা নাট্যকারের ব্যঙ্গের পাত্রই থাকিয়া গিয়াছে। এখন দিনকালের বদল হইয়াছে। এখন তাহাদের লইয়া সহানুভূতিশূন্য ব্যঙ্গবিদ্রূপ আর উপভোগ্য হয় না।

লেখক দাসদাসীরূপে নিম্নশ্রেণীর • বনারীর চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। তাহাদের মুখের ভাষা যথাযথই রাখিয়াছেন, তাহাতে অভিনব কৌতুকের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা ছাড়া, তাহাদের দ্বারা আর এক প্রকারের কৌতুকের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা মনিবের সকল দোষত্রুটী, গ্লানিকলঙ্ক ও নির্বুদ্ধিতা সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিতেছে। মনিব যাহা কিছু গোপন রাখিতে চায়, তাহাদের অশিক্ষা ও প্রশ্রয়সঞ্জাত মুখরতার জন্য তাহার কিছুই গোপন থাকিতেছে না। তাহারা মনিবের সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতার সাক্ষী, কাজেই তাহারা অতিরিক্ত প্রশ্রয় পাইয়া প্রভুভক্ত নয়। নাট্যকার তাহাদের সারল্য ও মূঢ়তার আবরণে তাহাদের মুখে মনিবের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য, তিরস্কার ও শ্লেষব্যঙ্গ উপনিবদ্ধ করিয়াছেন, অথচ তাহারা এ সম্বন্ধে যেন আদৌ সচেতন নয়। ইহার দ্বারা চমৎকার কৌতুকরসের সৃষ্টি হইয়াছে।

অমৃতলাল নিম্নশ্রেণীর লোকদের ভাষার এমন চমৎকার নিদর্শন দিয়াছেন যে তাহাতে মনে হয় তিনি নিম্নশ্রেণীর লোকদের জীবনচিত্রগুলিকেও চমৎকার নাট্যরূপ দিতে পারিতেন। কিন্তু নিজে রঙ্গমঞ্চের নেতা ও অভিনেতা ছিলেন বলিয়া একার্য্যে অগ্রসর হ'ন নাই, কেবল নাট্য-লেখক হইলে কথা ছিল না। ইহাতে সমস্ত নাটকখানিতে নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখের ভাষণ বসাইতে হইত, তাহা নগরের শ্রোতাদের উপভোগ্য হইত না। তাহা ছাড়া, ভদ্রশিক্ষিত লোকদের দ্বারা নিম্নশ্রেণীর নরনারীর অভিনয় দেখানো চিত্তাকর্ষক ও যথাযথ হইত না, নিম্নশ্রেণীর লোকদেরই রঙ্গমঞ্চে স্থান দিতে পারিলে তাহা সম্ভব হইত। তাহাদের লইয়া প্রহসন রচনা-ত চলেই নাই। তাহারা দুঃখী কাঙাল—তাহাদের জীবন লইয়া হাস্যপরিহাস করা যায় না, বিজন ভট্টাচার্য্যের 'নবান্নের' মত নাটক লেখাই যায়। দীনদুঃখীদের দাবি লইয়া নাটক লেখার কথা গিরিশচন্দ্রেরও মাথাতেও আসে নাই। অমৃতলালের দরদী দৃষ্টি গিরিশচন্দ্রের মতই নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর নীচে নামে নাই।

অমৃতলালের যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সে ভারত উদ্ধার বা দেশের স্বাধীনতালাভ একটা শশাবিষাণবৎ অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে করা হইত। তখনকার তথাকথিত দেশভক্তদেরও অকপটতা ও চরিত্রদৃঢ়তা ছিল না। সেজন্য অমৃতলাল যে তাহাদের লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার বার্দ্ধক্যেই দেশভক্তদের অন্যরূপ দেখিয়া গিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতাও শেষ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। তাঁহার কৌতুকনাট্যগুলি

সে কালের দেশসেবার ঐতিহাসিক উপাদান কিছু যোগাইলেও বর্ত্তমান যুগ সেগুলিকে ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করিবে।

স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, জাতিবৈষম্য, বিধবাবিবাহ ইত্যাদির চিত্রে একটু বেশি মাত্রায় রঙ চড়াইয়া নাট্যকার বিসদৃশতার সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়াই সেগুলি এখনো উপভোগ্য,—নতুবা সেগুলিও এযুগে অচল হইয়া পড়িত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অমৃতলালের কৌতুকনাট্যগুলি নগরের ইংরাজিশিক্ষিত লোকদের জন্য এবং ইংরাজিশিক্ষায় বিকৃতবুদ্ধি সমাজের কথা লইয়া রঙ্গব্যঙ্গ করিবার জন্যই রচিত।

অমৃতলালের ভাষায় অসাধারণ অধিকার আমাদের স্তম্ভিত করিয়া দেয়। সর্বোচ্চ শিক্ষিত পুরুষ হইতে ঝাড়ুদার, চামার পর্য্যন্ত, উচ্চশিক্ষিতা মহিলা হইতে আরম্ভ করিয়া কাঁসারী পিসী পর্যন্ত, যাহার মুখের ভাষা যেমনটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, নাট্যকার ঠিক তেমনিটি বসাইয়াছেন। নাট্যকারের রঙ্গব্যঙ্গের ক্ষেত্র কলিকাতানগরী। কলিকাতা—Cosmopolitan city, এখানে সকল জাতির সকল প্রদেশের সকল জেলার লোকের সমাবেশ। নাট্যকার সকলশ্রেণীর লোককেই তাঁহার নাটকে স্থান দিয়াছেন, কোন-না কোন প্রসঙ্গে যাহারা নাটকে কথা বলিবার সুযোগ পায় নাই, তাহারা অন্ততঃ পথ দিয়া নিজেদের ভাষায় গান গাহিয়া বা ফেরি করিয়া গিয়াছে। সকল ভাষায় ও সকল প্রকার ভঙ্গীতে কেবল অধিকার নয়, ঐ সকল ভাষায় রঙ্গব্যঙ্গের সৃষ্টি, অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, অভিজ্ঞতা ও প্রতিভার নিদর্শন।

বাঙ্গালী নিজের ভাষাও ভুলিতে বসিয়াছে—সে এখন ইংরাজিমিশানো বাংলায় কথা বলে এবং ইংরাজিতে ভাবিয়া ইংরাজি হইতে তর্জ্জমা করা ভাষায় লেখে। আসল বাংলাভাষা কাহাকে বলে তাহা অমৃতলালের বই পড়িয়া তাহার শিক্ষা করা উচিত।

'অমৃতমদিরা' অমৃতলালের কবিতার সংকলন পুস্তক। এই পুস্তকের নিবেদনে অমৃতলাল বলিয়াছেন—'মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বা রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বে কবি হইয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা আমার নাই—

স্মরি কৃত্তিবাস নাম এস কবি কাশীরাম
কর্ণেতে ঝঙ্কার কর শ্রীকবিকঙ্কণ।
কোথা রায় গুণাকর, কোথা গুপ্ত কবিবর,
তোমাদের ভাষা কর হৃদয়ে অঙ্কন।
প'ড়' আছ কতদূরে ? সেই পুরাতন সুরে
গাহিতে নূতন গীত হয়েছে বাসনা,
যদিও ঘুচেছে দৃষ্টি নয়নে মুচেছে সৃষ্টি
তবু আছে স্মৃতি-শ্রুতি হৃদয়-বাসনা।'

অমৃতলাল যে কবিদের নাম করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে গুপ্ত কবিবরই কবি অমৃতলালের গুরু। কেবল বর্ণনার ভাষা নয়, রচনাভঙ্গীতেও অমৃতলাল ঈশ্বরগুপ্তেরই অনুকারী।

যে কবিতাগুলিতে নিজের জরা, ব্যাধি, শোকতাপ ও দৃষ্টিক্ষীণতার কথা আছে—

সেগুলিতে ব্যথাও আছে। বাকি কবিতাগুলির মধ্যে কৌতুকরস হয় প্রকাশ্যে, নয় তলে তলে প্রবাহিত। যে কবিতাগুলিতে কৌতুকরসের সঙ্গে তীব্র শ্লেষব্যঙ্গ পরিস্ফুট হইয়াছে সেই-গুলিই বিশেষ উপভোগ্য। এই শ্রেণীর কবিতা—নান্দী (ইংরাজের শিষ্টগুণগান), ক্ষুধাতুরের খেদ (হেমচন্দ্রের 'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয়' কবিতার প্যারডি), শনিবারের বিকালবেলা (ছড়ার ছন্দে কলিকাতার বৈকালবর্ণনা), তালের তত্ত্ব (নাগরিকসমাজে কুটুম্বতত্ত্বের বাড়াবাড়ির প্রতি ব্যঙ্গ), হরিদাস (শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের বিড়ম্বিত জীবন), বঙ্গের আর একরঙ্গ (বাঙ্গালীচরিত্রের একদিক), আদর্শকবিতা (বিদ্যালয়পাঠ্য কবিতায়, বিদ্যালয়ের শিক্ষারীতি লইয়া রঙ্গরসিকতা) বিড়াল (বাঙ্গালীচরিত্রের সঙ্গে বিড়ালচরিত্রের সাদৃশ্য), গৃহিণীর মানের মানহানি, ব্যাঘ্ররবকমহাকাব্য (অমিত্রাক্ষর ছন্দ লইয়া একটু রঙ্গরসিকতা), অন্তঃপুরে উদ্দীপনা (নারীপ্রগতি সম্বন্ধে ব্যঙ্গ)।

অমৃতমদিরায় কোন-না-কোন ব্যক্তির উদ্দেশে ও সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত অনেক কবিতা আছে। এইগুলিতে বাক্‌চাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

কয়েকটি প্রেমকবিতাও আছে। কোন কোনটি শেষ পর্য্যন্ত রঙ্গরসিকতায় বিগলিত হইয়াছে। 'ঋতুবর্ত্তন' ঈশ্বরগুপ্তের ঋতুবর্ণনার উপর কলাশ্রীসাধনের নিদর্শন। 'নটনীতি' ও 'অমৃতমদিরা' কবির নাট্যকার জীবন ও নটজীবনের অভিজ্ঞতার বিবৃতি মাত্র।
অমৃতলাল বুকফাটা হাসির কবি। কবি বলিয়াছেন —

যে কভু না পাইয়াছে প্রাণেতে আঘাত। সরস্বতী সনে তার হবেনা সাক্ষাৎ।
হৃদয়শোণিতে হয় জন্ম কবিতার। অস্থিচূর্ণ করি তাতে দিতে হয় সার।
সুখের আসনে ব'স' গণিয়া মোহর। কে কোথা দেখেছে কবে ভাবের লহর।

কবিতার জন্ম ব্যথায়। কিন্তু তাই বলিয়া তাহা কেবল অশ্রুর অক্ষরে লিখিত হইবে, এমন কিছু কথা নাই। তাহা অট্টহাস্যের ছটাতেও রূপ লাভ করিতে পারে। এই হাসিই বুকফাটা হাসি—দীর্ঘশ্বাস এই হাসিকে উচ্ছ্বসিত করে। এ হাসি যে হাসে—তাহার চোখের পানে তাকাইলে দেখিবে চোখ তার ভিজে। অমৃতলাল এই হাসির কবি। জীবনে অনেক আঘাত, অনেক বেদনাই তিনি পাইয়াছেন—কিন্তু সবই তাহাকে এই হাসিই হাসাইয়াছে। ক্রন্দনকে অমৃতলাল নারীর ধর্ম্ম মনে করিতেন।

অমৃতলালের ভাষায় মৌলিকতা আছে। অমৃতলালের বাগ্‌ভঙ্গীর সহিত সেকালের কোন কবির মিল নাই। এই বাগ্‌ভঙ্গী তাঁহার নিজস্ব। বাক্যাঙ্গগুলির সরসতা, অপূর্ব্বতা ও আলঙ্কারিকতার স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রাক্তন কবিদের ব্যবহৃত ও চিরপ্রচলিত অলঙ্করণ তিনি বর্জ্জন করিয়া চলিয়াছেন। পারিপার্শ্বিক সামাজিক জীবন হইতে সংগৃহীত উপাদানের সঙ্গে যে সমস্ত অলঙ্কার অনায়াসে সহজ সরলভাবে আপনা হইতে আসিয়া পড়িয়াছে তিনি সেইগুলিরই প্রয়োগ করিয়াছেন। অলঙ্কারপ্রয়োগে কোথাও কৃচ্ছ্র চেষ্টা নাই।

তাঁহার রচনায় তিনি অন্তরের স্বাভাবিক কথাগুলিই বলিয়া গিয়াছেন, কল্পনার সাহায্য বা

কৃত্রিম উপায়ে বক্তব্যের প্রসাধন তাঁহার রচনায় নাই। সেজন্য একহিসাবে তাঁহার কাব্য ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু আর এক হিসাবে প্রাণবন্ত। কাব্যরচনায় অক্ষুণ্ণ আন্তরিকতার যদি কোন মূল্য থাকে তবে সে মূল্য কবির প্রাপ্য।

অমৃতলাল যে যুগের কবি, সে যুগের প্রবীণ কবিদের ছন্দের মর্য্যাদা কাঁটায় কাঁটায় রাখিয়া ঘনঘন অনবদ্য মিল দেওয়ার প্রয়াস বা প্রবৃত্তি ছিল না বলিলেই হয়। অমৃতলাল এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনার উৎকর্ষ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কৌতুকরসের কবিতার পক্ষে অপ্রত্যাশিত মিলের বৈচিত্র্য যে খুবই প্রয়োজন—তাহা দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের মতই অমৃতলালও উপলব্ধি করিতেন।

অমৃতলালের কবিতাগুলি লঘুতরল ভঙ্গীতে ও মজালিসী ঢঙে রচিত। এইগুলিতে গভীর ভাব কিছুই নাই, কোন সত্যের প্রতিপাদন বা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নাই, কল্পনার লীলা নাই, অর্থগৌরবও নাই। এসব যে নাই তাহা 'নিবেদন' কবিতায় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, এ সবের দাবি তিনি করেন নাই। কতকগুলি সরল সত্যকথা ও কূটস্থভাবে সমাজদর্শনের গূঢ়বার্ত্তা, তিনি কৌতুকরসঘন ভাষায় অনবদ্য ছন্দে ও জোরালো ভঙ্গীতে বিবৃত করিয়াছেন। অমৃতমদিরায় ছন্দে তিনি যে কথা বলিয়াছেন, অনেক নাটকের পাত্রপাত্রীদের মুখেও তিনি সেই কথাই বলিয়াছেন।

অমৃতলালের কতকগুলি প্রবন্ধও আছে। এইগুলি বিষয়বস্তুর গৌরবের জন্য উপাদেয় নয়, এইগুলি গবেষণামূলক নিবন্ধ নয়, কোন সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তিমূলক ক্রমঅনুসরণেও লিখিত নয়। এইগুলিকে কবিগুরুর ভাষায় 'সত্যের ভূমির উপর দিয়া লঘুপদে সঞ্চরণ' বলা যাইতে পারে। অর্থগৌরবের জন্য এইগুলির মূল্যবত্তা নয়, বাগ্‌ভঙ্গীর চাতুর্য্য, সরসতা ও সৌষ্ঠবের জন্যই এইগুলি উপাদেয়। প্রমথ চৌধুরীর নিবন্ধগুলির মত এইগুলি প্রবন্ধসাহিত্যের গণ্ডীতে পড়ে। কিন্তু এইগুলিতে রসসৃষ্টির জন্য কৃত্রিম প্রচেষ্টা নাই, রচনাভঙ্গীর স্বাভাবিক মাধুর্য্য সারল্য ও তারল্যে এইগুলিতে রসসৃষ্টি হইয়াছে।

অমৃতলাল ছিলেন বাংলার অনুগঙ্গ অঞ্চলের রঙ্গরসিক বাঙ্গালীজাতির যথার্থ প্রতিনিধি। এই বাঙ্গালীজাতির দিন দিন স্বধর্ম্মচ্যুতি ঘটিতেছে, নানা কারণে সে হাসিতে ভুলিতেছে, রঙ্গরসিকতা এখন তাহার চাপল্য ও তারল্য বলিয়া মনে হয়, দিবসের তথা জীবনের অধিকাংশ সময় সে অর্থচিন্তায় গম্ভীর হইয়া থাকে, সে যুগধর্ম্মের প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে খরবেগে, তাহার পিছুপানে ফিরিয়া তাকাইবার অবসর নাই। যাহারা আমাদের জাতির অত্যন্ত অন্তরঙ্গ আপনজন, তাহাদের সে আজ চিনেও না। তাই বাঙ্গালী আজ তাহার খুল্ল পিতামহ বা ছোট্ ঠাকুরদাদা অমৃতলালকে ভুলিতে বসিয়াছে। পিতামহকেও ভুলিতে তাহার আর বেশি দেরি নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

বাংলা সাহিত্যজগতে জ্যোতিবিন্দ্রনাথ একজন দিকপাল। তাঁহাব সাহিত্যসেবাব ঐশ্বর্য্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যে ততটা নয়, যতটা বৈচিত্র্যে ও অজস্রতায। একপ একনিষ্ঠ সাবস্বত-পুরুষ বঙ্গদেশে তুর্লভ। বাংলাব সংস্কৃতিব দীনতা দূব কবিবাব জন্য তিনি সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন একাধাবে চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী, বাদনশিল্পী, অভিনয়বিদ্যা-কুশল, বহুভাষাবিদ্, বহুশ্রুত, আদর্শবসজ্ঞ এবং সর্ব্বোপাব সুসাহিত্যিক। তাঁহারই সাবস্বত সাধনা যেন বহুধা বিকীর্ণ হইযা ববীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথেব প্রতিভা-বিকাশে সার্থকতালাভ কবিযাছে। সাহিত্যে ববীন্দ্রনাথেব দীক্ষাগুরু যদি হ'ন বিহাবীলাল, তবে শিক্ষাগুরু জ্যোতিবিন্দ্রনাথ। বালক ববীন্দ্রনাথেব সাহিত্যসাধনায জ্যোতিবিন্দ্রনাথেব দান অসামান্য ও অমূল্য। জ্যোতিবাবু ববীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত কবিয়াছেন, প্রেবণা দিয়াছেন, তাঁহাব নবোদ্ভিদ্যমান প্রতিভাকে নিযন্ত্রিত করিযাছেন, দেশবিদেশেব সাহিত্যেব সহিত ববীন্দ্রনাথেব পবিচয ঘটাইয়াছেন। সাহিত্যেব যে অত্যুন্নত আদর্শকে তিনি নিজে অধিগত কবিতে পাবেন নাই, তাহা তিনি কনিষ্ঠভ্রাতাব কল্পনেত্রেব সম্মুখে তুলিযা ধবিযাছেন, বচনাব বহু উপাদান উপকবণ যোগাইযাছেন। ববীন্দ্রনাথেব চাবিপার্শ্বে একটা সাহিত্য ও সর্ব্বাঙ্গীণ জাতীয় সংস্কৃতিব পবিবেষ্টনী বচনা কাবযা বাখিযাছিলেন। জ্যোতিবাবুব মত একনিষ্ঠ সাহিত্যবথীব স্নেহচ্ছাযায পবিবর্দ্ধিত হওয়াব জন্যই ববীন্দ্রনাথ এত বড হইতে পাবিযাছিলেন—একথা বলিলে খুব অন্যায হয না। অতএব ববীন্দ্রনাথেব কথা বলিবাব আগে জ্যোতিবাবুব সাহিত্যসাধনাব সংক্ষেপে পাবচয দেওযা বোধহয সঙ্গত।

জ্যোতিবাবুব সাধনা সাহিত্যেব বহু শাখায পুষ্পিত হইয়াছে। যেমন—

১। কবিতা, ২। গান, ৩। গীতিনাট্য, ৪। প্রহসন, ৫। ঐতিহাসিক নাটক, ৬। ফরাসী সাহিত্য হইতে অনুবাদ, ৭। প্রাকৃত নাটকেব অনুবাদ, ৮। সংস্কৃত নাটকেব অনুবাদ। ৯। প্রবন্ধ ইত্যাদি—

জ্যোতিবিন্দ্রনাথের 'সবোজিনী নাটক একদিন অভিনীত হইত। এই নাটকে চিতোবেশ্ববী চতুর্ভুজা দেবীব 'ম্যয় ভুখা হুঁ'—কিংবদন্তীব একটা ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আলাউদ্দিন-প্রেবিত একজন মুসলমান ছদ্মবেশে ভৈববাচায্য সাজিয়া চতুর্ভুজা দেবীর পূজাবী হয়। সেই পূজারীই একটা কুহকমায়ার সৃষ্টি কবিযা বাজবংশেব শোণিতপানের দৈবীপিপাসা দৈববাণীরূপে প্রচাব করিযাছিল এবং গুপ্তচবেব সাহায্যে আলাউদ্দিনকে চিতোরেব সমস্ত সংবাদ প্রেবণ করিত। নাট্যকার লক্ষ্মণ সিংহকে কবিযাছেন নির্বোধ, ব্যক্তিত্বহীন, তুর্বলচিত্ত ও কুসংস্কারে অন্ধ। ভৈরবাচায্যেব কল্পনা আজগুবি সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাব দ্বাবা নাটকেব ক্রমোন্মেষ সাধিত হইয়াছে এবং নিজেব কন্যাকেই ভ্রমক্রমে সে বধ কবিয়া নাটকেব শেষাংশটি জমাইয়া তুলিয়াছে। নাটকে বাজপুতবীবদেব শৌর্য্য অপেক্ষা বাজপুতনারীদেব

আত্মোৎসর্গ জহরের অনলে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্মণসিংহের পিতৃবাৎসল্যের সহিত দৈবনির্দেশের দ্বন্দ্ব নাটকের প্রধান উপজীব্য।

'পুরুবিক্রম' নাটকখানি আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ লইয়া রচিত। সেকেন্দার শাহ পুষ্কলাবতী জয় করার পর সিন্ধুনদী পার হইয়া অগ্রসর হ'ন। তক্ষশিলার রাজা আম্ভি বিনা যুদ্ধে দিগ্‌বিজয়ীর বশ্যতা স্বীকার করেন এবং স্বদেশবিজয়ে বিদেশী শত্রুকে সহায়তা করেন। সেকেন্দার পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলে মহারাজ পুরু তাঁহার গতিরোধ করেন। পুরু প্রাণপণে যুদ্ধ করেন, কিন্তু গ্রীক অশ্বারোহী ধনুর্দ্ধরদের আক্রমণে পুরুর হস্তিসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং তিনি পরাজিত, আহত ও বন্দী হ'ন। সেকেন্দার পুরুকে জিজ্ঞাসা করেন,—তুমি আমার নিকট কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর। তাহাতে পুরু সগর্ব্বে উত্তর দেন— "রাজার প্রতি রাজা যেরূপ আচরণ করে সেই আচরণ।" পুরুর তেজস্বিতায় মুগ্ধ হইয়া সেকেন্দার শাহ্ পুরুকে তাঁহার রাজ্যে পুনরভিষিক্ত করিয়া পুনরায় রণযাত্রা করেন। এইটুকু ঐতিহাসিক তথ্য লইয়া নাট্যকার নাটকখানি রচনা করিয়াছেন।

নাট্যকার আম্ভিকে করিয়াছেন তক্ষশীল। তক্ষশীলের ভগিনী অম্বালিকা গ্রীক শিবিরে বন্দিনী হইলে সে সেকেন্দার শাহের প্রতি অনুরক্তা হইয়া পড়ে—সেকেন্দার শাহও প্রত্যনুরাগ প্রকাশ করেন। অম্বালিকা মুক্তি পাইয়া তাহার ভ্রাতাকে গ্রীক বীরের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করে। কুল্লু পর্ব্বতের রাণী ঐলবিলা প্রতিজ্ঞা করেন—গ্রীক বিজয়ীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যিনি সবচেয়ে বেশি বীরত্ব দেখাইতে পারিবেন, তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন। তক্ষশীল ঐলবিলাকে বিবাহ করিবার জন্য উন্মত্ত, অথচ গ্রীকবীরের সহিত যুদ্ধ করিবার সাহস তাহার নাই,—তাহার উপর ভগিনীর পীড়াপীড়ি। তক্ষশীল ছলে বলে কৌশলে ঐলবিলাকে হস্তগত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। একমাত্র পুরুরাজই সদর্পে গ্রীকবীরের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন। স্বভাবতই ঐলবিলা পুরুরাজকে পতিত্বে বরণ করিলেন। পুরুরাজ স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক তক্ষশীলের প্রাণ হরণ করিলেন। সেকেন্দার শাহ্ বিদায় লইবার সময় অম্বালিকাকে সঙ্গে লইলেন না। অম্বালিকা তখন বুঝিতে পারিল— গ্রীকবীরের একমাত্র প্রার্থনী বিজয়লক্ষ্মী—আর কেহ নয়। অম্বালিকার প্রতি তাহার প্রণয়ের অভিনয় কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্য। অম্বালিকার শোচনীয় পরিণামই নাটকের প্রধান উপজীব্য।

পুরুরাজের দিক হইতে ইহাকে দেশভক্তিমূলক নাটক বলা যাইতে পারে।

এই নাটকে সেকেন্দার শাহ্ ও পুরুরাজের উদার বীরধর্ম্মপালনের চিত্রটি লক্ষণীয়। পুরুবিক্রম পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"'পুরুবিক্রম' বীররসের খতিয়ান। এইরকম লোক যদি নাটক লেখেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে।" বঙ্কিমচন্দ্র নাট্যকলার দিকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলেন নাই, দেশভক্তিপ্রচারের দিক হইতেই এই মন্তব্য করিয়াছিলেন।

জ্যোতিবাবুর অশ্রুমতী নাটকখানির বিষয়বস্তু রাণাপ্রতাপের সঙ্গে আকবর ও

মানসিংহের সংঘর্ষ। নাটকখানির রসসূত্র, কিন্তু রাণাপ্রতাপের কল্পিতকন্যা অশ্রুমতীর প্রণয়। ঐতিহাসিক উপাদান বেশি থাকায় এই নাটকখানিতে একটা ঐতিহাসিক পরিবেষ্টনের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রতাপকন্যা অশ্রুমতী মানসিংহের প্ররোচনায় অপহৃতা হইয়া মোগলরাজপ্রাসাদে আনীতা হইলেন—তারপর সেলিমের দৃষ্টি পড়িল তাহার উপর। অশ্রুমতীও সেলিমের প্রেমে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তুর্কের হাতে কন্যাভগিনীসমর্পণের জন্য রাণাপ্রতাপ মানসিংহকে অপমানিত করেন। মানসিংহের প্রতিহিংসাবৃত্তি তাই কেবল প্রতাপকে রাজ্যহারা বনবাসী করিয়াই তৃপ্ত হইতেছে না—রাণাপ্রতাপের কন্যাকে মুসলমানের বিবাহিতা ভার্য্যাতে পরিণত করিয়া তাঁহার কৌলিকদর্প চূর্ণ করিতে চায়। নাট্যকার মানসিংহচরিত্রের মনুষ্যত্ব বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট রাখেন নাই। কিন্তু মনে হয়, নাট্যকারের অভিপ্রায় আরও গভীর। কৌলিক শুচিতা, বংশগৌরব, আভিজাত্য ইত্যাদির গর্ব্ব কত যে অসার—নাট্যকার এই নাটকে তাহাই দেখাইয়াছেন। বংশকুল বলিলে বহু নরনারীকে বুঝায়। রাণাপ্রতাপের মত যে কেহ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া জীবন বিপন্ন করিয়াও কৌলিক শুচিতা রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু বংশকুলের সকলেই, এমন কি আপন পুত্রকন্যাও তাহা রক্ষা করিবেই এমন কথা জোর করিয়া বলাও যায় না—প্রত্যাশা করাও যায় না। কাজেই এই অহঙ্কার একেবারে অসার। নাট্যকার রাণাপ্রতাপের একটি কন্যার কল্পনা করিয়া তাহাকে মুসলমানদের হাতে বন্দিনী করিয়াছেন—ইহা ঐতিহাসিক সত্য না, কিন্তু ইহা সাহিত্যের সত্য হইয়া উঠিয়াছে। এই কন্যা যদি কেবল বলাহৃতা হইয়া মুসলমানের ভার্য্যা হইয়া উঠিত—তাহা হইলেও প্রতাপের কুলদর্প সম্পূর্ণ চূর্ণ হইত না। নাট্যকার তাহাকে সেলিমের প্রেমে উন্মাদিনী করিয়া রাণাপ্রতাপের বংশগৌরবের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। নাট্যকারের এই কল্পনা হিন্দু পাঠকের রুচিকর হইতে পারে না। সীতা যদি লঙ্কায় বন্দিনী হইয়া রাবণের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছে এইরূপ কোথাও চিত্রিত হয়, তাহা হইলে হিন্দু মনে যে আঘাত লাগে, ইহাতেও প্রায় তদনুরূপ আঘাত লাগিবার কথা। তবু বলিতে হয়, জ্যোতিবাবু একটি সত্যকে রূপ দান করিবার জন্য এই দুঃসাহসের কাজ করিয়াছেন। রাণাপ্রতাপের বদলে অন্য কোন কল্পিত রাজপুতবীরের চরিত্র আশ্রয় করিলে কোন ক্ষোভই থাকিত না।

নাট্যকার দেখাইয়াছেন—রাজ্য হারানো রাণাপ্রতাপের জীবনে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করে নাই, সেলিমের প্রতি অশ্রুমতীর প্রেমানুরাগই মৈনাকতুল্য প্রতাপের শিরে বজ্রাঘাত করিয়াছে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল সাহিত্যের দিক হইতে বিচার করিলে অশ্রুমতী নাটকখানিকে উপেক্ষা করা যায় না।

জ্যোতিবাবুর আর একখানি নাটক স্বপ্নময়ী। শুভ সিংহ বা শোভা সিংহের বিদ্রোহ লইয়া লিখিত। চরিত্রাঙ্কনের জন্য নাটকখানি ব্যর্থ হয় নাই।

জ্যোতিবাবু কয়েকখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলির বৈশিষ্ট্য কিছু নাই। 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ'—প্রহসনখানি মন্দ হয় নাই। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনখানি জ্যোতিবাবুর প্রথম প্রকাশিত রচনা। বঙ্কিমবাবু ইহার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। তখন জ্যোতিবাবু

স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। এই নাটকে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি কটাক্ষ ছিল—সে জন্য তাঁহাকে নব্য দলের কাছে গালাগালিও শুনিতে হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথের বিলাত হইতে আসার পর জ্যোতিবাবু স্ত্রীস্বাধীনতার চরম সমর্থক হইয়া উঠেন এবং অনুতপ্ত হইয়া ঐ গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। তিনি গীতিনাট্যও কয়েকখানি রচনা করিয়াছিলেন—এই নাট্যগুলির স্থলে স্থলে কবিত্ব আছে। জ্যোতিবাবু অনুবাদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, ফরাসী ভাষা হইতে তিনি বহু প্রবন্ধ, কথাসাহিত্য ও নাট্যের অনুবাদ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। জ্যোতিবাবুর সবচেয়ে বড় অবদান—সংস্কৃত নাটকগুলির অনুবাদ। তিনি—অভিজ্ঞান শকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী, নাগানন্দ, ধনঞ্জয় বিজয়, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত, প্রবোধচন্দ্রোদয়, কর্পূরমঞ্জরী, চণ্ডকৌশিক, বিদ্ধশালভঞ্জিকা, মহাবীরচরিত, মৃচ্ছকটিক, মালবিকাগ্নিমিত্র, বেণীসংহার, মালতীমাধব ইত্যাদি নাটকের অনুবাদ করেন।

এই সব অনুবাদের পুস্তক সাধারণ লোকে হয়ত পড়েই নাই—কিন্তু ঠাকুর বাড়ীর যুবক-যুবতীরা এইগুলি হইতে সংস্কৃত সাহিত্যে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্র-নাথের সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে এইগুলি সহায়তা করিয়াছিল। জ্যোতিবাবুর অবিশ্রান্ত লেখনীর প্রসব প্রত্যক্ষভাবে দেশের লোকের কাছে পৌছায় নাই, পরোক্ষ ভাবেই পৌছিয়াছে। রবীন্দ্র নাথের সাহিত্যসাধনার মধ্যে জ্যোতিবাবুর সাধনা অঙ্গীভূত হইয়া আছে। সীতার মধ্যে উর্ম্মিলার আত্মবিলোপের মত জ্যোতিবাবুর অবদান রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনায় আত্মবিলোপ করিয়াছে।

সেকালে দেশহিতৈষিতা ও দেশাত্মবোধের একটা প্লাবন আনিয়াছিল বঙ্গসাহিত্যে। টডের রাজস্থান এই প্লাবন প্রবাহের সঞ্চারক। জ্যোতিবাবুর মৌলিক নাটকগুলিতে, স্ব রচিত গানগুলিতে এবং অন্যান্য রচনার মধ্যে দেশাত্মবোধ খুবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তাঁহার মৌলিক নাটকগুলিতে একটি করিয়া প্রেমকাহিনীর সূত্র আছে। মনে হয়, তাহা যেন গৌণ, দেশাত্মবোধপ্রচারই মুখ্য।

জ্যোতিবাবুর নাটকগুলিতে যে গানগুলি আছে, তাহাদের কতকগুলি কবি অক্ষয় চৌধুরীর রচনা—বেশীর ভাগ রচনা বালক কিংবা কিশোর রবীন্দ্রনাথের। জ্যোতিবাবু পিয়ানোতে নব নব সুর সৃষ্টি করিতেন—রবীন্দ্রনাথ সেই সুরে গান লিখিয়া দিতেন। এই সকল গান জ্যোতিবাবুর নাটকের অঙ্গীভূত হইত। 'বাল্মীকি প্রতিভা' এবং 'কালমৃগয়া'র গানগুলি এইভাবেই সৃষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বলিতেছেন—"এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম। আমার দুইপার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুররচনা করিতাম, অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি)। বালক বা কিশোর রবীন্দ্রনাথের রচনা হইলেও এই গানগুলির দ্বারা জ্যোতিবাবুর নাটকগুলি বিশেষ করিয়া গীতিনাট্যগুলি সাহিত্যশ্রী লাভ করিয়াছে।

জ্যোতিবাবুর নাটকগুলিতে কিশোর রবীন্দ্রনাথের যে গানগুলি আছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি আজিও কাব্যরসিকদের সমাদর লাভ করে। যেমন—

১। গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে (ভানুসিংহ পদাবলী)—অশ্রুমতী নাটকে ২। জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ, দ্বিগুণ—সরোজিনী নাটকে ৩। আমি, স্বপনে রয়েছি ভোর। ৪। বল্ গোলাপ মোরে বল্। ৫। আঁধার শাখা উজল করি। ৬। হৃদয় মোর কোমল অতি। ৭। দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ গান। ৮। দেলো সখি দে পরাইয়ে চুলে। ৯। দেখে যা, দেখে যা, দেখে যায় লো। ১০। আয় তবে সহচরি হাতে হাতে। ১১। কে যেতেছিস্ আয় রে হেথা। ১২। অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া—প্রভৃতি স্বপ্নময়ী নাটকের গান।

'পুরুবিক্রম' নাটকের "মিলে সবে ভারতসন্তান, একতান মনপ্রাণ" গানটি কবির মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচনা। 'ধ্যানভঙ্গ' ও পুনর্ব্বসন্ত গীতিনাট্য দুইটিরও অনেক গান রবীন্দ্রনাথের রচনা—

১। যোগী হে যোগী হে, কে তুমি হৃদি আসনে। ২। আমরা ভূতপেরেতের দল। ৩। আজু সখি মুহুমুহু, গাহে পিক কুহুকুহু। ৪। গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া—প্রভৃতি ধ্যানভঙ্গের গান।

১। এসো এসো বসন্ত এ কাননে। ২। এ কি আকুলতা ভবনে। ৩। সে আসে ধীরে যায় লাজে ফিরে। ৪। আহা জাগি পোহাল বিভাবরী। ৫। তুমি যেও না এখনি, এখনও আছে—প্রভৃতি। পুনর্ব্বসন্তের গান।

'বসন্ত লীলা' গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথের গান—

১। ওগো শোনো কে বাজায়। ২। মরিলো মরি আমায় বাঁশীতে ডেকেছে। ৩। (সখি) ঐ বুঝি বাঁশী বাজে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কেবল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সেবারই গুরু নহেন, তাঁহার সঙ্গীত সাধনারও গুরু। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পারিবারিক সঙ্গীত সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতের পূর্ণ-পরিণতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই প্রত্যক্ষ এবং স্নেহঘন সহযোগিতায় সাধিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গানগুলি তাঁহার অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রনাথের সমবেত প্রচেষ্টায় সৃষ্ট। ইংরাজী সুরকে প্রথম বাংলা গানে ব্যবহার, গীতিনাট্যের সৃষ্টি, হিন্দী সুরের আনুরূপ্যে বাংলা বাণী সংযোজন, নূতন ধারায় নূতন পদ্ধতিতে স্বরলিপি প্রবর্ত্তন, নূতন ছন্দের সৃষ্টি প্রভৃতি বহু বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই প্রথম হাত দিয়াছিলেন, তিনিই রবীন্দ্রনাথের সুর সংশোধন করিয়াছিলেন, তাঁহার গানে সুর যোজনা করিয়াছিলেন—এক কথায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের উৎসমুখ উন্মুক্ত করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

রবি স্বয়ং তাঁহার সুরগুরু বৃহস্পতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন এইভাবে—"তখন আমার অল্প বয়স, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা ব্যথা মাত্র ছিল না, আমাদের বাড়ীতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সঙ্গীতের অবিরল বিগলিত ঝরণা ঝরিয়া তাহার শীকর

বর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রঙ্ ছড়াইয়া দিতেছে, তখন নব যৌবনের নব নব উদ্যম নূতন নূতন কৌতূহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে··· ··আমার সেই কুড়ি বছরের বয়সটাতে এমনি করিয়া পদক্ষেপ করিয়াছি। সেদিন এই যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন দুর্দ্দম উৎসাহে দৌড় করাইয়াছিলেন, তাহাব সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা। এমনি করিয়া ভিতরে বাহিবে সকল দিকেই সমস্ত বিপদের সম্ভাবনার মধ্যেও তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন, কোনো বিধি বিধানকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই এবং আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে তিনি সঙ্কোচমুক্ত করিয়া দিয়াছেন।”

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতন জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরও হাসির গানের সুনাম ছিল। এই শ্রেণীর একটি গান।

বল বল প্রিয়ে বল, আলুর আজ ভাও কি ?
কত হ'ল সের আজি পটোলের বল দেখি।
কবে চাল সস্তা হবে, বস্তা বস্তা বিকাইবে,
গমের দরটা সুগম হবে, ধস্তা-ধস্তি যাবে সখি।
মাগ্গি হয়েছে বেগুন, একেবারে আগুন,
তাতে আবার খাঁক্তি নুণ, কিসে বল প্রাণ রাখি।
কচুপোড়া খেয়ে খেয়ে, দেহটা যাচ্চে ক্ষয়ে ক্ষয়ে
এখন শুধু চিড়ে খই'য়ে যা' কিছু ভরসা সখি॥

বলা বাহুল্য দ্বিজেন্দ্রলালের অসামান্য বাক্‌পরিপাট্য জ্যোতিবাবুর ছিল না।

প্রাকৃত ও সংস্কৃত নাটকের শ্লোকগুলি জ্যোতিবাবু কবিতাতেই অনুবাদ করিয়াছেন। কর্পূর মঞ্জরী হইতে ২।৪টি শ্লোকের অনুবাদ-নিদর্শন নিম্নে দেওয়া হইল—

১। বিম্বোট্টে বহলং ন দেন্তি মঅনং ণো গন্ধতেল্লাইরা
বেণীও বিরঅন্তি লেন্তি ণ তহা অঙ্কম্মি কুপ্পাসঅং
জংবালা মুহকুঙ্কুমম্মি বি ঘণে বট্টন্তি ঢিল্লা অরা
তং মন্নে সিসিরং বিনিজ্জিঅ বলা পত্তো বসন্তুসবো॥
ষোড়শী বালারা এবে বিম্বওষ্ঠে নাহি দেয় বহল মদন।
সুরভিত তৈল দিয়া এবে দেখ নাহি করে বেণীবিচরণ
শীতবস্ত্র দূরে থাক অঙ্গে কঞ্চুলিকাটিও না করে ধারণ।
কুঙ্কুম মাখিতে মুখে যতনের হয়েছে লাঘব
তাই বলি, শীতে জিনি আবির্ভূত বসন্ত উৎসব।

২। পণ্ডীণং গণ্ডবালীপুলঅণচবলা কঞ্চিবালা বলাণং
মাণং দোখণ্ডঅন্তা বদিরহ সঅরা চোড় চোড়া লআণং।
কণ্ণাডীণং কুণন্তা কুরলতবলণং কুন্তলীণং পিএস্থং
গুম্ফন্তা ণেহগণ্ডিং মলঅ শিহরিণো সিংধলা এন্তি বাআ॥

পাণ্ড্যদেশ-কামিনীর গণ্ডদেশ মাঝে করি পুলক বিস্তার
কাঞ্চীদেশ-রমণীর খণ্ডি মান প্রাতঃসন্ধ্যা দুই দুই বার,
লোলা চোলাঙ্গনাদের সুরত উৎসব কেলি করিয়া প্রবল,
কর্ণাট অঙ্গনাদের কুঞ্চিত কুন্তলরাশি করায়ে চঞ্চল,
কুন্তলবাসিনীদের কান্ত সনে স্নেহগ্রন্থি করিয়া বন্ধন,
মন্দ মন্দ বহে কিবা মলয়শিখরবাসী শীতল পবন।

৩। পবং জোণ্‌হা উণ্‌হা গবলসবিসো চন্দনরসো
খরক্খারো হারো রঅণিপঅণা দেহতবণা।
মুণালী বাণালী জলইঅ জলদ্দা তণুলদা
বরিট্ঠা জং দিট্ঠা কমলবঅণা সা সুণঅণা।
জ্যোছনা কত না উষ্ণ, চন্দন সে গরলের প্রায়।
হার সে ক্ষতের ক্ষার দেহ দহে রজনীর বায়।
মৃণাল করাল বাণ, জলে শুধু তনুলতা জ্বলে।
যদবধি হেরিয়াছি সে পঙ্কজ বদনমণ্ডলে॥

উত্তরচরিত হইতে দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিই—

১। অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যদ্
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎস্নেহসারে স্থিতম্
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে।
সুখে দুঃখে সমরূপ অনুকূল সর্ব্ব অবস্থায়
হৃদয়-বিশ্রাম-স্থল জরাতেও যাহা না শুকায়।
কালক্রমে রূপমোহ আবরণ হইলে বিগত
রসটুকু মরি' আহা স্নেহসারে হয় পরিণত,
সেই সে পবিত্র প্রেম পুণ্যবলে কদাচ কখন,
বহু সজ্জনের মাঝে কারো ভাগ্যে হয় সংঘটন।

২। চিরাদ্বেগারম্ভী প্রসৃত ইব তীব্রো বিষরসঃ
কুতশ্চিৎ সংবেগশ্চলিত ইব শল্যস্য শকলঃ।
ব্রণোরূঢগ্রন্থিঃ স্ফুটিত ইব হৃন্মর্ম্মণি পুন
র্ঘনীভূতঃ শোকো বিকলয়তি মাং মূর্চ্ছয়তি চ।
বহুকাল পরে পুন তীব্রতর পূর্ব্ব বিষরস
নববেগে সঞ্চারিয়া সর্ব্ব অঙ্গ করিছে অবশ।
তীক্ষ্নধার শল্যখণ্ড বিদ্ধ করি' এ মোর হৃদয়,
সবেগে করিছে যেন ছুটাছুটি সর্ব্ব দেহময়।

রুদ্ধমুখ মর্ম্মব্রণ ফুটিয়া আবার দেখা যায়,
ঘনীভূত শোক মোরে বিমোহিছে নূতনের প্রায়।

৩। কুবলয়দল-স্নিগ্ধশ্যামঃ শিখণ্ডকমণ্ডনো
বটুপরিষদং পুণ্যশ্রীকঃ শ্রিয়েব সভাজয়ন্।
পুনরিব শিশুর্ভূতো বৎসঃ স মে রঘুনন্দনো
ঝটিতি কুরুতে দৃষ্টঃ কোঽয়ং দৃশোরমৃতাঞ্জনম্॥
পদ্মপত্র-স্নিগ্ধশ্যাম, শিরোদেশে শিখণ্ড বিরাজে।
পুণ্যশ্রীতে শোভা পায় আশ্রমের বালকসমাজে।
ধরে কি শিশুর রূপ পুন বৎস সে রঘুনন্দন ?
যেন ওরে দৃষ্টিমাত্র নেত্র ধরে অমৃত-অঞ্জন।

৪। দদতু তরবঃ পুষ্পৈরর্ঘ্যং ফলৈশ্চ মধুশ্চ্যুতঃ
স্ফুটিত কমলামোদ প্রায়াঃ প্রবান্তু বনানিলাঃ।
কলমবিরলং রত্যুৎকণ্ঠাঃ ক্বণন্তু শকুন্তয়ঃ
পুনরিদময়ং দেবো রামঃ স্বয়ং বনমাগতঃ॥
দাও সবে তরুগণ সুমধুর ফলপুষ্পে অর্ঘ্য উপহার,
যাও বহি বনবায়ু প্রস্ফুটিত কমলের লয়ে গন্ধভার।
আনন্দে উৎকণ্ঠ হয়ে পক্ষিগণ হেথা গান গাও অবিরাম।
আবার এ বন মাঝে দেখ দেখ এসেছেন রঘুপতি রাম।

শ্লোকগুলির অনুবাদ যতদূর সম্ভব সহজ সরল ও যথাযথ। আমরা আজকাল যাহাকে আয়ত পয়ার বলি এই আঠারো মাত্রার পয়ার এবং যাহাকে বাইশ মাত্রার দীর্ঘ দ্বিপদী বলি সেই ছন্দ জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই প্রবর্ত্তিত বলা যায়। এই দুই ছন্দ জ্যোতিবাবুর লেখনীতে আসিয়াছিল শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, স্রগ্ধরা, শিখরিণী ইত্যাদি ছন্দের শ্লোকের অনুবাদ করিতে গিয়া। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতাই এই দুই ছন্দে রচিত। অবশ্য বলিতে পারি না, এই শ্লোকগুলিব অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের হাত কতটা ছিল। তবে রবীন্দ্রনাথ যে সংস্কৃত নাট্যগুলির মধ্যস্থ চমৎকার শ্লোকগুলির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, জ্যোতিবাবুরই মারফতে, তাহা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। জ্যোতিবাবু বিদ্ধশালভঞ্জিকার একটি শ্লোকের এইভাবে অনুবাদ করেন—

পঞ্চশর কামে যবে করিলেন ভস্মীভূত দেব মহেশ্বর।
প্রজাপতি সৃজিলেন নিরমম অন্য এই অভিনব স্মর।
ইতস্ততঃ বিনিক্ষিপ্ত তারি এই শত শত বাণ,
আপুঙ্খ সর্ব্বাঙ্গ পশি দেহ হ'ল কদম্ব সমান।

এইরূপ শ্লোকের সহিত তরুণ রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কবিকল্পনাকে কতটা নিয়ন্ত্রিত

করিয়াছিল বলা কঠিন। তবে মনে হয় জ্যোতিবাবুর নাট্যানুবাদগুলি রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উন্মেষ সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের সামসময়িক ও পরবর্ত্তী কবিদের কাব্যে বড় বেশি দেখা যায় না। তাঁহাদের সঙ্গে সংস্কৃতসাহিত্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা যদি জ্যোতিবাবুর অনুবাদগুলির সহিতও পরিচিত হইতেন, তাহা হইলে দেশীয় ভাব তাঁহাদের রচনায় যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চারিত হইতে পারিত।

জ্যোতিবাবু গীতিনাট্য রচনার একটা অভিনব আদর্শ দিয়াছিলেন।

ইহাতে রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা ছিল সে কথা আগেই বলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ জ্যোতি-বাবুর প্রবর্ত্তিত আদর্শেরই উৎকর্ষ সাধন করেন, তাঁহার গীতিনাট্যগুলিতে।

জ্যোতিবাবুর আগে ফরাসী সাহিত্যের অনুবাদ কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। ফরাসী সমাজতন্ত্র ও দর্শনের সঙ্গে ইংরাজিভাষার মারফতে আমাদের দেশের মনীষীরা পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ফরাসীসাহিত্যের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে নাই। জ্যোতিবাবুই ফরাসীসাহিত্যের দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফরাসী কথা সাহিত্যের প্রভাব সম্ভবতঃ জ্যোতিবাবুর মারফতেই রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প রচনায় সঞ্চারিত হইয়াছিল।

জ্যোতিবাবুর প্রধান অবদান দেশকালে দূরবর্ত্তী সাহিত্যের সহিত বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা।

স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দের সাধনা দেশের ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, রাজনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে বিস্তাব লাভ কবিয়াছে—সমস্ত ক্ষেত্রেই তাহা নব ভাব ও নবজীবন সঞ্চাব কবিয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রভাব সামান্য নয়। তিনি গল্প উপন্যাস লেখেন নাই, কবিতা লেখেন নাই, নাটক লেখেন নাই, তবু তিনি একজন খুব বড সাহিত্যিক। তিনি যুক্তি-মূলক প্রবন্ধ অনেক লিখিয়াছেন—সেগুলি সাহিত্যের পদবীতে পড়ে না। সেগুলি ধর্ম্মতত্ত্বের গণ্ডীতেই পড়ে। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতাগুলি, পত্রাবলী এবং আবিষ্ট অবস্থার উক্তিগুলি হৃদয়ের অন্তস্তলের গভীর ভাব ও অনুভূতির উচ্ছ্বাস—এগুলি অতি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য। তিনি দেশ বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিযাছেন, কাজেই তাঁহার অধিকাংশ বক্তব্য ইংরাজিতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেগুলির বাংলায় যথাযথ অনুবাদ হইয়াছে কাজেই তাহার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন হইয়াছে। সংস্কৃতে ও বাংলায ছন্দোবদ্ধ রচনাও তাঁহার কিছু কিছু আছে—সাধারণতঃ তাহা ভগবানেব উদ্দেশে স্তবস্তুতি মাত্র। আমি সে-সবকে সাহিত্য বলিতেছি না। তাঁহার ছন্দে দুইটি চরণ—তাঁহার ধর্ম্মমতের মূলসূত্র—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যে জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

লোকশিক্ষাদানের জন্য তিনি পুরাণ হইতে কতকগুলি গল্প লিখিযাছেন—সেগুলিব মধ্যে জড়ভরত, স্বর্ণ নকুলের গল্প ইত্যাদি ছাত্রগণেবও পরিচিত। তাঁহার বচিত বা শ্রীমুখ নিঃসৃত সাহিত্যের পরিমাণ ও মূল্য যাহাই হোক, তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে যে প্রভাব ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন,—সাহিত্যের ভাব, ভাষা, প্রগতি ও আদর্শের দিক হইতে তাহার তুলনা নাই।

বিবেকানন্দ শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন পরমহংসদেবের চরণতলে। স্বকীয় গুরুর জীবনবাণীরই তিনি ব্যাখ্যা ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই বাণীই তাঁহার মুখে নব-কলেবর লাভ করিয়া বাংলার জাতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যে নবজীবন সঞ্চার করিযাছে। স্বামীজি বলিয়াছেন—

"আমি ঈশ্বরকৃপায় এমত এক ব্যক্তির পদতলে শিক্ষালাভের সৌভাগ্য লাভ ক'রেছিলাম, যাঁর উপদেশ অপেক্ষা জীবন সহস্রগুণে উপনিষদ্ মন্ত্রের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ। উপনিষদের ভাবগুলি প্রকৃত পক্ষে যেন মানবরূপ ধ'রে মহাসমন্বয় লাভ করেছে। এই সমন্বয়ের ভাব আমার ভিতরেও কিছু এসেছে। আমি জানি না জগতের সমক্ষে তা প্রকাশ করতে পারব কি না।"

দ্বিধাভরেই তিনি প্রথম সাধনাক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, কিন্তু এ দ্বিধা তাঁহার পরে আর ছিল না। গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই তিনি তাঁহার উপলব্ধ সত্যকে প্রচার করিয়াছিলেন।

পরমহংসদেব নিজেই একদিন বলিয়াছিলেন—"নরেনের নিজের জ্বলন্ত আত্মবিশ্বাসই আর সকলের অবসন্ন চিত্তে নষ্টবিশ্বাস ও সাহস ফিরিয়ে আনবে।" স্বামিজী এই আত্মপ্রত্যয়ের অভাবকেই তামসিকতা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আত্মবিশ্বাসের মহিমাকীর্ত্তন করিয়া তিনি পরে ভারতী সম্পাদিকাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"আত্মশক্তিতে বিশ্বাস মানুষের ভিতরের দেবতাকে প্রকাশ করে। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসসম্পন্ন মাত্র কয়েকটি লোকের জীবনকাহিনী দ্বারাই জগতের ইতিহাস রচিত।

আমরা আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছি, তাই আমাদের এত অবনতি। আমরা চাহি শ্রদ্ধা ও নিজের প্রতি বিশ্বাস। শক্তিই জীবন, দুর্ব্বলতাই মৃত্যু।

এক্ষণে রাজা কোন সামাজিক বিষয়ে হাত দেন না। অথচ ভারতীয় জনমানবের আত্মনির্ভর দূরে থাকুক আত্মপ্রত্যয় পর্য্যন্ত অণুমাত্র জন্মে নাই। যে আত্মপ্রত্যয়ে বেদান্তের ভিত্তি, এখনো ব্যবহারিক অবস্থায় কিছুমাত্র পরিণত হয় নাই। কেবল শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা। শিক্ষা বলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়ের বলে তাহাদের (ইউরোপের কৃষক ও শ্রমিকদের) অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন—আর আমাদের ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হইতেছেন।" এই বলিয়া তিনি নিউইয়র্কের আইরিশ উপনিবেশের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"আইরিশম্যানকে তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণায় ঘিরিয়া রাখা হইয়াছিল। সমস্ত প্রকৃতি একসঙ্গে বলিয়াছিল—'প্যাট, তোর আর আশা নেই, তুই জন্মেছিস গোলাম। থাক্‌বি গোলাম।' আজন্ম এককথা শুনিয়া প্যাটেরও বিশ্বাস হইল, তাহার মনেও ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, সে অতি নীচ অধম, তাহার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক হইতে ধ্বনি উঠিল—"Pat, তুমিও মানুষ, আমরাও মানুষ। মানুষেই ত সব করেছে। তোমার আমার মত মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ।" Pat ঘাড় তুলিল, দেখিল ঠিক কথাইত। তাহার ভিতরের ব্রহ্ম প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।"

বিবেকানন্দের প্রচারিত এই আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধনবাণী বাংলার জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যে কি শক্তি সঞ্চার করিয়াছে তাহা একটা বড় থিসিসের বিষয়বস্তু। বিবেকানন্দ ভারতের চির পুরাতন আর্যবাণীকে আবার উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া বলিয়াছেন—

"সকল মানুষের মধ্যেই ব্রহ্ম বিরাজ করছেন অর্থাৎ "মানুষে মানুষে নাহিক তফাৎ সকল মানুষই ব্রহ্মময়।" এই দুনিয়ায় কোন মানুষই উপেক্ষণীয় নয়, মানুষকে ঘৃণা করার নামই পাপ—অধর্ম্ম। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের মূলমন্ত্রই ত হইয়াছে ইহাই।

আমরা সাহিত্যিকমাত্রেই ত স্বামীজির পরম ভক্ত, আমরা তাঁহাকে যুগত্রাতা বলিয়া বিশ্বাস করি। কেবল তাহাই নয়, স্বামীজির প্রচারিত ধর্ম্মই এখন আমরা বর্ত্তমান যুগে ভারতবাসীর আসল ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি। শরৎচন্দ্রের রচনায় স্বামীজির বাণীই ওতপ্রোত-ভাবে অনুস্যূত। স্বামীজির বাণীই বর্ত্তমান যুগের কাব্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ হইতে কাজী নজরুল পর্য্যন্ত বাংলার কবিরা স্বামীজির বাণীকেই ছন্দোরূপ

দিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের তরুণ সম্প্রদায়ও স্বামীজির বাণীকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। আজ রুসিয়া হইতে যে বাণী লাভ করিয়া তরুণ সাহিত্যিকরা অভিনব সাহিত্য রচনা করিতেছেন, সে বাণীত বিবেকানন্দ অনেক আগেই তাঁহার রচনা ও রসনায় ঘোষণা করিয়াছেন। তরুণ সম্প্রদায় বিবেকানন্দের রচনাবলী আগে পড়ে নাই, পড়িয়াছে বিদেশী বইগুলি। তাই মনে করে ইউরোপ বিশেষতঃ রুসিয়া বুঝি নূতন সত্যের প্রচার করিল! তবে বিবেকানন্দের প্রচারিত সত্য বেদান্তের ব্রহ্মবাদ ও মানবিক হৃদয়বত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। রুসিয়ার বাণীর সত্য নিরীশ্বরতা ও বুদ্ধিবৃত্তির ভিত্তির উপর স্থাপিত। তরুণ সমাজ ধর্ম্মবিমুখ, তাই সম্ভবতঃ তাহাদের দৃষ্টিকে ঘর হইতে বাহিরে ঘুরাইয়াছে। আমরা তরুণ সাহিত্যিকদের সাহিত্যে যে সত্যের ঘোষণা শুনিতে পাই, তাহা বিবেকানন্দের রচনাতেই অনেক আগেই পাইয়াছিলাম।

আজ সকলেই স্বীকার করেন—মাটীর খাঁটি মালিক জমিদার, উকিল, ডাক্তার, মহাজন, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, অধ্যাপক ইত্যাদি নয়, খাঁটি মালিক চাষী, নেয়ে, জেলে, মুটেমজুরদেরই দল। আজ যে জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যে তাহাদের মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা স্বীকৃত হইতে চলিয়াছে, তাহার সূত্রপাত হইয়াছে বিবেকানন্দের ঘোষণাতেই। আজ যে শ্রমিকদের যথাযোগ্য অধিকারপ্রতিষ্ঠার জন্য দেশের রাজনীতি, সাহিত্য, সর্ব্ববিধ রাষ্ট্রিয় প্রতিষ্ঠান সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিতেছে, সেই শ্রমিকদের স্বামীজি কি মর্য্যাদা দিয়াছেন, শোন—

উচ্চবর্ণের ভারতবাসীদের আহ্বান করিয়া স্বামীজি বলিয়াছেন—"চাষাভূষা, তাঁতী, জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য বিজাতি-বিজিত স্বজাতি-নিন্দিত ছোটজাত, তারাই আবহমান কাল নীরবে কাজ ক'রে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমের ফল তারা পাচ্ছে না।

তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির গড়েছেন, তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে—আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি, তাদের গুণগান করে কে? লোকজয়ী কর্ম্মবীর, রণবীর, কাব্যবীর সকলে চোখের উপর সকলের পূজ্য, কিন্তু কেউ যেখানে দেখেনা, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, যেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্য্যকারিতা, সেখানে গরীবেরা তাহাদের ঘরদুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্ত্তব্য ক'রে যাচ্ছে—তাতে কি বীরত্ব নেই?"

অন্যত্র স্বামীজি ভারতবর্ষের শ্রমিকদের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন—

"যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব তাহারা কোথায়? সমাজে যাহারা সর্ব্বাঙ্গ হইয়াও সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে "জঘন্যপ্রভবো" বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি বৃত্তান্ত? যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে "জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদি" ভয়াল দণ্ড সকল প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই "চলমান শ্মশান", ভারতের সেই "ভারবাহি পশু" সে শূদ্র জাতির কি গতি?"

তারপর তিনি শ্রমিকদের আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—"বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সাম্‌নে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও

নিষ্কাম হয়, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্য্যে সকলের অজানতেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী, তোমাদের প্রণাম করি।"

দীনদরিদ্র চির অবজ্ঞাত মুটেমজুরদের উদ্দেশেও প্রণিপাত করিতে পারেন একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ। স্বামীজি তাহাদের উদ্দেশে প্রণাম জ্ঞাপন করিয়া আমাদের শিখাইয়াছেন—"তোমরা তাদের ঘৃণা ক'রো না। তাদের মধ্যস্থিত ব্রহ্মকে জাগিয়ে তোল শিক্ষা দিয়ে। যুগ যুগ হ'তে বঞ্চিত ক'রে রেখে তাদেরও সর্ব্বনাশ করেছ, নিজেরও সর্ব্বনাশ করেছ।"
তাই তিনি বলিয়াছেন—

"যে জাতির জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্ব্বনাশ হয়েছে তার মূল কারণ, দেশীয় সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধিকে একশ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজশাসনে ও দম্ভবলে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখা। যদি পুনরায় আমাদের উঠতে হয়, তাহ'লে জনসাধারণের মধ্যে তার প্রচার করেই উঠতে হবে।"

স্বামীজি শ্রমিকদেরই বলিয়াছেন শূদ্রজাতি। তিনি তাহাদের সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন—তাহা ফলিতেছে এবং ক্রমে সম্পূর্ণরূপেই ফলিবে। "কিন্তু আশা আছে। কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদিবর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে ও শূদ্রজাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে। শূদ্রপূর্ণ রোমকদাস ইউরোপ আজ ক্ষাত্রবীর্য্যে পরিপূর্ণ। মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুতপদসঞ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, নগণ্য জাপান খধূপতেজে শূদ্রত্ব দূরে ফেলিয়া ক্রমশঃ উচ্চ বর্ণাধিকার আক্রমণ করিতেছে। আধুনিক গ্রীস ও ইতালির ক্ষত্রতাপত্তি ও তুরস্ক স্পেনাদির নিম্নাভিমুখে পতনও এস্থলে বিবেচ্য।

তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিতই শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াই শূদ্র জাতি যে কেবল বলবীর্য্য বিকাশ করিতেছে, তাহা নহে, শূদ্র-ধর্ম্মকর্ম্ম সহিতই সর্ব্ব দেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।"

স্বামীজির যে উক্তিগুলি আমি উৎকলন করিলাম এইগুলির মর্ম্মকথাই কি বর্ত্তমান যুগে সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য নয়? এমন কি গীতাঞ্জলির মহাকবির রচনার মধ্যেও এই উক্তিগুলিই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাই বলিতেছিলাম, স্বামীজি বর্ত্তমান বাংলার জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যে অভিনব শক্তিভাব সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন।

কুসংস্কারে অন্ধ জাত্যভিমানী স্বদেশীয়দের অনুকরণ দেখিয়া স্বামীজি যেমন ব্যথিত হইয়াছেন বিদেশী সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ দেখিয়াও তিনি তেমনি ব্যথিত হইয়াছেন। তিনি বলিতেন, অনুকরণ স্বদেশীরই হউক, আর বিদেশীর হউক অনুকরণে কোন জাতি বড় হয় না। নিজের আত্মার অন্তঃসুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হয়। তিনি বলিয়াছেন—

"নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্য ভাষা, ভাব, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন হইব। প্রাচীন ভারত বলিতেছেন—মূর্খ, অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না। অর্জ্জন না করিলে কোন

বস্তুই নিজের হয় না। পাশ্চাত্য অনুকরণমোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে বুদ্ধি, বিচার, শাস্ত্র অথবা বাদপ্রতিবাদের দ্বারা ভালমন্দের জ্ঞান নিষ্পন্ন হয় না। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা যে ভাবের বা যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল, তাহারা যাহা নিন্দা করে তাহাই মন্দ! হা ভাগ্য! ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কি হইতে পারে? * * যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয় বেশভূষামণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয় বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনার স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত।"

কেবল আহার বিহার, আচার বিচার ও ভাষাভূষায় নয়, উনবিংশ শতাব্দীর অনুকৃতি সর্ব্বস্ব সাহিত্য সৃষ্টি সম্বন্ধেও স্বামীজির এই উক্তি প্রযোজ্য।

বিবেকানন্দ ছিলেন একাধারে জ্ঞানী, কর্ম্মী ও প্রেমিক। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন—তাই তিনি অস্পৃশ্য দীন হীন অধম পতিতের মধ্যে ব্রহ্মকে পূজা করিয়াছিলেন, তিনি কর্ম্মবীর ছিলেন বলিয়া তাহাদের সেবার জন্য ও তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য মিশনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সেবাধর্ম্মের মূলে কি শুধু ব্রহ্মজ্ঞান?—না, তাঁহার অসীম অপরিমেয় মানবপ্রেমই ছিল ইহার মূলে? তাঁহার অন্তরে ছিল অগাধ অপার প্রেমের পারাবার। এই পারাবারের উত্তাল তরঙ্গে তাঁর হৃদয়ের তটভূমি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত। ইনি স্বামী তুরিয়ানন্দকে একবার বলিয়াছিলেন—

"আমি সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছি আমার বুক ভেঙ্গে গেছে। জনগণের কি ভীষণ দারিদ্র্য, কি শোচনীয় দুর্দ্দশা দুচোখে দেখলাম! আমার কান্না থামছে না। এখন বুঝেছি ধর্ম্মপ্রচার করবার সময় এ নয়। এই দারিদ্র্য ও দুর্গতি আগে নিবারণ করতে হবে।"

আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসার পরে মান্দ্রাজের এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন—

"তোমাদের প্রাণে কি একবারও এ কথাটা জাগে না এই দেশের কোটি কোটি নরনারী কতকাল ধ'রে ঘৃণিত পশুর মত চরম দারিদ্র্য ও চরম দুর্দ্দশা ভোগ করছে? সে চিন্তা কি তোমাদের অস্থির ক'রে তোলে? আহারনিদ্রা ত্যাগ করায়? দেশের এই দুর্গতিমোচনের জন্য তোমরা কেউ কি নামধাম, ধনজন, পুত্রপরিবার এমন কি নিজের দেহের প্রতি মমতা ত্যাগ করতে পার? এই জীবন্মৃত অভাগাদের উদ্ধার করবার কোন উপায় কোন পন্থা কি তোমরা স্থির করেছ? সেই বজ্রকঠিন সংকল্প কি তোমাদের আছে? যার বলে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাও নিমেষে অপসারিত হয়? সমগ্র জগৎ যদি তরবারি হস্তে তোমার পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায়, তবু তুমি যা সত্য মনে করেছ তা সাধন করতে কিছু মাত্র ভীত হবেনা—মনের এই বল ও প্রাণের সেই প্রেম যদি থাকে—তবে ত তোমাদের যে-কেউ অতিশয় অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারবে।"

ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের বীজত এই বাণীতেই নিহিত। এই বাণীর মন্ত্রে যাহার দীক্ষা, সেইত আসল দেশ-প্রেমিক, সেইত আসল বীর, তাহার প্রাণপাত সাধনাতেই আমাদের মুক্তি। বাকি যত দেশনেতা, তাহারা শুধু দলাদলি বাধাইবার এবং জাতীয় জীবনের শক্তিক্ষয়ের গুরুগোসাঁই। দেশের মুক্তি তাহাদের কাম্য নয়, স্ব স্ব প্রভাব প্রতিষ্ঠাই তাহাদের কাম্য।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদের সাহিত্যে যে মুক্তিপিপাসা ও পরাধীনতার অমর্ষ প্রধান উপজীব্য হইয়াছে, তাহার প্রেরণা আসিয়াছে বঙ্কিমের রচনা ও স্বামীজির রচনা হইতে। পরাধীনতার শাপে ভারতীয় সংস্কৃতির অধোগতি বঙ্কিমকে এবং পরাধীনতার চাপে তাহার সঙ্গে ভারতীয় জনগণের দৈন্যদুর্গতি স্বামীজিকে বিচলিত করিয়াছিল।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামীজি যে উদারতার কথা বলিয়াছেন তাহাই বর্ত্তমান যুগের মনীষীরা অনুসরণ করেন। সাধারণ লোকেও যে দিন এই সত্য উপলব্ধি করিবে, সে দিন ধর্ম্মকলহের নিবৃত্তি হইবে। এই উদার মত উপলব্ধি করিলে ষ্টেটকে যে Secular বলিয়া ঘোষণা করিতেও হয় না, নিরীশ্বর ভিত্তিতেও জাতি গঠন করিতে হয় না।

স্বামীজি বলিয়াছেন "প্রেম, পুণ্য ও পবিত্রতা কোন ধর্ম্মেরই একমাত্র নিজস্ব সম্পদ নহে। প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজ হইতেই মহামানব ও মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়াছেন। যদি কেহ মনে করেন,—একমাত্র আমার ধর্ম্মই বাঁচিয়া থাকিবে ও অন্য ধর্ম্ম লোপ পাইবে, আমি তাহাকে কৃপার পাত্র বলিয়া মনে করি। সংগ্রাম নয়,—সহায়তা, ধ্বংস নয়,—সমীকরণ ; কলহ নয়,—সমন্বয় ও শান্তি। অতীতের আলোক গ্রহণ করিয়াছি, বর্ত্তমানের আলোক উপভোগ করিতেছি, ভবিষ্যতের আলোকের জন্য হৃদয়ের সমস্ত জানালা খুলিয়া রাখিব। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদের নমস্কার।"

কেবল ধর্ম্ম নয়, নীতি সম্বন্ধেও স্বামীজি উদার মত প্রচার করিয়াছেন।

স্বামীজি বলিয়াছেন—"সকল কার্য্যেই ভ্রমপ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিত হয়, ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য। বৃক্ষ ভুল করে না, প্রস্তরখণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রমপ্রমাদ সঙ্কুল নরকুলেই।"

এমন কথাও স্বামীজি বলিয়াছেন—"মানুষ ভুল করে, মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ অন্যায় করিয়া বসে—আমরা সে সমস্তকেই পাপকার্য্য বলিয়া মনে করি। তাহাকে জ্ঞান দাও, তাহাকে সুপথ দেখাও, সে ধার্ম্মিক হইবে।"

এইরূপ উদারচিন্তন (Catholisism) হইতেই ক্ষমাশীলতার (Toleration) জন্ম। এই ক্ষমাশীলতা বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যধর্ম্মের একটি উপজীব্য।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তার, বৈজ্ঞানিক শিল্পের প্রতিষ্ঠান, মহাজনী কারবার ও কল-কারখানার আক্রমণে যে দেশে স্বচ্ছন্দ শুচি শান্ত জীবন ধ্বংস পাইবেই—এ সত্য স্বামীজি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথের মনোভাব আগেই বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছিলেন 'গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে'।

স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"বলি এই বেলা গঙ্গামার শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্যদানবের হাতে প'ড়ে এসব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠ্‌বেন—ইটের পাঁজা, আর নামবেন ইটখোলার গর্ত্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট-ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে—সেখানে দাঁড়াবে পাটবোঝাই ফ্ল্যাট, আর

সেই গাদাবোট। আর ঐ তালতমাল আমলিচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার এসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি।"

এই যে বিধাতার শ্যামসুন্দর নয়নতর্পণ সৃষ্টি, ইহা ধোঁয়া ও ধূলায় আঁধার হইয়া যাইবে—এই আশঙ্কা স্বামিজীর কবিচিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। এই ব্যাকুলতাও বঙ্গ-সাহিত্যের বিবিধ সাহিত্যে সঞ্চারিত হইয়াছে।

বাঙ্গালী শুনিয়া আসিতেছিল বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের 'বাঁশী', কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণের 'বাণী'তে সে বড় কান দেয় নাই। বিবেকানন্দ বলিলেন—বাঁশীতো এতকাল শুনিয়াছ—এবার বাণী শোন, নতুবা তোমাদের রক্ষা নাই। তাঁহার উক্তি এই—

"অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা। কথা ত বেশ; তবে শাস্ত্র বল্‌ছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি ফিরিয়ে না দাও, তুমি পাপ করবে। 'আততায়িনং উদ্যন্তং' ব্রহ্মবধেও পাপ নাই, মনু বলেছেন। এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। বীর্য্যপ্রকাশ কর, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্ম্মিক। আর ঝাঁটালাথি খেয়ে, চুপটি ক'রে, ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের সত্য। সত্য, সত্য, পরম সত্য, স্বধর্ম্ম কর হে বাপু। অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে অর্থোপার্জ্জন ক'রে স্ত্রী-পরিবার প্রতিপালন, দশটা হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে ত তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও—আবার 'মোক্ষ'! অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—

"ইউরোপীদের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন যে, নির্বৈর হও, এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও, কাজকর্ম্ম বন্ধ কর * * আর আমাদের ঠাকুর বলেছেন, মহা-উৎসাহে সর্ব্বদা কার্য্য কর, শত্রু নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু 'উল্টা সমঝলি রাম'। ইউরোপীরা যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌লো না।* * আর, আমরা কোণে বসে, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে দিনরাত, মরণের ভাবনা ভাবছি।* * গীতার উপদেশ শুন্‌লে কে? না—ইউরোপী। আর যীশু খ্রীষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কার্য্য করছে কে? না—কৃষ্ণের বংশধরেরা!!"

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মথুরাদ্বারাবতী-কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ। তিনিও শ্রীকৃষ্ণের বাণীই শুনিতে বলিয়াছিলেন—

"প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেন না, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্ত্তা; দশ বার শরীরধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ, মুর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংসশিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা

* * * চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে,—উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্মমাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্ত শক্তিময়।"

বাংলার এই দুই মহাপুরুষই ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মের কথা বাঙ্গালীকে শুনাইয়াছেন। তারপর হইতেই বাংলাসাহিত্যে আমরা পাঞ্চজন্য ধ্বনি মাঝে মাঝে শুনিতে পাইয়াছি। এই দুই মহাপুরুষই এদেশে দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যবোধের দীক্ষাদাতা গুরু। স্বদেশের জন্য, স্বজাতির জন্য এত উদ্বেগ এত উৎকণ্ঠা, পরে যাহারা সাময়িক উত্তেজনায় প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছে তাহাদের মধ্যেও পাই নাই। কেননা, বঙ্কিমের আনন্দমঠের ভাষায় 'প্রাণ তুচ্ছ—ভক্তিই তাহার চেয়ে বড়।'

যে বাঙ্গালীজাতির নব প্রবুদ্ধ জীবনের দীক্ষাগুরু বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ, সে বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য ও রাজনীতি—যদি অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে না পারিয়া থা.ক—তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

বিবেকানন্দের ভারত ভারতমাতা মাত্র নয়, ভাবতব্রহ্ম। বিবেকানন্দের ভারত-ভক্তি এবং এ সম্বন্ধে চরম বাণী উচ্চারিত হইয়াছে নিম্নলিখিত কথাগুলিতে—

"যে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র, ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ,—আমার কল্যাণ; আর বল দিন রাত—'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

স্বামীজি চলতি বাংলা ভাষাকে বক্তৃতা ও সাহিত্যের ভাষা করিয়া তোলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত সাহিত্যিকরা তাহা স্বীকার করেন নাই। বক্তৃতার ত কথাই নাই, আজ তাহাই হইয়াছে সাহিত্যের প্রধান বাহন। স্বামীজি বলিয়াছিলেন—

"চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়েরী ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেইত সমস্ত পাণ্ডিত্য

গবেষণা মনে মনে কর, তবে লেখার বেলায় ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? ······যে স্বাভাবিক ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না, সেই ভাবভঙ্গীই ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। এ ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেই দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়েরী ভাষা কোন কালে হবে না।"

এই চল্‌তি ভাষাতে স্বামীজি অসংখ্য বক্তৃতা করিয়াছেন, শত শত চিঠি লিখিয়াছেন, বহু গভীর তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, হৃদয়ের গভীর গূঢ়গহন ভাবের প্রকাশ দান করিয়াছেন, কোথাও কোন বাধা পান নাই, একটা শব্দের জন্যও তাঁহাকে থামিতে হয় নাই। আগ্নেয়গিরির জ্বালানিঃস্রাবের মত জ্বলন্ত ভাব ও অনুভূতি তাঁহার কণ্ঠ হইতে উদ্গীর্ণ হইয়াছে। মাত্র ষোল বছরের কর্ম্ম-জীবন তাঁহার হাতে ছিল—তাহার মধ্যে তাঁহাকে নব মহাভারত উদ্গীর্ণ করিয়া যাইতে হইয়াছে—এই ভাষা ছাড়া তাহা সম্ভব হইত না। এ ভাষার বেগ যেন উল্কার বেগ। তাঁহার দুর্দম দুর্বার জীবনীশক্তি এই ভাষা ছাড়া কি প্রকাশের পথ পাইত? আমাদের যেন নিশ্বাস রোধ হইয়া আসে, যখন পড়ি—

"সে নীল নীল আকাশ তার কোলে কোনে কালো কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপঝোপ তালনারিকেলখেজুরের মাথা যেন বাতাসে লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলছে, তার নীচে নীচে ঘন ঈষৎপীতাভ, একটু কালো-মিশানো ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়িঢালা আমলিচু জামকাঁঠাল গাছের পাতাই,—শুধুই পাতা—ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশেপাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে দুলছে আর সকলের নীচে। তার কাছে ইয়ারখান্দি, ইরাণী, তুর্কিস্থানের গাল্‌চে দুল্‌চে কোথায় হার মেনে যায়—সেই ঘাস—যতদূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস ইত্যাদি।"

এই উল্কাগতি ভাষা গভীর অনুভূতির বাহন হয়ে স্বামীজির ভাবোচ্ছ্বাসগুলিকে গদ্যকবিতার পদবী দান করিয়াছে। তাই কবিতা না লিখিয়াও স্বামীজি খুব বড় একজন কবি। স্বামীজির রচনার ভাষা ও বাচনভঙ্গী ধর্ম্মব্যাখ্যাতার মত নয়, সাহিত্যিকেরই মত। তাঁহার antithetical dictionএর একটা দৃষ্টান্ত দিই—

"হিন্দু ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে, বিলাতী সোনার বাক্সয় মাটির ডেলা রাখে। হিন্দুর শরীর পরিষ্কার হ'লেই হলো, কাপড় যা হোক। বিলাতীর কাপড় সাফ থাকলেই হ'ল, গায়ে ময়লা রইলই বা। হিন্দুর ঘরদোর ধুয়ে মেজে সাফ, তার বাইরে নরককুণ্ড থাকুক না কেন? বিলাতীর মেজে কারপেটমোড়া, ঝকমকে, ময়লা ঢাকা থাকলেই হ'লো। হিন্দুর পয়নালী রাস্তার উপর, দুর্গন্ধে বড আসে যায় না। বিলাতীর পয়নালী রাস্তার নীচে—টাইফয়েড ফিবারের বাসা। হিন্দু করেছেন ভিতর সাফ, বিলাতী করছেন বাইরে সাফ।"

নিম্নলিখিত অংশকে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলিয়া ভ্রম হয়—

শূদ্রদের কথা দূরে থাকুক ভারতের ব্রাহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্গে, ক্ষত্রিয়ত্ব

রাজচক্রবর্ত্তী ইংরাজে, বৈশ্যত্বও ইংরাজের অস্থিমজ্জায়, ভারতবাসীর আছে কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব। দুর্ভেদ্য তমসাবরণ এখন সকলকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই, আছে প্রবল ঈর্ষ্যা, স্বজাতিবিদ্বেষ, আছে দুর্ব্বলের যেন তেন প্রকারেণ সর্ব্বনাশসাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহন। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য্যপ্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থসাধনে, জ্ঞান অনিত্যবস্তুসংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কর্ম্ম পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মিত্ব কটুভাষণে, ভাষার উৎকর্ষ ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে বা জঘন্য অশ্লীলতা-বিকিরণে।"

বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যে যে সেবাধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তিত হয়—এই সেবাধর্ম্মের সকল দেশে নাম ছিল দয়াধর্ম্ম। খৃষ্টানরা Giving alms to the poorকে ধর্ম্ম মনে করেন—ইহার নাম charity তাহা হইতে সেবা প্রতিষ্ঠানগুলিকে Charitable Institution বলা হয়। অনাথ আশ্রমকে বলা হয় Alms house বৈষ্ণবেরা বলিয়াছেন 'জীবে দয়া নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন।' ইহাই গৃহস্থের ধর্ম্ম। বৈষ্ণবসেবা কিন্তু জীবে দয়া—ইহাই বৈষ্ণবের লক্ষণ। পরমহংসদেবের ইঙ্গিত পাইয়া স্বামীজিই প্রচার করিলেন—দয়া নয়, সেবাই ধর্ম্ম। ব্রহ্ম যাহার মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাহাকে দয়া করিবার স্পর্দ্ধাই ত অধর্ম্ম, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে অস্বীকার। আমরা জীবকে সেবা করিতে পারি, দেবদেবী গুরু ও গুরুজনদের যেমন সেবা করি। জীবসেবাই জীবের অন্তর্নিহিত শিবের উপাসনা। ভগবান ছাড়া কেহ দয়া করিতে পারে না, দয়া করিবার অধিকার আর কাহারও নাই। আমাদের পরম ভাগ্য যে আমরা জীবকে সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছি।" এই সেবাধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা না করিলে স্বামীজির ব্রতের কথা সম্পূর্ণাঙ্গ হয় না।

যুগে যুগে দেশে দেশে যে সকল মহাসাধক, মিষ্টিক, ধর্ম্মগুরু ও সত্যদ্রষ্টার অভ্যুদয় হয়—ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায়, তাহাদের বাণীর ব্যাখ্যান ও প্রচারের জন্য তাঁহাদের তিরোধানের পর এক বা একাধিক মহাপুরুষেরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইঁহাদের জীবনব্যাপী সাধনার ফলেই ঐ ধর্ম্মগুরুগণের জীবন বাণী যুগে যুগে নির্দ্দিষ্ট পরিমণ্ডলের সীমা-গণ্ডী অতিক্রম করিয়া দেশবিদেশে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। ধর্ম্মগুরুগণ তপস্যা, আত্মনিগ্রহ, কঠোর সাধনা ও গভীর ধ্যানযোগে যে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাহা সাধারণতঃ তাঁহাদের স্বচ্ছ সরল শুচিসুন্দর জীবনেই প্রতিবিম্বিত, মুখের কথায় সে সত্যের আভাস ইঙ্গিতমাত্র পাওয়া যায়। অনেক সময় সে কথা প্রহেলিকাময়ী অথবা পরস্পরবিসংবাদী বলিয়াও প্রতীয়মান হইতে পারে। তাঁহাদের মুখের কথা যুক্তিমূলক ক্রম (Logical sequence) অনুসরণ না করিয়া ভাবাবেগ-মূলক ক্রম (emotional sequence) অনুসরণ করিয়া থাকে। সেজন্য তাঁহাদের বাণীর ও জীবন-রহস্যের ব্যাখ্যার (rational interpretationএর) প্রয়োজন হয়। তাঁহাদের মুখের বাগ্‌বস্তুগুলিকে একটি তত্ত্বের সূত্রে গ্রথিত করার জন্য জহুরীর প্রয়োজন হয়।

তাহা ছাড়া, তাঁহারা যত দিন ইহধামে থাকেন, তত দিন তাঁহাদের অলৌকিক ব্যক্তিত্বের

বিভূতি-মৎ সত্তার প্রভাব তাঁহাদের আবেষ্টনীভূত দেশকাল-পাত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ক্রমে কালাত্যয়ে এই প্রভাব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসে। ধর্ম্মগুরুগণের ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাবও ক্রমে অপসারিত হয়, কিন্তু তাঁহাদের জীবন-বাণী থাকিয়া যায়। এই বাণীর ব্যাখ্যাতা ও প্রচারকরূপে যে সকল মহাপুরুষ পরে আবির্ভূত হন—তাঁহারাই ধর্ম্মগুরুগণের ধ্যানলব্ধ সত্যকে নব কলেবর দান করিয়া সমগ্র জগতে সঞ্জীবিত করিয়া রাখেন। এই ভাবে ধর্ম্মগুরুগণের ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক প্রভাব যুগে যুগে দেশে দেশে সক্রিয় থাকে এবং ক্রমে দেশে দেশে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে অনুস্যূত হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—গীতার বাণীর প্রচারক ও ব্যাখ্যাতা ব্যাসদেব। উপনিষদের যুগের ঋষিগণের তপস্যালব্ধ বাণীব ব্যাখ্যাতা যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষি। বুদ্ধদেবের বাণীর প্রচারক রাজর্ষি অশোক, অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি। ব্যাসদেবের উত্তরমীমাংসার ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর প্রচারক নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, রায় রামানন্দ, নরোত্তম ; ব্যাখ্যাতা রূপ গোস্বামী, কবিকর্ণপুর, জীব গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ। খৃষ্টের বাণীর প্রচারক সেণ্টপল, ব্যাখ্যাতা মধ্যযুগের Scholastic philosophers ও মিষ্টিক কবিসাধকগণ। বর্ত্তমান যুগে উপনিষদের বাণীর প্রচারক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথ। পবমহংসদেবেব বাণীর ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক দুইই স্বামী বিবেকানন্দ।

এই সকল ব্যাখ্যাতা ও প্রচারকগণেব মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মগুরুগণের সাহচর্য্য লাভ করেন নাই, তাঁহাদের তিরোধানের অনেক দিন পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে, স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংসদেবের জীবদ্দশাতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি পরমহংসদেবের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং ঐ মহাসাধকের ভাবতন্ময় জীবনটিকে একখানি ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। জামদগ্ন্যের ভগবত্তা যেমন শ্রীবামচন্দ্রে সঞ্চাবিত হইয়াছিল, বিদুরের অন্তঃস্থিত ধর্ম্মপুরুষ যেমন যুধিষ্ঠিরে সঞ্চালিত হইয়াছিল, রামকৃষ্ণের ভাগবতী শক্তি সংক্রামিত হইয়াছিল তেমনি বিবেকানন্দে। পরমহংসদেবের মহাভাগবত জীবন ও বাণীর পরিমূর্ত্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার সংঘর্ষে এ দেশের জীবনধারা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইল। জাতির এই রূপান্তরিত জীবনের ধর্ম্ম-পিপাসা তৎকালে প্রচলিত শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, জৈন, বৌদ্ধ বা বর্ণশ্রম-ধর্ম্ম মিটাইতে পারে নাই। তাই যুগ-সন্ধিক্ষণে বহু মনীষী কোন ধর্ম্মমতের সহিত সেই রূপান্তরিত জাতীয় জীবনের সামঞ্জস্য সাধন করিতে না পারিয়া খৃষ্টান, নাস্তিক, (Agnostic, atheist nihilist, positivist, sceptic) অথবা ব্রহ্মবাদের নামে শূন্যবাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়া সর্ব্ব দ্বন্দ্বের সমাধান করিয়া রূপান্তরিত জীবন-ধারার সহিত সামঞ্জস্য সাধনের দ্বারা বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম-পিপাসা মিটাইয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বিজাতীয় ভাবধারার প্লাবনে রামকৃষ্ণের বাণীই হইয়াছিল একমাত্র ভেলাস্বরূপ। রামকৃষ্ণের সেই বাণীর ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক বিবেকানন্দ। অতএব

বিবেকানন্দ-প্রব্যাখ্যাত ধর্ম্মমতই বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মজগতে একমাত্র পন্থা। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

ভারতের সকল ধর্ম্মের মূল প্রধানতঃ উপনিষদ্ বা বেদান্ত। যত ভেদাভেদ, যত বৈষম্য শাখা-প্রশাখায়, মূলে কোন ভেদ নাই। এই মূলকে আশ্রয় করিলেই সকল ধর্ম্মের সমন্বয় সাধিত হইতে পারে। এই মূলকে আশ্রয় করিলেই সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌম মানবধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ভারতের সকল ধর্ম্মের শাখাপ্রশাখা, আচার-অনুষ্ঠান সাধনপদ্ধতির অভিনব ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। পরমহংসদেব ঐ মূলকে আশ্রয় করিয়া "একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া" তাঁহার জীবনে সর্ব্ব ধর্ম্মের দ্বন্দ্বসমস্যার মীমাংসা করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ সেই অলোকসামান্য জীবন হইতে সঞ্চারিত মীমাংসারই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা দান করিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ নিজেই তাঁহার গুরুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, উপনিষদের ভাবগুলি প্রকৃত পক্ষে যেন মানবরূপ ধরিয়া মহাসমন্বয় লাভ করিয়াছে। সম্ভবতঃ এই সমন্বয়ের ভাব আমার ভিতরেও কিছু আসিয়াছে। আমি জানি না জগতের সমক্ষে উহা প্রকাশ করিতে পারিব কিনা।"

বলা বাহুল্য ইহা তাহার সাধকজনোচিত দৈন্য বা বিনয়।

পরমহংসদেব যাহা জীবনে realise করিয়াছেন, বিবেকানন্দ তাহা rationalise করিয়া জগৎকে বুঝাইয়াছেন এবং materialise করিয়াছেন জীব-সেবায়। কর্ম্মের মধ্য দিয়া ব্যাখ্যা দান করিতে গিয়া তিনি বৈদান্তিক ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক দিকেরও অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছেন। ইহার ফলেই এ যুগে বৈদান্তিক ধর্ম্মের সহিত সেবাধর্ম্মের মিলন ঘটিয়াছে।

বিবেকানন্দ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বলিলে আমরা বুঝিতাম,—লোকসংঘট্ট, মানবসমাজ ও ইহ সংসার হইতে বহুদূরে আত্মসাধনরত আত্মকেন্দ্রিক জ্ঞানযোগী। তাহার চোখে মানুষের সমাজ, সংসার, জীবনমরণ সমস্তই মায়াপ্রপঞ্চ। বিবেকানন্দ সে শ্রেণীর সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি বৈদান্তিক ধর্ম্মকে লোকালয়ের কর্ম্মজগতের মধ্যে রূপায়িত করিতে ও পারমার্থিক সত্যের সহিত ঐহিক জীবনের সংযোগ সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কোন বিরোধ দেখিতে পান নাই। তিনি জানিতেন—আমাদের মধ্যে যে আপাত বিরোধ দেখা যায়, তাহা গ্রন্থগত বা তত্ত্ববিশ্লেষণগত—মানবের জীবনক্ষেত্রে কোন বিরোধ নাই।

তিনি সর্ব্ব জীবের মধ্যে এক আত্মাকে বিরাজিত দেখিতেন অর্থাৎ সর্ব্ব মানবের মধ্যেই তিনি আপনার আত্মাকে অনুভব করিতেন। সেজন্য তিনি মানবাত্মা ও তাহার আশ্রয় মানব-দেহ সম্বন্ধে কখনও উদাসীন হইতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন, ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত, কিন্তু মানবদেহকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম সগুণ ও মানবধর্ম্মোপেত। এইজন্যই জ্ঞানযোগী বিবেকানন্দ মানব-কল্যাণ-সাধনে কর্ম্মযোগী হইয়া আত্মাভিব্যক্তি সাধনের পথ দেখাইয়াছেন।

সমগ্র জগৎই ব্রহ্মময়, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। জড়ে জীবে, স্থাবরে, জঙ্গমে, চরাচরে সর্ব্বত্রই

ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। 'ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।' জড়েও ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। এ সত্য হিন্দুরা কখনও ভুলেও নাই। তাই তাহারা শিলা, মৃৎপিণ্ড, দারুখণ্ডকেও পূজা করিয়াছে। মূর্ত্তিপূজা শিলা-মৃৎ দারু ইত্যাদির অন্তর্বর্ত্তী পরমাত্মারই পূজা। তত্ত্ব হিসাবে ইহা অসত্য নয়। কিন্তু ক্রমে আমরা চিন্ময় ব্রহ্মকে ভুলিয়া মৃন্ময় মূর্ত্তিরই পূজা করিয়াছি। আমরা রথকে, পথকে ও মূর্ত্তিকেই উপাস্য মনে করিয়াছি—তাহাতে অন্তর্যামী হাসিয়াছেন। [রথ ভাবে আমি দেব পথ ভাবে আমি। মূর্ত্তিভাবে আমি দেব হাসে অন্তর্যামী।—রবীন্দ্রনাথ]।

জড়ে সুপ্ত রূপে ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। প্রবুদ্ধ ব্রহ্ম যাহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন—আমরা সেই মানবকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। মূর্ত্তিপূজাতেও মন্ত্রের দ্বারা জড়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে হয়। মানবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয় না। মানবের মধ্যে প্রাণেই চৈতন্যময় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। মানবের মধ্যেই প্রাণময় ব্রহ্ম প্রবুদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। জড়পূজাও যে ব্রহ্মোপাসনা তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "এহো বাহ্য, আগে কহ আর।" যে মানবের মধ্যে ব্রহ্ম প্রাণশক্তিতে প্রবুদ্ধ, সেই মানবকে ভুলিও না, মানবের মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণায়িত। মানব শরীরে যে আত্মা আছেন তাঁহার পূজা পরমাত্মার উপাসনারই একটি প্রণালী। প্রেমপিপাসায় ব্রহ্ম মানুষের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া যেন সেবালাভের জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন।

স্বামীজি বলিয়াছেন—"ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্ব্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? প্রেমের সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস কর।"

দুর্গত দুঃস্থ নিরন্ন আর্ত্ত মানুষের মধ্যে বিরাজ করিয়া তিনি চাহিতেছেন সেবাচ্ছলে আমাদেরই মনুষ্যত্বের পূর্ণাভিব্যক্তি। এই সেবা লৌকিক বা আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মমাত্র নয়। ইহাতেই আমাদের অন্তরে হয় ব্রহ্মত্বের উদ্বোধন এবং আমাদের ব্রহ্মত্ব বিকাশের বাধাবিঘ্নের অপসারণ। সেবার দ্বারা আমরা সর্ব্ব মানবের বিশেষতঃ দীন দুর্গত আর্ত্তগণের মধ্যে, নীচ অধম পতিত হীন দুর্ব্বলের মধ্যেও আমরা আত্মসত্তাকে—পরমাত্মার ঐকিকতাকে (identity) উপলব্ধি করি বলিয়া ইহা আধ্যাত্মিক। এই অনুভূতির নাম ব্রহ্মস্পর্শ লাভ। সেবাধর্ম্মের মধ্য দিয়া আমরা আমাদের ত্যাগোজ্জ্বল মনুষ্যত্বকে অর্থাৎ আমাদের ব্রহ্মত্বকে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করি, সেজন্যও ইহা আধ্যাত্মিক। এইভাবে বিবেকানন্দ জ্ঞানযোগের সহিত কর্ম্মযোগের, বৈদান্তিক ধর্ম্মের সহিত সেবাধর্ম্মের, প্রাচ্যের ধর্ম্মাদর্শের সহিত পাশ্চাত্য ধর্ম্মাদর্শের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ধর্ম্মাদর্শই রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির নিম্নোৎকলিত কবিতায় বাণীরূপ লাভ করিয়াছে :—

ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক প'ড়ে।
রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে॥
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে?
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে দেবতা নেই ঘরে।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি কেটে, করছে চাষী চাষ।
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ খাটছে বার মাস ॥
রৌদ্রজলে আছেন সবার সাথে ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয়রে ধূলার 'পরে ॥
মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি? মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে' বাঁধা সবার কাছে।
রাখ রে ধ্যান থাক রে ফুলের ডালি, ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক ধুলাবালি,
কর্ম্মযোগে তার সাথে এক হয়ে ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে'।

বিবেকানন্দ 'কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে' তাঁরই সেবার জন্য ধূলার পরে দীন দুর্গতদের মধ্যে নামিয়া আসিতে বলিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বৈদান্তিক ধর্ম্মের একাধারে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি, রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, দীনদুর্গতদের মধ্যে যেখানে ভগবান ঘর্ম্মধারায় অভিষিক্ত, সেখান পর্য্যন্ত তাহার প্রণাম নামে না, কাজেই ভগবানের চরণে প্রণাম পৌছায় না। 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা' লইয়া যে সন্ন্যাসী অন্ধকারে সংগোপনে কর্মঠজীবন যাপন করেন, বিবেকানন্দ সে শ্রেণীর সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বর্ত্তমান যুগের আদর্শ সন্ন্যাসী। হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ বেদান্তকে তিনি অরণ্য, পর্ব্বত, তপোবন ও গিরিগুহা হইতে লোকালয়ে দীন দুঃস্থ দুর্গতের সেবায় নিয়োজিত করিয়া আমাদের একাধারে ঐহিক ও পরমার্থিক সদ্‌গতির পথ দেখাইয়াছেন।

বিবেকানন্দ কায়মনোবাক্যে সমগ্র জীবন দিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন—বৈদান্তিক ধর্ম্মের বিকাশ এই সেবাধর্ম্মে। সমগ্র বিশ্বে সর্ব্বভূতে তিনি শুধু ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুভব করেন নাই, জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব মানবের মধ্যে আত্মার ঐকিকত অনুভব করিয়া তিনি ব্রহ্মোপলব্ধিও করিয়াছেন। এই উপলব্ধির ফল সর্ব্ব মানবে সমদৃষ্টি, তাহা হইতে বিশ্বপ্রেম।

অদ্বৈতবাদী রামমোহন বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মোপলব্ধি কতক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। গত এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর কোন কোন মনীষী ব্রহ্মবিদ্যার যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে মনে হইতে পারে তাঁহারা বুঝি ব্রহ্মজ্ঞ। কিন্তু তাহা ব্রহ্মতত্ত্বের বুদ্ধি দিয়া বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। রবীন্দ্রনাথ এই ব্রহ্মবিদ্যাক্ষেত্রে কাব্যসাধনার মধ্য দিয়া বিশ্বপ্রেমের স্তরে আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রেয়োবোধের প্রখরতা না থাকায় এইখানেই তাঁহার বিশ্রান্তি।

বিবেকানন্দ আরও অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিবেকানন্দের দিব্যদৃষ্টি সাধারণ ভাবদৃষ্টি বা রসদৃষ্টি মাত্র নয়—এই দৃষ্টি কর্ম্মে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এই দৃষ্টিই কল্যাণময়ী দৃষ্টি। বিবেকানন্দের বিশ্বপ্রেম নিষ্ক্রিয় ভাবতন্ময়তা মাত্র নয়, ইহা শুভঙ্করী সাধনায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়া সার্থক ও সম্পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে।

স্বামীজি বলিয়াছেন—"যে ধর্ম্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করিতে অথবা অনাথের মুখে এক টুকরা রুটি দিতে না পারে, আমি সে ধর্ম্মে বা ঈশ্বরে বিশ্বাস

করিনা। যত সুন্দর মতবাদ হউক, যত গভীর দার্শনিক তত্ত্বই উহাতে থাকুক, যতক্ষণ উহা মত বা পুস্তকে আবদ্ধ, ততক্ষণ উহাকে আমি ধর্ম্ম নাম দিই না।"

এই শুভঙ্করী সাধনাই বিশ্বমানবের মধ্যে করুণাময় কল্যাণের বিস্তার। ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠাঙ্গ এইখানেই বৈদান্তিক ধর্ম্মের সহিত একীভূত। শুভঙ্করী বৃত্তি বা শ্রেয়োবোধের নির্ব্বিচারে প্রয়োগ বিবেকানন্দের উদ্দিষ্ট ছিল না। যেখানে ঐহিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের একান্ত অভাব সেখানেই অর্থাৎ মূঢ়, জড়, দুঃস্থ, দুর্গত, আর্ত্ত অনাথগণের মধ্যে তিনি এই শ্রেয়োবোধের প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাই সেবাধর্ম্ম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৈষ্ণব ধর্ম্মের 'জীবে দয়া' কথাটি আমাদের ঠাকুর ও স্বামীজির মতে বড়ই স্পর্দ্ধার কথা। জীবকে যে ব্রহ্মময় মনে করে না—সেই দয়া করিবার স্পর্দ্ধা পোষণ করে। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জীবকে দয়ার পাত্র মনে করিতে পারেন না—প্রেমের পাত্রই মনে করেন। কাজেই তিনি দয়া করিতে পারেন না, সেবা করিতেই পারেন। স্বামীজি তাই বলিয়াছেন—"জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" জীবে প্রেম,—জীবে দয়া নয়।

যাহারা কোন ধর্ম্মকেই মানে না, তাহারাও সেবাধর্ম্মকে মানে। তাহারা এই সেবাধর্ম্মকে জীবনী-শক্তির আতিশয্যের (excess of vitality) অথবা পৌরুষশক্তির একটা গৌরবময় অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করে। খৃষ্টানরা ইহাকে স্বর্গলাভের সোপানস্বরূপ মনে করে, বৌদ্ধরা ইহাকে নির্ব্বাণপথের পাথেয় বলিয়া গণ্য করে, হিন্দুরা ইহাকে পুণ্যকর্ম্ম মনে করে। বিবেকানন্দ ইহাকে ব্রহ্মস্পর্শলাভ, ব্রহ্মোপলব্ধি—মানুষের মধ্যে যে ব্রহ্ম আছেন তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ মনে করিতেন।

সেবাধর্ম্মকে যে যে ভাবেই দেখুক—কোন ধর্ম্মের—এমনকি নাস্তিক্যবাদের সহিতও ইহার বিরোধ নাই। ফলে, সর্ব্বদেশের সর্ব্বযুগের মানুষ ইহাকে পরম ধর্ম্ম বলিযাই মনে করে।—যে মূলতত্ত্বে সর্ব্বধর্ম্মের মত-ধারা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে সেই তত্ত্বের ধ্রুব সংস্থানে আসন গ্রহণ করিয়া বিবেকানন্দ তাঁহার মানবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। আর যে ধর্ম্মের লৌকিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন ধর্ম্মে মতদ্বৈধ নাই, সেই অনুষ্ঠান অর্থাৎ সেবাধর্ম্মই তাঁহার ধর্ম্ম-মতকে রূপদান করিয়াছে। আবার বলি এই সেবা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে অবস্থিত ব্রহ্মকে উপলব্ধি মাত্র। এইভাবে স্বামীজি ভারতের বৈদান্তিক ধর্ম্মকে বিশ্বমানবের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজির জীবনের এই মহাসত্যকে যদি আমরা উপলব্ধি না করিয়া থাকি তবে বলিব স্বামীজিকে আমরা চিনিতেই পারি নাই।

বিবেকানন্দের প্রচারিত জীবকল্যাণময়ী ব্রাহ্মী বাণীই বাঙ্গালা সাহিত্যে শত শত প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির মধ্য দিয়া প্রচারিত হইয়াছে—শত শত কবিতার মধ্য দিয়া উদাত্ত স্বরে উদ্গীত হইয়াছে—এমন কি অজস্র গল্প উপন্যাসের মধ্য দিয়াও রসরূপ লাভ করিয়াছে। তাই বলি,—বিরাট আধ্যাত্মিক সাধনার প্রভাববিস্তারই বঙ্গ-সাহিত্যে বিবেকানন্দের অনন্য সাধারণ অবদান।

———

রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম্ম

রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি কবিতায় তাঁহার নিজস্ব কবি-ধর্ম্মটিকে ব্যক্ত করিয়াছেন। কবি সৌন্দর্য্যের পূজারী, তাঁহার সম্বল একটি বীণা বা বাঁশরী। তিনি বলেন, তাঁহার কাছে কেহ যেন সঙ্গীত ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা না করে। যাহাতে মানুষের সমাজ, সংসার বা রাষ্ট্রের কোন শ্রেয়ঃ বা সুবিধা হইতে পারে, তাঁহার কাছে এমন কিছুর প্রত্যাশা নাই। লৌকিক বা ব্যাবহারিক জগতের ক্ষুধাতৃষ্ণানিবৃত্তির কোন হদিশ তাঁহার কাব্যে মিলিবে না। 'বকুলবনের পাখীকে' আমরা যে চোখে দেখি, কবিকে সেই চোখেই দেখিতে হইবে। কবির জীবন অকারণ উল্লাস ও অনাবশ্যক রসবিলাস দিয়া গড়া—সেখানে কোন কর্ম্মের স্থান নাই।

'আবেদন' কবিতার কবি তাঁহার জীবনদেবতা বা রসলক্ষ্মীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন —'নিকুঞ্জের অনুচর আমি তব মালঞ্চের হ'ব মালাকর।' বাণীরূপা জীবনদেবতা তাঁহার উত্তরে বলিতেছেন—

আছে মোর বহু মন্ত্রী
বহু সৈন্য বহু সেনাপতি, বহু যন্ত্রী
কর্ম্মযন্ত্রে রত, তুই থাক চিরদিন
স্বেচ্ছাবন্দী দাস খ্যাতিহীন কর্ম্মহীন।
রাজসভা বহিঃপ্রান্তে রবে তোর ঘর,
তুই মোর মালঞ্চের হবি মালাকর।

সৈন্য, সেনাপতি, যন্ত্রী ও অমাত্যগণ যে কাজ করে, কবির কাজ সে শ্রেণীর নয়। কবির কাজ শুধু মালাগাঁথা। ইহাকে কাজ বলিবে, বল। মহাবাণীর সেবায় ইহা একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। রাজসভা-বহিঃপ্রান্তে তাঁহার ঘর, রাজসভায় তাঁহার ঠাঁই নাই। সাধারণ লোকের এই মালঞ্চের মালাকরের সহিত কোন সম্পর্কও নাই। এখানে কবি বলিতে চাহিতেছেন—"কর্ম্মক্ষেত্রে—যেখানে কার্য্যক্ষেত্রের জনতায় কর্ম্মীরা কর্ম্ম করছে সেখানে আমার স্থান নয়। আমার স্থান সৌন্দর্য্যের সাধকরূপে একা তোমার কাছে।" (চিত্রার ভূমিকা)।

কবি তাঁহার রচনাকে প্রদীপের সঙ্গে উপমিত করিয়াছেন—কিন্তু এ প্রদীপে কোন গৃহ, উৎসবক্ষেত্র বা সভাস্থল আলোকিত হইবে না, এ প্রদীপ স্রোতের জলে অকারণে ভাসিয়া যায়, এ প্রদীপ আকাশ-প্রদীপ হইয়া শূন্য গগন কোণে অকারণে দীপ্তি বিস্তার করে অথবা এ প্রদীপ দীপালীতে লক্ষ দীপের সঙ্গে অকারণে জ্বলিতে থাকে।

কবি তাঁহার উপাস্যের নিকট নিজের জীবনযাপনের পরিকল্পনা দিয়া বলিয়াছেন—

"ভাঙ্গিয়া এসেছি ভিক্ষাপাত্র
শুধু বীণাখানি রেখেছি মাত্র।"

দেখ কত জন মাগিছে রতনধূলি
কেহ আসিয়াছে যাচিতে নামের ঘটা,
ভরি নিতে চাহে কেহ বিদ্যার ঝুলি
কেহ ফিরে যাবে লয়ে বাক্যের ছটা।

আমার এসব কিছুই চাই না।

নগরের হাটে করিব না বেচা কেনা,
লোকালয়ে আমি লাগিব না কোন কাজে।
পাবো না কিছুই রাখিব না কারো দেনা,
অলস জীবন যাপিব গ্রামের মাঝে।"

আমি শুধু গ্রামের তরুতলে বসিয়া নানা ছন্দে বীণা বাজাইব।

আর একটি কবিতায় কবি বলিয়াছেন—তিনি বিশ্বরাজের সিংহদুয়ারে বাঁশী বাজাইবার ভার পাইয়াছেন। তাঁহার আর কোন কাজ নাই। এ বাঁশী তিনি বাজাইয়া চলিবেন—থামিবেন না। কিন্তু কে শুনিবে? দলে দলে লোক আপন আপন বোঝা বহিয়া চলিয়া যায়—তাহারাই ক্ষণিকের জন্য পথের ধারে বোঝা ফেলিয়া যখন বিশ্রাম করে, তখন বাঁশীর গান তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করে। যে পাখীর গান কখনো তাহারা শোনে নাই, এই বাঁশীর গান শুনিয়া, সেই পাখীর গান কান পাতিয়া শোনে। যে ফুল কখনো তাহাদের চোখে পড়ে নাই—সে ফুলের তাহারা আদর করে—"যাহা ছিল চির পুরাতন তারে পায় যেন হারা ধন।"

কিন্তু কবি সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াও বাঁশী বাজান না। কে শুনিল—না শুনিল তাহাতে তাঁহার আসে যায় না। তিনি আত্মানন্দে বিভোর। লোকের চিত্তরঞ্জন তাঁহার উদ্দেশ্য নয়—লোকের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি কাব্য রচনা করেন না। আত্মতৃপ্তিই তাঁহার পুরস্কার। তাহার মধ্যেই যে রসজ্ঞ কবি-পুরুষটি বিরাজ করিতেছেন—তাঁহার রসাদর্শের অনুমোদিত হইল কিনা তাহাই জানিবার জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা। জীবনদেবতা কবিতায় তাই কবি বলিয়াছেন—

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম?

'ভোরের পাখী' কোন কাজে লাগে না, কিন্তু সে একটা কাজ অন্ততঃ করে—সে সকলের ঘুম ভাঙায়। কারণ, সে ভোর না হইতেই ভোরের খবর রাখে। রবীন্দ্রনাথ ভোরের পাখীর সঙ্গে কবিকে উপমিত করিয়াছেন। প্রত্যাসন্ন নবযুগের অগ্রদূত, এই কবি। যদি কান পাতিয়া শোন—তাহা হইলে শুনিবে—নব যুগের ভোরের পাখী বলিতেছে—

"প্রথম আলো পড়ুক মাথায় নিদ্রাভাঙ্গা আঁখির পাতায়,
জ্যোতির্ম্ময়ী উদয়-দেবীর আশীর্ব্বচন মাগো।"

সাধারণ লোকের সঙ্গে এই কবির সম্পর্ক কিছুই নাই। সাধারণ লোকত তাঁহাকে চিনে না। তাহাদের চিনিবার প্রয়োজনও নাই।

"মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে—

যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে—সাধারণ লোক তাহাকেই কবি বলিয়া মনে করে। স্বপন মুরতি গোপন চারী' কবিপুরুষটিকে তাহারা চিনে না।

কিন্তু কবি সকলকেই চিনেন। তাই তিনি বলেন—

"তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে,
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীতি-রবে।
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে,
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কই তাহারে।"

এই কথাই কবি 'পুরস্কার' কবিতায় আরও স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। কেবল মানুষের কথা নয়, ইহাতে প্রকৃতির কথাও আছে।

"অতি দুর্গম সৃষ্টি শিখরে অসীম কালের মহাকন্দরে
সতত বিশ্ব-নির্ঝর ঝরে ঝঝর সঙ্গীতে।
স্বরতরঙ্গ যত গ্রহতারা ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশ-হারা
সেথা হ'তে টানি ল'ব গীতধারা ছোট এই বাঁশরীতে।
ধরণীর শ্যাম করপুটখানি ভরি দিব আমি সেই গীত আনি',
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী মধুর অর্থ ভরা।
নবীন আষাঢ়ে রচি নব মায়া এঁকে দিয়ে যাবো ঘনতর ছায়া
ক'রে দিয়ে যাব বসন্ত কায়া বাসন্তী-বাস-পরা।
সুখ হাসি আরও হবে উজ্জ্বল, সুন্দর হ'বে নয়নের জল,
স্নেহ-সুধামাখা বাস গৃহতল আরও আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে',
আরেকটু স্নেহ শিশু মুখ'পরে শিশিরের মত রবে।
ধরণীর তলে, গগনের গায়, সাগরের তলে অরণ্য ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায় রঙিন করিয়া দিব।
সংসার মাঝে কয়েকটি সুর রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর তার পরে ছুটি নিব।"

কবি তাঁহার কবিধর্ম্ম ও কবিব্রতের কথা এই সকল কবিতায় বলিয়াছেন বটে—কিন্তু তাঁহার এ বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা কতটুকু? তাঁহার কবি জীবনের অধিষ্ঠাত্রী—অন্তর মাঝে বসিয়া অহরহ মুখ হইতে ভাষা কাড়িয়া তাহাতে আপন সুর মিশাইতেছেন - কবির প্রেমে আপন রাগিণীর সংযোগ করিতেছেন—পদে পদে তাঁহার দিক ভুলাইয়া দিতেছেন। তাই কবি বলিতেছেন—

"যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানিনা এসেছি কাহার বারতা কারে শুনাবার তরে।"

কবি যেন এই দেবতার হাতের বীণাযন্ত্র—ব্যথায় হৃদয়ের তারগুলি পীড়ন করিয়া এই দেবতা যেন মর্ম্মমাঝে মূর্চ্ছনাভরে গীতঝঙ্কার ধ্বনিত করিতেছেন। কবি যেন—বিশ্বদেবতার মহামন্দিরতলে ঐ দেবতার হাতে জ্বালা প্রদীপ। কবি যেন তাঁহার জীবনদেবতার 'স্বেচ্ছাবন্দী দাস'।

কবি তাঁহার জীবননিয়ন্ত্রী অন্তর্যামিনীর হাতের যন্ত্র হইয়া গান গাহিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের মহত্তর ব্রতও বুঝি তিনি হারাইয়াছেন। মাঝে মাঝে তাই বলিয়াছেন—

"কেন নিয়ে এলে তব মায়ারথে
তোমার নিজন নূতন এ পথে
কেন রাখিলে না সবার জগতে জনতার মাঝখানে?"

মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি?' সোনার ধানের তরীতে তাঁহার ঠাঁই নাই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশও করিয়াছেন। কবি তাঁহার কবিজীবনের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা স্বীকার করেন নাই—সেই সঙ্গে তাঁহার কবিজীবনের কোন দায়িত্বও গ্রহণ করেন নাই। তাই তাঁহার রচনার অর্থসঙ্গতির জন্যও তিনি দায়ী নহেন।—

যে যেমন বোঝে অর্থ তাহার
কেহ এক বলে কেহ বলে আর
আমারে শুধায় বৃথা বার বার দেখে তুমি হাস বুঝি?

কবি বলেন—অর্থ কি, আমি তার কি জানি?

যার ভাল লাগে সেই নিয়ে যাক,
যত দিন থাকে ততদিন থাক,
যশ অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক ধূলার মাঝে।

আমার ইহাতে কোন দায়িত্ব নাই।

কবি এজন্য কোন পুরস্কারও চাহেন না। ফলাফলের জন্য যেমন তিনি দায়ীও নহেন তেমনি কাহারও কাছে তাঁহার কোন দাবিও নাই। তাঁহার গান বা দানের জন্য কিছুই তিনি প্রত্যাশা করেন না। নিজের সৃষ্টির জন্য কোন মমতাও পোষণ করেন না। এ যেন নিজেকে অহংবোধহীন নিমিত্ত মাত্র মনে করিয়া কর্ম্মফল ব্রহ্মে সমর্পণ।

সমগ্র জগতের সহিত তাঁহার গানের বা কবিজীবনের লীলার কোন সম্পর্ক আছে কবি তাহা যেন স্বীকারই করেন নাই। কোকিল মুকুলিত সহকারবৃক্ষে বসিয়া পঞ্চমে কূজন করে। বসন্ত ঋতু তাহাকে কূজন করায় তাই সে—কূজন করে। তাহার নিজের কোন উদ্দেশ্য নাই। এই কূজন কাহারও কাহারও কাণে প্রবেশই করে না—আবার কাহারও বা কাণে প্রবেশ করিয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলে—কত স্মৃতি, কত স্বপ্ন জাগায় তাহার মনে, তাহার সমস্ত জীবনকে আলোড়িত করিয়া তুলে। কোকিল সে কথা জানেও না—জানিতে চায়ও না। নির্বিকার চিত্তে সে কূজন করিয়াই চলে। কবি যেন এই বসন্তের কোকিলেরই মানবরূপ।

এই সকল কবিতায় কবি তাঁহার যে জীবন-সত্তার কথা বলিয়াছেন, তাহা কবি জীবন-ব্রত সম্বন্ধে পূর্ণ সত্য নয়। এইগুলিতে তিনি তাঁহার জীবনদেবতাকে—

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী তুমি অন্তরবাসিনী—

এই রূপেই দেখিয়াছেন।

কিন্তু এই জীবনদেবতাই যে জগতের মাঝে বিচিত্ররূপিণী—এই সত্যকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। "জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরে একাকিনী, কবির কাছে দুইই সত্য, আকাশ ও ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য।" জীবনদেবতা শুধু কবির কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী ও নিয়ন্ত্রী নহেন—তিনি তাঁহার সমগ্র জীবনেরও অধিষ্ঠাত্রী, তাই তিনি বহির্জগতে বিচিত্র-রূপিণী। কবি জীবনদেবতার ঐ বিচিত্ররূপের আহ্বানেও সাড়া দিয়াছেন—'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়। কবি নিজেকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন—

"সংসারে সবাই যবে সারা ক্ষণ শত কার্যে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূর বনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশী। ওরে তুই ওঠ আজি।"

তারপর কবি বহির্জগতে মানবজাতির দুঃখদুর্গতির চিত্র অঙ্কন করিয়া নিজেকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—"কেবল বাঁশী বাজাইবার জন্য কবির জন্ম নয়,—আত্মকেন্দ্রিক হইয়া আত্মানন্দে বিভোর থাকাই কবির ব্রত নয়।" বহির্জগতেও কবির মহাব্রত যেন আর্তকণ্ঠে কহিতেছে—

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা,
ডাকিয়া বলিতে হবে
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ইত্যাদি।

নিজেকে আহ্বান করিয়া কবি উদাত্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—

কবি তবে উঠে এস যদি থাকে প্রাণ,
তবে তাই লও সাথে, তবে তাই কর আজি দান।
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার,
বড়ই দরিদ্র শূন্য বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার,
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য মাঝারে কবি
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি।

'রঙ্গময়ী কল্পনার কাছ হইতে বিদায় লইয়া কবি তাই মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে মুহূর্তের জন্যও

কর্ম্মহীন জীবনের এক প্রান্ত তরঙ্গায়িত করিতে, দুঃখকে ভাষা দিতে, স্বর্গের অমৃতের জন্য গভীর পিপাসায় সুপ্তি হইতে জাগিয়া উঠিতে' চাহিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার বাঁশীতে শেখা সুর, তাঁহার বাঁশীতে গাওয়া গান ধন্য হইবে।

এহো বাহ্য। বিচিত্রের এটা একটা রূপ, কিন্তু ইহা তাহার প্রাকৃত রূপ। ইহাতেই কবির ব্রত শেষ নয়। বৃহত্তর জগতে বিচিত্রের একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে—তাহার আহ্বানেও কবিকে সাড়া দিতে হইবে।

মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা
মৃত্যুরে না করি' শঙ্কা।—

তাহাতেও শেষ নয়। জীবনসর্ব্বস্ব ধন জন্ম জন্ম ধরিয়া কবি যাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন—তাঁহাকে চিনেন আর নাই চিনেন, তাঁহারই অভিসারে কবিকে যাইতে হইবে।

যাঁহার উদ্দেশে মানব-যাত্রী ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতের মধ্য দিয়া মহাব্রত শিরে ধরিয়া, অন্তর-প্রদীপখানি সাবধানে জ্বালাইয়া, যুগ হইতে যুগান্তরে যাত্রা করিয়াছে, যাঁহার আহ্বানে নির্ভীক প্রাণে সঙ্কট-আবর্ত্ত মাঝে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া বক্ষ পাতিয়া সহস্র নির্য্যাতন সহ্য করিয়া সে ছুটিয়াছে, প্রেমের ইন্ধনে হোমহুতাশন জ্বালিয়া হৃৎপিণ্ডকে উৎপাটিত করিয়া রক্তপদ্মের ন্যায় পূজোপহার দান করিয়া মরণে প্রাণকে কৃতার্থ মনে করিয়াছে, যাঁহার চরণে মানী তাহার মান, ধনী তাহার ধন, বীর তাহার প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে, তাঁহার উদ্দেশেই কবিকে অনন্তের পথে যাত্রা করিতে হইবে। তাঁহাকেই অন্তরে ধারণ করিয়া সুখে দুঃখে অবিচলিত ও প্রতি দিবসের কর্ম্মে নিরলস থাকিয়া সকলকে সুখী করিয়া জীবন-কণ্টক-পথে একাকী চলিতে হইবে।

কবি আশা করেন—

তার পরে দীর্ঘ পথ শেষে
জীবযাত্রা অবসানে ক্লান্ত পদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে। হয়ত ঘুচিবে দুঃখ নিশা
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব্ব প্রেমতৃষা।

কবির জীবন-ব্রত সম্বন্ধে কবি এই কবিতার মধ্য দিয়া যাহা বলিয়াছেন—তাঁহার কাব্যসাধনার মধ্য দিয়া তাহা স্তরে স্তরে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারা অনুসরণ করিতে হইলে কবিব্রতের এই স্তরগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কবির অকারণ আনন্দে ফেনিলোচ্ছল যৌবনের সার্থকতা শুধু গানেই বটে, শুধু দায়িত্ব-হীন কাব্যকূজনেই বটে, কিন্তু কবির সমগ্র জীবনের সার্থকতা তাহাতে নয়—প্রত্যেক কবির জীবনেই মহত্তর ব্রত আছে। কবি কোকিল নয়,—কবি মনুষ্যত্বের সর্ব্ববিধ সম্পদে মণ্ডিত মহামানুষ। মানবধর্ম্মের যাহা মহত্তম ব্রত-সাধনা তাহাই কবিকে করিতে হইবে।

সাহিত্য-সাধনার মধ্য দিয়াই এই ব্রত পালিত ও উদ্‌যাপিত হইতে পারে। ব্যাবহারিক জগতের শ্রেয়ঃ সাধনের সহিত এই ব্রতের হয়ত কোন সংযোগ নাই।

কবিগুরু যৌবনে গুঞ্জনরত মধুকররূপে কাব্যে যে মধু সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহার সহিত আমাদের লৌকিক জীবনের ক্ষুৎ-পিপাসার কোন সম্পর্ক ছিল না। আবার সুপরিণত বয়সে তিনি ধ্যান-সিন্ধু মন্থন করিয়া তাঁহার কাব্যে যে অমৃত সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহাও ছিল তেমনি সর্ব্ববিধ লৌকিক প্রয়োজনের অতীত। রবীন্দ্রনাথের কবিব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে ব্যাবহারিক জগতে নয়, আধ্যাত্মিক লোকে। তাই রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন,—তিনি ঋষিও, —আধ্যাত্মিক জগতের চিন্তানায়কও তিনি, দেশে দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির বার্ত্তাবহ, মিষ্টিক—সত্যদ্রষ্টা ও মহাসত্যের প্রচারক।

তরুণ রবীন্দ্রনাথ

কবি বলিয়াছেন,—সন্ধ্যাসঙ্গীতেই আমার কাব্যের প্রথম 'পরিচয়'। কোন' কোন' দিক হইতে হয়ত একথা সত্য। কিন্তু অনেক দিক হইতে প্রভাত-সঙ্গীতেই কবির কাব্যের প্রথম পরিচয়। সন্ধ্যাসঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের কোন বিরাট ভাবধারার উৎসমূল দেখা যায় না। সন্ধ্যাসঙ্গীতের দুঃখবাদ ও পরাভবাত্মক মনোভাব রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কাব্যাদর্শের বিরোধী। আমার মনে হয়—কবিকাহিনী হইতে যে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন-ধারার সূত্রপাত হইয়াছে, সন্ধ্যাসঙ্গীতে তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। এইখানেই 'খুল্ল রবীন্দ্রনাথের' অবসান। এই খুল্ল রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের মত একজন কবি। প্রভাত-সঙ্গীতের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হইতেই 'মহারবীন্দ্রনাথের' কাব্য-জীবনধারার সূত্রপাত বলিলেই ঠিক হয়।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের মধ্যে যে বিষাদের সুর ওতপ্রোত—তাহা বিষাদের বিলাসমাত্র। বিষাদের কারণও হয়ত থাকিতে পারে—কিন্তু তাহা কবিজীবনের বিষাদ নয়। এ বিষাদ যদি অন্তর্নিহিত মহাশক্তির প্রকাশ-ব্যাকুলতা হইত—অণ্ডচ্ছদ-বিদারণের আগে ভ্রূণ-গরুড়ের নিষ্ক্রামণ-বেদনা হইত—যদি অজানা অরূপের উপলব্ধিলাভের জন্য অহেতুক বেদনা হইত—যদি আর্ত্তজগতের জন্য দরদের বেদনাও হইত—এমন কি নিজের ব্যক্তিগত শোক-বিরহও হইত, তাহা হইলে মহারবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার প্রথম পরিচয় হইতে পারিত। সন্ধ্যাসঙ্গীতে কবির যে pessimistic attitude প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা কবির নিজস্ব ধাতুর সহিত সমঞ্জস নয়। সন্ধ্যাসঙ্গীতের সন্ধ্যা দুঃখ-স্মৃতিভাণ্ডারের গৃহিণী। কবি তাঁহার কবিতাকে 'পশ্চিমের জ্বলন্ত চিতার শিখায় সহমরণোন্মতা দিবার' মত আবির্ভূত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। 'অন্ধকার সাগরের গভীর অতলে আত্মহত্যায় মৃতা তারকার' পাশে তাহার স্থান চাহিয়াছেন। আশার আশ্বাস-বাক্যে কবি বিশ্বাস করেন না। কবি বলিয়াছেন,—

"একবার ফিরে কেহ দেখেনাক ভুলি সবে চলে যায়।"

সুখ বলে—"এজন্ম ঘুচায়ে সাধ যায় হইতে বিষাদ।" কবি নিজেরই বিষাদ-গানে নিজেই বিরক্ত। হৃদয়ের প্রতিধ্বনিতে বলিয়াছেন—

এ প্রাণের ভাঙা ভিতে শুব্ধ দ্বিপ্রহরে
ঘুঘু এক ব'সে ব'সে গায় একস্বরে,
কে জানে কেন সে গান গায়।
গলি সে কাতর স্বরে শুব্ধতা কাঁদিয়া মরে
প্রতিধ্বনি করে হায় হায়।

দুঃখকে আহ্বান করিয়া কবি বলিয়াছেন—

বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস্ শোষণ,
জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ।

এই দুঃখের সান্ত্বনা কি তাহাও কবি বলেন নাই—এই দুঃখের উচ্চতর পরিণামের কথাও তিনি বলেন নাই। তিনি তাহার বিনিময়ে বলিয়াছেন—

'হৃদয়ের শিরাগুলি ছিঁড়ি ছিঁড়ি মোর
তাইতে রচিস্ তন্ত্রী বীণাটির তোর।'

ভালবাসার আতিশয্যকে কবি বলিয়াছেন অসহ্য, শুধু তাহাই নয়—

প্রণয় অমৃত একি? এযে ঘোর হলাহল
হৃদয়ের শিরে শিরে প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে
অবশ করেছে দেহ শোণিত করেছে জল।

অভিমানী কবি বিধাতার অনুগ্রহ চাহেন না, অনুগ্রহ হইতে মুক্তি চাহেন। শুধু তাহাই নয়, প্রার্থনা করিয়াছেন—

হে বিধাতা শিশিরের মতো গড়েছ আমার এই প্রাণ
শিশিরের মরণটি তবে আমারে করনি কেন দান?

সমগ্র জীবনে জয়-সঙ্গীত ছাড়া যিনি কোন গানই গাহেন নাই, তিনি সন্ধ্যাসঙ্গীতে পরাজয়-সঙ্গীত গাহিলেন কেন?—

সংসারে যাহারা ছিল সকলেই জয়ী হলো,
তোরি শুধু হলো পরাজয়।
প্রতি বর্ণে প্রতি পদে একে একে ছেড়ে দিলি
জীবনের রাজ্য সমুদয়।

আবার বলিয়াছেন—

রাজ্যহারা ভিখারীর সাজে
দগ্ধধ্বংস ভস্ম 'পরি ভ্রমিব কি হাহা করি জগতের মরুভূমি মাঝে?

এই সমস্তই একজন Cynic বা Pessimistic কবির কথা। এই কবি কি আমাদের রবীন্দ্রনাথ? ইহা কি বেদনার বিলাসলীলামাত্র নয়? দুঃখ তাঁহার লীলাসঙ্গী মাত্র। কবি প্রকারান্তরে সে কথা দুঃখকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেনও—

কথা না কহিস যদি বসে থাক নিরবধি
হৃদয়ের পাশে দিনরাতি।
যখনি খেলাতে চাস্ হৃদয়ের কাছে যাস
হৃদয় আমার চায় খেলাবার সাথী।

কবির জীবনচরিতকার বলেন—ইহা বেদনার বিলাসমাত্র নয়। বেদনা অবশ্যই ছিল—সে বেদনার ইঙ্গিত পরাজয়-সঙ্গীত, সংগ্রাম-সঙ্গীত ও গান সমাপনেই আছে। কবি বলিয়াছেন—

"ইচ্ছা সাধ যাহা ছিল অদৃষ্ট লুটিয়া নিল।"
"এমন মহান্ এ সংসারে জ্ঞানরত্নরাশির মাঝারে
আমি দীন শুধু গান গাই তোমাদের মুখ পানে চাই।"

কবি নিজের হৃদয়াবেগের আতিশয্যের জন্য সাংসারিক জীবনে প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষার মধ্য দিয়া সাফল্য ও জীবনসংগ্রামের উপযুক্ত বৈষয়িক শক্তি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই—এজন্য আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করিত এবং নিজেরও সেজন্য নির্বেদ জন্মিত। ইহাই তাঁহার প্রথম যৌবনে আকালিক বিষাদের হেতু। কবি বুঝিলেন এজন্য তাঁহার হৃদয়ই দায়ী। তাই হৃদয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে চাহিয়াছেন। 'হৃদয়েরে রেখে দিব বেঁধে বিরলে মরিবে কেঁদে কেঁদে'। এ জয় কবি-জীবনের জয় নয়, লৌকিক জীবনের জয়। কবি নিজের হৃদয়কে বন্দী করিয়া লৌকিক প্রথা অবলম্বন করিয়া জয়ী হইতে চাহিয়াছেন, আশা করিয়াছেন—

চারিদিকে দিবে হুলুধ্বনি বরষিবে কুসুম আসার,
বেঁধে দেব বিজয়ের মালা শান্তিময় ললাটে আমার।

বলা বাহুল্য, কবি জীবনে যে জয়লাভ করিয়াছেন তাহা হৃদয়ের সহিত সংগ্রামে হৃদয়কে বন্দী করিয়া নয়, হৃদয়ের সারথ্যেই তিনি বিজয়ী হইয়াছেন।

সংকোচ, কুণ্ঠা ও পরাভবাত্মক মনোভাবের আর একটি কারণ,—নিজের শক্তির সম্বন্ধে দ্বিধা ও নির্ভরহীনতা। 'গান-সমাপনে' কবি বলিয়াছেন—

বড় ভয় হয় পাছে কেহই না দেখে তারে
যে জন কিছুই শেখে নাই।
ওগো সখা ভয়ে ভয়ে তাই যাহা জানি,—সেই গান গাই,
তোমাদের মুখ পানে চাই।
দিন গেল সন্ধ্যা গেল কেহ দেখিলে না চেয়ে
যত গান গাই।
বুঝি কারো অবসর নাই।
বুঝি কারো ভালো নাহি লাগে? ভালো সখা আর গাহিব না।

মোট কথা, এখন পর্য্যন্ত কবি নিজের অন্তর্নিহিত অসীম শক্তির সন্ধান পান নাই—এখন পর্য্যন্ত তিনি আত্মবিস্মৃত। তাই তাঁহার মনে এখন পর্য্যন্ত পরাভবাত্মক মনোভাব,—তাই তাঁহার মনে নিতান্ত লৌকিক বিষাদ—তাই মনে এত দ্বিধা, এত সংকোচ। কবির এখনো বোধি লাভ হয় নাই। তাঁহার এই বোধিলাভের সংবাদ আমরা পাইলাম প্রভাত-সঙ্গীতে। তাই বলি মহারবীন্দ্রের কাব্য-ধারার প্রথম সূত্রপাত প্রভাত-সঙ্গীতে, আর খুল্ল রবীন্দ্রনাথের পরিসমাপ্তি সন্ধ্যাসঙ্গীতে।

কবি নিজেও স্বীকার করিয়াছেন—"সন্ধ্যাসঙ্গীতের পূর্বে আমার মনে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের গদ্‌গদভাষী আন্দোলন চলছিল।" হৃদয়াবেগের গদ্‌গদভাষী আন্দোলন মহারবীন্দ্রনাথের ধর্ম নয়—হেম-নবীনেরই ধর্ম।

অবশ্য সন্ধ্যাসঙ্গীতেও তিনি পূর্ববর্ত্তী কোন কবির রচনারীতির অনুকরণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

তাঁহার কবিতা "সে সময়কার অন্য সমস্ত কবিতা থেকে স্বতন্ত্র আপন ছন্দের বিশেষ সাজ পরে এসেছিল।" সন্ধ্যাসঙ্গীতেরও ভাষাবিন্যাস ও ছন্দের বিশিষ্টতা ইহাকে সেকালের অন্যান্য কবিতা হইতে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে—ইহা সত্য, কিন্তু কবি সন্ধ্যাসঙ্গীতের ভাষা ও ছন্দকেও অল্পদিন পরেই বিদায় দিয়াছিলেন। কড়ি ও কোমলের আগে পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব ছিল। কড়ি ও কোমলেই কবি তাঁহার কাব্যের বিশিষ্ট ভাষা অধিগত করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে কবি নিজেই বলিয়াছেন—

"কাঁচা বয়সে মনের ভাবগুলো নূতনত্বের আবেগ নিয়ে রূপ ধরতে চাচ্ছে। কিন্তু যে উপাদানে তাদের শরীরের বাঁধন দিতে পারত তারই অবস্থা তখন তরল; এই জন্যে ওগুলো হয়েছে ঢেউওয়ালা জলের উপরকার প্রতিবিম্বের মত আঁকাবাঁকা, ওরা মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠেনি। সুতরাং কাব্যের পদবীতে পৌঁছতে পারেনি। এই জন্যে আমার মত এই যে, কড়ি ও কোমলের পর থেকেই আমার কাব্যরচনায় ভালোমন্দ সব নিয়ে একটা স্পষ্ট সৃষ্টির ধারা অবলম্বন করেছে।"

সন্ধ্যাসঙ্গীত সম্বন্ধে কবি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন—'উহার গুণের মধ্যে এই যে হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা খুসি তাই লিখিয়া গিয়াছি।' কবি 'এই যা খুসি তাই' লেখাকে একটা গুণ বলিয়াছেন। কবি তখন সতর্ক সচেতন আর্টিষ্ট হইয়া উঠেন নাই—তাঁহার মনে আর্টের সংযম ও নির্বাচনী-শক্তির জন্ম হয় নাই। কিন্তু অসংকোচে ভাব প্রকাশ করিবার সাহস, আত্ম-প্রকাশের আনন্দবোধ এবং নিজের শক্তির উপর কিছু কিছু ভরসাও তাঁহার জন্মিয়াছে। ইহাকেই তিনি একটা লাভ মনে করিতেছেন। এই সাহস, ভরসা ও আনন্দবোধ না থাকিলে পরে তিনি তাঁহার শিল্পিজনোচিত সংযম ও নির্বাচনী শক্তির প্রয়োগই করিতে পারিতেন না। এক কথায় ঐগুলি তাঁহার পরবর্ত্তী রচনায় উপাদানীভূত হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন। যে অবল্গিত শক্তিকে বল্গিত করিয়া তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী হইয়াছেন, সেই অবল্গিত শক্তিকে উপেক্ষা করা যায় না।

এই যা-খুসি লিখিয়া যাইবার অসংকোচ তিনি বিহারীলালের প্রভাবেই পাইয়াছিলেন এইরূপ মনে করা অসঙ্গত নয়।

ছবি ও গান কবির নবোদ্ভিন্নমান যৌবনের রসানুভূতির গান এবং কল্পনা-লীলার চিত্রমালা। দেহে মনে নবযৌবনের অতর্কিত সঞ্চার হইয়াছে। একখানি পত্রে 'ছবি ও গান' রচনার সময়ের মনের অবস্থা কবি প্রকাশ করিয়াছেন, "আমার সকল বাহ্য লক্ষণে এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে, তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখতে তো মনে করতে, এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্ষেপামি দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। তখন আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মত এসে পড়েছিল—আমি জানতুম না, আমি কোথায় যাচ্ছি; আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।" চারিদিকে যেন অকাল বসন্তের সমাগম। মনোলোকের দখিণা বায়ু সৌরভে সমাকুল, সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ, পিপাসিত প্রাণের লতিকা-বাঁধন কাহার চরণ যেন জড়াইতে চায়।

'অজানা প্রিয়ার ললিত পরশ ভেসে ভেসে বহে যায়।' কবির মন স্বপ্ন-জগতে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়।

উড়িতেছে কেশ উড়িতেছে বেশ, উদাসপরাণ কোথা নিরুদ্দেশ
হাতে লয়ে বাঁশি মুখে লয়ে হাসি ভ্রমিতেছি আনমনে।

কবির কল্পজগৎখানি রস-সাহিত্য ও রূপকথার স্বপ্ন, প্রকৃতির মাধুর্য্য, যৌবনের সহজ, 'তৃষ্ণা-স্মৃতি-আশামাখা মৃদু সুখ-দুঃখ' দিয়া গঠিত।

যৌবন-স্বপ্নে মধুবায়িত মনের চোখে কবির অতি তুচ্ছ চির-পরিচিত বস্তুগুলি ও দৃশ্যগুলিও মধুময় হইয়া উঠিযাছে। কবি বলিয়াছেন নানা জিনিষকে দেখিবার যে দৃষ্টি, সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিযাছিল। তখন এক একটি কোন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। এক একটি বিশেষ দৃশ্য এক একটি বিশেষ রঙে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত।" (জী: স্মৃ:)

কবি স্বপ্নলোকের একটা আভাস দিয়াছেন 'নিশীথ চেতনা' কবিতায়—

চারিদিকে প্রসারিত একি এ নূতন দেশ
একত্রে স্বরগ মর্ত্ত্য নাহিক দিকের শেষ।
কী যে চায় কী যে আসে চারিদিকে আশেপাশে
কেহ কাঁদে কেহ হাসে কেহ থাকে কেহ যায়॥
মিশিতেছে ফুটিতেছে গড়িতেছে টুটিতেছে
অবিশ্রাম লুকোচুরি আঁখি না সন্ধান পায়।
কত আলো কত ছায়া কত আশা কত মায়া
কত ভয় কত শোক কত কী যে কোলাহল,
কত পশু, কত পাখী, কত মানুষের দল।

এই জগতে স্বপ্নগুলি যেন কোন চপলা মায়াবিনীর দল। তাহারা কবিকে বেষ্টন করিয়া কত লীলাই করে!

যেন মোর কাছ দিয়ে এই তারা গেল চ'লে।
কেহ বা মাথায় মোর কেহ বা আমার কোলে।
কেহ বা মারিছে উঁকি হৃদয় মাঝারে পশি
আঁখির পাতার 'পরে কেহ বা তুলিছে বসি'।
মাথার উপর দিয়া কেহ বা উড়িয়া যায়,
নয়নের পানে মোর কেহ বা ফিরিয়া চায়।

কবি এই লুকোচুরি খেলায় তৃপ্ত না হইয়া বলিয়াছেন—

অয়ি স্বপ্নমোহময়ী দেখা দাও একবার।

আবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন—

আমি যদি হইতাম স্বপন বাসনাময়,

কত বেশ ধরিতাম কত দেশ ভ্রমিতাম
বেড়াতাম সাঁতারিয়া সুখের সাগরময়।

'মধ্যাহ্নে' কবিতার স্বপ্নলোক, কবির তরুণ প্রাণের তৃষা, স্মৃতি ও আশা দিয়া পরিকল্পিত। কবির তৃষা অজানা কল্পলোকবাসিনী প্রিয়ার সঙ্গলাভের জন্য।

কে জানে কাহারে চায় প্রাণ যেন উভরায়
ডাকে কারে এস এস ব'লে।
কাছে কারে পেতে চায় সব তারে দিতে চায়
মাথাটি রাখিতে চায় কোলে।

* * * * *

সে যেন কোথায় আছে সুদূর বনের পাছে
কত নদী সমুদ্রের পারে,
নিভৃত নির্ঝরতীরে লতায় পাতায় ঘিরে
ব'সে আছে নিকুঞ্জ-আঁধারে।
সাধ যায় বাঁশী করে বন হতে বনান্তরে
চলে যাই আপনার মনে,
কুসুমিত নদীতীরে বেড়াইব ফিরে ফিরে
কে জানে কাহার অন্বেষণে।

কবির আশা—

সহসা দেখিব তারে নিমেষেই একেবারে
প্রাণে প্রাণে হইবে মিলন।
এই মরীচিকা-দেশে দুজনে বাসর-বেশে
ছায়া-রাজ্যে করিব ভ্রমণ।
বাঁধিব সে বাহুপাশে চোখে তার স্বপ্ন ভাসে,
মুখে তার হাসির মুকুল।
কে জানে বুকের কাছে আঁচল আছে না আছে
পিঠেতে পড়েছে এলোচুল।

কবির কল্পনা প্রাচীন সাহিত্যের রসাবেষ্টনীতেও চলিয়া যায়—

হোথায় মালিনী নদী বহে যেন নিরবধি
ঋষিকন্যা কুটীরের মাঝে।
কভু বসি তরুতলে স্নেহে তারে ভাই বলে,
ফুলটি ঝরিলে ব্যথা বাজে।
কত ছবি মনে আসে পরাণের আশেপাশে
কল্পনা কত যে করে খেলা

বাতাস লাগায়ে গায় বসিয়া তরুর ছায়

কেমনে কাটিয়া যায় বেলা।

কবির জীবনে এখনো প্রভাত হয় নাই—এখনো নিশীথের আধিপত্য চলিয়াছে—তাই তিনি স্বপ্নলোকে বিহার করিতেছেন। 'ছবি ও গানকে' নিশীথ-সঙ্গীত নাম দিলেও চলিত।

কবির এই স্বপ্নলোক কবির চিত্তকে পরেও একেবারে ত্যাগ করে নাই—কবি এই লোকে চিরদিনই আসাযাওয়া করিয়াছেন। আর এই স্বপ্নলোকের আশা, তৃষা ও স্মৃতির রূপ যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কবির প্রকৃতি চিরস্বপ্নময়ীই থাকিয়া গিয়াছে—বয়োবৃদ্ধির সহিত এই প্রকৃতির প্রতি মমতাই বাড়িয়া গিয়াছে।

কবি তাঁহার নিশীথস্বপ্নের জগৎ হইতে মুক্তি চাহিয়াছেন—তিনি প্রভাতের আলোকে হৃদয়-কমলের বিকাশ প্রার্থনা করেন—

মাঝে মাঝে থেকে থেকে কোথা হ'তে ভেসে আসে ফুলের সুবাস।
প্রাণ যেন কেঁদে উঠে অশ্রুজলে ভাসে আঁখি উঠেরে নিশ্বাস।
নিদ্রাহীন আঁখি মেলি পূরব আকাশ পানে রয়েছি চাহিয়া,
কবে রে প্রভাত হবে আনন্দে বিহঙ্গগুলি উঠিবে গাহিয়া।

'আচ্ছন্ন' কবিতায় তিনি 'আবিরাবির্মএধি'র সুরে আমন্ত্রণী গাহিয়াছেন—

কে তুমিগো উষাময়ী আপন কিরণ দিয়ে
আপনাকে করেছ গোপন,
রূপের সাগর মাঝে কোথা তুমি ডুবে আছ
একাকিনী লক্ষ্মীর মতন ?
ধীরে ধীরে ওঠ দেখি একবার চেয়ে দেখি
স্বর্ণজ্যোতি কমল আনন
সুনীল সলিল হ'তে ধীরে ধীরে ওঠে যথা
প্রভাতের মিলন কিরণ।
সৌন্দর্য্য-কোরক টুটে এস গো বাহির হ'য়ে
অনুপম সৌরভের প্রায়
আমি তাহে ডুবে যাব সাথে সাথে বহে যাব
উদাসীন বসন্তের বায়।

ইহা যেন ভোরের পাখীর কণ্ঠে জীবনদেবতার জাগর-আমন্ত্রণী। আর একটি কবিতাতেও এই ভাবের আমন্ত্রণী ধ্বনিত হইয়াছে—'স্নেহময়ীর' উদ্দেশে—

পরশি তোমার কায় মধুর প্রভাত বায়
মধুময় কুসুমের বাস,
ওই দৃষ্টি সুধা দাও এই দিক পানে চাও
প্রাণে হোক প্রভাত প্রকাশ।

ছবি ও গানের বহু কবিতাতেই কবিপ্রতিভার পূর্ণোদয়ের পূর্বে শুকতারার আভাস দেখা যায়।

'নিশীথ জগৎ' নামক কবিতায় আভাসিত বিভীষিকার দুঃস্বপ্ন কবির জীবন হইতে চলিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু নিশীথপ্রকৃতির রহস্যময়তা পরজীবনে বহু কবিতায় অদ্ভুত রসের সৃষ্টি করিয়াছে। যে আমিত্ব-বোধকে কবি গীতাঞ্জলিতে একেবারে বিলোপসাধন করিয়াছিলেন—তাহা এই তরুণ বয়সের রচনার মধ্যেই তাঁহার দুঃসহ বলিয়া মনে হইয়াছে।

'অভিমানিনী' কবিতায় কবি বলিয়াছেন—

ধীরে ধীরে আধ আধ বল' কেঁদে কেঁদে ভাঙা ভাঙা কথা
আমায় যদি না বলিবি তুই, কে শুনিবে শিশু প্রাণের ব্যথা।

শিশু প্রাণের প্রতি এই দরদ পরবর্তী জীবনে কি বাণীরূপ লাভ করিয়াছে তাহা সকলেই জানেন। কবির 'পোড়ো বাড়ী' পরবর্তী জীবনে সমগ্র ভারতবর্ষেরই রূপ ধরিয়াছে। কবির প্রাণের গভীর দরদ আর ঐ একটি বাড়ীতেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই।

কবি 'পূর্ণিমা' কবিতায় বলিয়াছেন –

নিশীথের মাঝে শুধু মহান্ একাকী আমি
অতলেতে ডুবি রে কোথায়।
বিন্দু হ'তে বিন্দু হয়ে মিশায়ে মিলায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে।

পরবর্তী জীবনে যে পূর্ণের অপরূপ প্রকাশের মধ্যে কবি আত্মহারা হইয়া এই অপূর্ণতার জগৎ হইতে অসীমের উদ্দেশে অভিযান করিয়াছেন—তাহার একটু ইঙ্গিত এখানে পাই।

পরবর্তী জীবনে কবি বহিঃপ্রকৃতিকে মনের ঔদাস্যের গেরুয়া রঙে রঞ্জিত করিয়া দেখিয়াছেন—তাহার একটা পূর্বাভাস 'মধ্যাহ্নে' কবিতায় পাওয়া যায়। ছবি ও গানে যে ঔদাস্য স্বপ্নলোকের দিকে আকর্ষণ করিয়াছে, পরিণত বয়সে তাহাই রূপ হইতে অরূপের দিকে লইয়া গিয়াছে---ইহাই পার্থক্য। পরবর্তী জীবনে আর শ্রাবণ-নিশীথের ধারাসারে আর্তস্বর শুনেন নাই,—অসীমের আহ্বানই শুনিয়াছেন। বাদলা দিনে বায়ুর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তরুণ কবিরও দীর্ঘশ্বাস জড়িত। তবে কেন মন চঞ্চল হইত তাহা তিনি বুঝিতেন না।

কবি পরিণত বয়সে যে সর্বসংস্কারমুক্ত আনন্দময় পুরুষ ও রসতন্ময় ভাবুকের আদর্শকে কাব্যে বাণীরূপ দিয়াছিলেন, তাহার একটা মোটামুটি আদরা তিনি 'পাগল' ও 'মাতাল' নামক কবিতা দুইটিতে দিয়াছেন। 'গ্রামে' কবিতায় পল্লীশ্রীতে তিনি যে মাধুর্য উপভোগ করিতেন সেই কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাই পরবর্তী জীবনে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

কবি স্মৃতিপ্রতিমায় বলিয়াছেন—

হারে হা শৈশব মায়া অতীত প্রাণের ছায়া
এখনো কি আছিস হেথায়?

এখনো কি থেকে থেকে উঠিস রে ডেকে ডেকে
সাড়া দিবে সে কি আর আছে ?
যা ছিল তা আছে সেই আমি যে সে আমি নেই
কেন রে আসিস্ মোর কাছে ?

'আবছায়া' কবিতায় বলিয়াছেন—

কোথা সেই ছায়াছায়া কিশোর কল্পনা মায়া
মেঘমুখে হাসিটি উষার ?
আলোতে ছায়াতে ঘেরা জাগরণ স্বপনেরা
আশেপাশে করিত রে খেলা,
একে একে পলাইল শূন্যে যেন মিলাইল
বাড়িতে লাগিল যত বেলা।

Wordsworth-এর Intimation ode-এর সুরে কবি এখানে আক্ষেপ করিয়াছেন।

কবির এই স্মৃতির বেদনা যত বেলা বাড়িয়াছে ততই বাড়িয়াছে।—পূরবী হইতে যে স্মৃতির বেদনাময়ী মাধুরী কবির বহু রচনার প্রধান উপজীব্য হইয়াছে, সেই স্মৃতির অঙ্কুরিত বাণীরূপ এইখানে আমরা পাই।

'যোগী' কবিতায় কবি যে সমুদ্রগর্ভ হইতে ধীরে ধীরে সূর্যোদয়ের চিত্র আঁকিয়াছেন—তাহা তাঁহারই চোখে তাঁহারই প্রতিভার ক্রমোন্মেষের চিত্রাত্মক রূপ বলা যাইতে পারে।

ছবি ও গানের ভাবে না হউক, ভাষায় বিহারীলালের প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। ভাষা ললিত, তরল, স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল। যুক্তাক্ষরের শব্দ যতদূর সম্ভব বর্জিত হইয়াছে। কবিতাগুলিতে শিল্পকলার পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্যের অভাব আছে। এখনও কবি নিজস্ব ভাষাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য অধিগত করিতে পারেন নাই। কিন্তু কবির অনন্যসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী ও সৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যের অঙ্কুরিত রূপ খুবই স্পষ্ট।

কবির নয়নে চারিদিকে মধুর প্রণয়-লীলার ছবিগুলিই চোখে পড়ে। গাছের ছায়া আর রবির কিরণ জলের পরে দুটি প্রেমিক-প্রেমিকার মত দোলে। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে—তখন তাহারা যেন আকাশে পাশাপাশি দুইটি তারকা হইয়া বিরাজ করে।

পল্লী-প্রকৃতিকে কবির স্বপ্নপুরী বলিয়া মনে হয়—

কাহিনীতে ঘেরা ছোট গ্রামখানি মায়াদেবীদের মায়া-রাজধানী
পৃথিবী বাহিরে কল্পনা তীরে করিছে যেন রে খেলা-ধূলা।

কবি এই স্বপ্নময়ী প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতিলালিতা 'আদরিণীকে' দেখিয়াছেন—আশ্রয়ার্থিনী 'একাকিনী' বালিকাকে হৃদয়ের কোণে আশ্রয় দিতে চাহিয়াছেন।

কবির দুই-একটি স্বপ্নচিত্রের আভাস দিই—

ধীরে নিশীথের বায় আসে খোলা জানালায়
ঘুম এনে দেয় আঁখিপাতে।

শয্যায় পায়ের কাছে খেলেনা ছড়ানো আছে
ঘুমায়েছে খেলাতে খেলাতে।
এলিয়ে গিয়েছে দেহ মুখে দেবতার স্নেহ
পড়েছে রে ছায়ার মতন,
কালো কালো চুল তার বাতাসেতে বারবাব
উড়ে উড়ে ঢাকিছে বদন।

তারাগুলি যেন মুখপানে চাহিয়া 'আঁধারে আলোতে গেঁথে হাসিমাথা সুখের স্বপন' তাহাব প্রাণেব উপরে বর্ষণ কবে।

কবি একটি সুখময়ী স্মৃতিব চিত্র দিয়াছেন—

চেযে আছে আকাশের পানে জোছনায় আঁচলটি পেতে।
যত আলো ছিল সে চাঁদেব সব যেন পড়েছে মুখেতে।
কাব মুখ পড়ে তাব মনে, কাব হাসি লাগিছে নয়নে।
স্মৃতিব মধুব ফুলবনে কোথায় হয়েছে পথহাবা।
চেযে তাই সুনীল আকাশে মুখেতে চাঁদেব আলো ভাসে,
অবসান গান আশেপাশে ভ্রমে যেন ভ্রমবেব পাবা।

একটি বিষাদময়ী স্মৃতিব চিত্র—

সীমাহীন জগতেব মাঝে আশা তাব হাবাইল
আজি এই গভীব নিশীথে।
শূন্য অন্ধকাবখানি মলিন মুখশ্রী নিযে
দাঁড়ায়ে বহিল একভিতে।
ছোট ছোট মেঘগুলি সাদা সাদা পাখা তুলি'
চ'লে যায় চাঁদেব চুমা নিয়ে।
অন্ধকার পাছে ছায় ডুবু ডুবু জোছনার
ম্লানমুখী বমণী দাঁড়িযে।

'প্রভাত উৎসব' কবিতায় কবি আপনাব অসীম শক্তিকে বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতিব মধ্যে পবিব্যাপ্ত দেখিযাছেন। নিজের অসাধারণ ভাবী স্বাতন্ত্র্যকে লক্ষ্য কবিয়া বলিয়াছেন—

বারেক চেয়ে দেখ আমার মুখপানে।
উঠেছে মাথা মোর মেঘের মাঝখানে॥
আপনি আসি উষা শিয়বে বসি ধীবে
অরুণ কর দিয়ে মুকুট দেন শিরে।
নিজের গলা হতে কিরণমালা খুলি'
দিতেছে ববিদেব আমার গলে তুলি।

কবি বিশ্বচরাচরকে আপনার অন্তবঙ্গ জন বলিয়া জানিয়াছেন।

কবির বিশ্ব আজ অনন্ত—তাহার যাত্রাপথ অনন্তের পথে, কবি তাঁহার ক্ষুদ্র অবেষ্টনীর কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন—তাঁহার যাত্রার শেষ নাই—

শতেক কোটি গ্রহতারা যে স্রোতে তৃণপ্রায়
সে স্রোতমাঝে অবহেলে ঢালিয়া দিব কায়।
তপন ভাসে, তারকা ভাসে, আমিও যাই ভেসে
তাদের গানে আমার গান যেতেছে এক দেশে।

কবি আজ নিজেকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—"এই জগৎফুলের মধ্যে কীটের জীবন যাপন না করিয়া জগৎফুলের উপরে জগদতীত হইয়া ভ্রমরের মত মধু পান কর।"

"জগতেরে সদা ডুবায়ে দিতেছে জগৎ অতীত গান।

তাহাই শুনিয়া তোর সুপ্ত প্রাণ জাগুক।" এই জগদতীত সংগীতই দেশকালাতীত অনন্তের সঙ্গীত। এই কবিতাতেও নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির বার্তা আছে—

জগৎ ব্যাপিয়া শোন রে সদাই ডাকিতেছে আয় আয়।
কেহ বা আগেতে কেহ বা পিছায়ে কেহ ডাক শুনে যায়।

নিজের রচনার পরমায়ু সম্বন্ধে কবির আর ভাবনা নাই। কবি এখন জানিয়াছেন—

নাই তোর নাই রে ভাবনা এ জগতে কিছুই মরে না।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের রজনীপ্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে কবি আপনার জীবনের অন্তর্নিহিত অসীম শক্তির সন্ধান পাইলেন। এই শক্তির সন্ধানলাভই তাঁহার কবি-জীবনের বোধি বা দিব্যানন্দ লাভ। এই দিব্যানন্দের মধ্যে তাঁহার জীবনের সকল বিষাদ ডুবিয়া গেল এবং তাঁহার পরাভবাত্মক মনোভাবের মেঘ একেবারে কাটিয়া গেল। জীবনে তার পর তিনি অনেক দুঃসহ আঘাত পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তাঁহার আত্মবিকাশের দিব্যানন্দ হরণ করিতে পারে নাই।

আপনার শক্তির বিশালতার সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বের বিশালতা, জীবনমরণের বিশালতা, মহামানবের বিশালতা সম্বন্ধেও তিনি সত্যোপলব্ধি লাভ করিলেন। এই বিশালতার অনুভূতির প্রথম প্রকাশ কবির প্রভাত-সঙ্গীতে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' কবি তাঁহার অফুরন্ত বিকাশশক্তির একটা কাল্পনিক প্রসার, বৈচিত্র্য ও সৃজনধর্মের আনন্দোচ্ছ্বাসকে বাণীরূপ দিয়াছেন। কবির প্রতিভা-নির্ঝর তাহার স্বপ্নভঙ্গের পর বলিতেছে—

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, ওরে—উথলি উঠেছে বারি।
ওরে, প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।

সকল বাধাবিপত্তি চূর্ণ করিয়া সে অনিবার চলিবে—

ভাঙরে হৃদয় ভাঙরে বাঁধন সাধ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর 'পরে লহরী তুলিয়া আঘাতের পরে আঘাত কর।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ কিসের আঁধার কিসের পাষাণ?
উথলি যখন উঠেছে বাসনা জগতে তখন কিসের ডর?

আমি ঢালিব করুণাধারা আমি ভাঙ্গিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগল পারা।
এত কথা আছে এত গান আছে এত প্রাণ আছে মোব,
এত সুখ আছে এত সাধ আছে প্রাণ হয়ে আছে ভোর।
যত প্রাণ আছে ঢালিতে পাবি, যত কাল আছে বহিতে পাবি,
যত দেশ আছে ডুবাতে পাবি তবে আর কিবা চাই।

তারপব মহাসাগবেব অনন্ত স্রোতে এ ধাবাব শেষ হইবে।

আত্মশক্তিব সন্ধান পাইয়া কবি নানা বচনায় আশাব বাণীকে রূপ দান করিয়াছেন।

আকাশ সমুদ্রতলে গোপনে গোপনে
গীতবাজ্য হতেছে সৃজন।
যত গান উঠিতেছে ধবাব আকাশে
সেইখানে কবিছে গমন।
আকাশ পুবিযা যাবে শেষ উঠিবে গানেব মহাদেশ।
সকলি মিশেছে আসি হেথা জীবনে কিছু না যায় ফেলা
এই যে যা কিছু চেযে দেখি এ নহে কেবলি ছেলেখেলা।

‘প্রতিধ্বনি’ কবিতাতেও এই আশ্বাসেব বাণী—

জগতেব মৃত গানগুলি তোব কাছে পেযে নব প্রাণ,
সংগীতেব পবলোক হতে গায যেন দেহমুক্ত গান।
তাই তাব নব কণ্ঠধ্বনি প্রভাতেব স্বপনেব প্রায়
কুসুমেব সৌবভেব সাথে এমন সহজে মিশে যায।

প্রকাবান্তবে কবি নিজেব বচনাব অমবতা সম্বন্ধে এখন দৃঢনিশ্চয।
কবি মবণেব সত্য স্বরূপও যেন আত্মশক্তিব বিশালতাব সঙ্গে উপলব্ধি কবিয়াছেন—

মবণ বাডিবে যত জীবন বাডিবে তত
পলে পলে উঠিবে আকাশে
নক্ষত্রেব কিবণ নিবাসে।
মবণ বাডিবে যত কোথায কোথায় যাব
বাডিবে প্রাণেব অধিকাব,
বিশাল প্রাণেব মাঝে কত গ্রহ রবি তাবা
হেথা হোথা কবিবে বিস্তাব।
উঠিবে জীবন মোব কত না আকাশ ছেয়ে
ঢাকিয়া ফেলিবে ববি শশী।
যুগ যুগান্তব যাবে নব নব বাজ্য পাবে
নব নব তারায় প্রবেশি।

জীবন ও মরণের মধ্যে যে একটা রহস্যময় ব্যবধান আছে—কবির চোখে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 'জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম।'

ইহা তাঁহার কথার কথা বলিয়া মনে হয় না। প্রাণশক্তির আতিশয্যের উত্তেজনায় এই সত্য সহসা তাঁহার মনে আবির্ভূত হইয়াছে।

সহসা কবির দৃষ্টি এমনি উন্মুক্ত ও প্রসারিত হইয়াছে—যে সমগ্র বিশ্বকে নিজের ধারণার মধ্যে আনিতে চাহিয়াছেন—তাঁহার কল্পনা সমগ্র সৌরজগতে, সমগ্র মানবজগতে পরিভ্রমণ করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, তিনি এই সৃষ্টির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও সৌষম্যের সন্ধান লাভ করিয়াছেন—এই দৃষ্টি Cosmic দৃষ্টি, Metaphysical insight বা প্রজ্ঞা-দৃষ্টি।

'মহাস্বপ্ন' কবিতায় কবি এই সৃষ্টিকে বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

কভু কি আসিবে দেব সেই মহাস্বপ্ন ভাঙা দিন,
সত্যের সমুদ্র মাঝে আধো সত্য হয়ে যাবে লীন!
চন্দ্রসূর্য গ্রহ চেয়ে জ্যোতির্ময় মহান্ বৃহৎ
জীব আত্মা মিলাইবে একেকটি জলবিম্ববৎ।

এই বিশ্ব সত্য না স্বপ্ন, তাঁহার এই দ্বিধা সমাধান লাভ করিয়াছে 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' নামক কবিতায়। কবি মরণের মহাসার্থকতা প্রলয়ের সার্থকতায় উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রলয়ের দেবতা রুদ্রই যে মঙ্গলময় শিব, কবির এই উপলব্ধির প্রথম অভিব্যক্তি এই কবিতায়। জীবনের চাহিদাতেই আত্মার প্রয়োজনের জন্যই সৃষ্টির আকুল প্রার্থনাতেই রুদ্রের ধ্বংসলীলা।

জগতের আত্মা কহে কাঁদি আমারে নূতন দেহ দাও।
প্রতিদিন বাড়িছে হৃদয় প্রতিদিন বাড়িতেছে আশা।
প্রতিদিন টুটিতেছে দেহ প্রতিদিন ভাঙিতেছে বল
গাও দেব মরণ সংগীত পাব মোরা নূতন জীবন।

জগদাত্মার পক্ষ হইতেও যে কথা জীবাত্মার পক্ষ হইতেও সেই কথা।

কবির নিজের অন্তর্নিহিত অসীম শক্তি ও তাহার অবাধ মুক্তির উপলব্ধির বিশ্বরূপ এই কবিতায় ফুটিয়াছে। সৃষ্টি যত চমৎকারই হউক—মহাছন্দের বন্ধনে সে পীড়িত, নিয়ম পাঠশালার শাসনে অবসন্ন। ঘূর্ণচক্রে অবিরত ঘূর্ণ্যমান এই সৃষ্টি কলুর বলদের মতই মুক্তি চায়। নিয়মচক্রের অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার সাধক কবিচিত্ত চক্রপাণির শাসন ত্যাগ করিয়া শূলপাণির শরণাপন্ন। তিনি তাই—ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দ-কোলাহল শ্রবণ করিয়াছেন।

কবি বলিয়াছেন—বাল্যে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ছিল—প্রকৃতির অঙ্কে তখন শিশুর মত খেলা করিয়াছিলেন। সেই প্রকৃতির কথা ভুলিয়া তিনি মানবহৃদয় লইয়া বিব্রত

হইলেন। ইহাকেই তিনি 'হৃদয়ারণ্যে পথ হারানো' বলিয়াছেন। সে অরণ্য অন্ধকার, রহস্যময়, সেখানে 'নাহি রবি নাহি শশী নাহি গ্রহ নাহি তারা'—প্রকৃতির সঙ্গে এখানে কোন সম্পর্ক নাই।

এই অরণ্য হইতে মুক্তি পাইয়া আবার তিনি প্রকৃতিকে ফিরিয়া পাইলেন। বিরহের পর যে মিলন—তাহার মধ্যে হৃদয়াবেগের আতিশয্য ঘটেই। কবি প্রভাত-সঙ্গীতে সেই গভীর হৃদয়াবেগের সহিত প্রকৃতির মাধুর্য্য উপভোগ করিয়াছেন।

কবি যখন তাঁহার অন্তর্নিহিত মহাপ্রাণশক্তির পরিচয় পাইলেন, তখন তিনি সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আপনার প্রাণের বিস্তারক্ষেত্র দেখিতে পাইলেন, প্রকৃতিকে তখন তাঁহার আপনার লালনক্ষেত্র, আপনার গৃহসংসার বলিয়া মনে হইল—মুক্তির আনন্দে তিনি গাহিলেন—

চারিদিকে বহে বায়ু চারিদিকে ফুটে আলো,
চারিদিকে অনন্ত আকাশ,
চারিদিক পানে চাই চারিদিকে প্রাণ ধায়
জগতের অসীম বিকাশ।

কবির তখন মনে হইয়াছে—

দেখিব পাখী আকাশে ওড়ে সুদূরে উড়ে যায়।
মিশায়ে যায় কিরণ মাঝে আঁধার রেখা প্রায়,
তাহারি সাথে সারাটি দিন উড়িবে মোর প্রাণ,
নীরবে বসি তাহারি সাথে গাহিব তারি গান।
তাহারি মতো মেঘের মাঝে বাঁধিতে চাহি বাসা,
তাহারি মতো চাঁদের কোলে গড়িতে চাহি আশা।
হৃদয় মোর মেঘের মতো আকাশপানে ভাসিতে চায়,
ধরার পানে মেলিয়া আঁখি উষার মতো হাসিতে চায়।

কেবল প্রকৃতির প্রতি নয়—মানবজাতির মধ্যেও কবি আপনার অগাধ অফুরন্ত সদ্যোমুক্ত প্রেমের বিস্তার দেখিতে পাইলেন—

জেগেছে নূতন প্রাণ বেজেছে নূতন গান
ওই দেখ পোহায়েছে রাতি।
আমার বুকেতে নে রে কাছে আয় আমি যে রে
নিখিলের খেলাবার সাথী।
চারিদিকে সৌরভ চারিদিকে গীতরব
চারিদিকে সুখ আর হাসি,
চারিদিকে শিশুগুলি মুখে আধো আধো বুলি
চারিদিকে স্নেহপ্রেমরাশি।

কবি বলিতেছেন—আমি ভাবিতাম আমার সকল গানই বুঝি নিষ্ফল হইল। যাহারা আমার ভাষা বুঝিত না—আমার কাছে আসিত না তাহারা—এখন দেখি—

কেহ নাহি করে ডর কেহ নাহি ভাবে পর
সবাই আমারে ভালোবাসে আগ্রহে ঘিরিছে চারিপাশে।

প্রকৃতিকে আবার প্রেমের বন্ধনে ফিরিয়া পাওয়াই আত্মশক্তি ও আত্মপ্রকৃতির আবিষ্কার। কবির এই প্রভাত সঙ্গীত আত্মশক্তির আবিষ্কারের গান। কবি প্রভাত-সঙ্গীতে যে মহাসত্যের সন্ধান পাইলেন—তাহা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই অধিগত হয় নাই। ইহা একটা অলৌকিক স্পর্শের মত—একটা প্রত্যাদেশের মত, ভগবানের অহৈতুক করুণার মত। এই দিব্যবোধ স্থায়ী হয় না, ইহাকে সাধনার দ্বারা, তপস্যার দ্বারা অধিগত করিতে হয়। কবির পিতার জীবনে ব্রহ্মানুভূতির ধ্যান সহস আবির্ভূত দিব্যশক্তিকে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবনে সাধনার দ্বারা আত্মশক্তিতে সার্থকতা দান করিয়াছেন এবং বিদ্যুতের মত সংসাক্ষ্ফুর্ত সত্যগুলিকে জীবনের অঙ্গীভূত (Realised and rationalised) করিয়াছেন। সেই দিব্যানুভূতির সংক্ষিপ্ত কাহিনীকে তিনি ছন্দের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন প্রভাত-সঙ্গীতে। ভাবমুক্তির যে উচ্চশিখর হইতে তিনি আরক্ত প্রাচীদিগন্ত পানে চাহিয়া প্রভাত সঙ্গীত গাহিয়াছেন—সে উচ্চশিখর হইতে তিনি ভাবপথে নামিয়া আসিয়া ক্রমে সাধনা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা পরবর্ত্তী জীবনে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থেই প্রভাত সঙ্গীতের উচ্চগ্রামের সুর একেবারে সমতলে নামিয়া গিয়াছে। প্রভাত সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন নাট্যের প্রবেশক—কবির অন্তর্যামী এখানে সূত্রধারের কাজ করিয়াছেন—সমগ্র জীবন নাট্যের ইহাতে পূর্ব্বাভাস আছে। প্রভাতসঙ্গীত কবির আত্মাবিষ্কারের ও আত্মমুক্তির আনন্দোচ্ছ্বাস মাত্র, ইহাতে কবির আনন্দ কোন বাস্তব মূর্তি পরিগ্রহ করে নাই—ক্রমে ইহা বাস্তব প্রতিমায় সংযত ও সংহত মূর্ত্তি ধরিয়াছে। প্রভাতসঙ্গীত কবির সদ্যোমুক্ত চিত্তের ভাবোচ্ছ্বাস বলিয়া ইহাতে তারল্য আছে, পুনরাবৃত্তি আছে এবং অনেক বিষয়ে আতিশয্য আছে। সেই জন্যই কবিতাগুলি অযথা দীর্ঘ। কবিতাগুলিতে কবির হৃদয়াবেগ প্রকাশ করিবার জন্য যতটা আকুলতা দৃষ্ট হয়, প্রকাশনের পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য ততটা দেখা যায় না। ছন্দোগত উৎকর্ষ ও আলঙ্কারিক চাতুর্যও ইহাতে নাই। আত্মাবিষ্কারের আনন্দে যে অসংযম স্বাভাবিক, তাহা এইগুলিতে দেখা যায়। অন্তর্যামী যেন এখনও তাঁহার জীবনরথের বল্গা ধারণ করেন নাই বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্র-কাব্যবিচারের ভূমিকা

বিদ্যালয়েই বালকবালিকাদের কাব্যপাঠের সূত্রপাত। আগে তাহারা পাঠ্যপুস্তকে যে বাংলা পদ্যগুলি পড়িত,—তাহাদের কাব্য বলা চলে না। গদ্যপাঠের ভঙ্গীতে সেগুলির অর্থ বোধ করিলেই তাহাদের পদ্যপাঠের কর্ত্তব্য সমাধা হইত। তারপর তাহারা প্রথম কবিতার সাক্ষাৎ পায় ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকে। ইদানীং ইস্কুলের বাংলা পাঠ্যপুস্তকেও ২।৪টি প্রকৃত কবিতার ঠাঁই হইয়াছে। বিদেশীয় ভাষায় লিখিত কবিতাগুলি আয়ত্ত করা সোজা নয়। বোধিকার সাহায্যে ও শিক্ষকের মুখে ব্যাখ্যা শুনিয়া সেগুলির অর্থবোধ করিতে হয়। বিদেশীয় ভাষায় রচিত কবিতার বহিরঙ্গ ও বিষয়বস্তু আয়ত্ত করিতেই তাহারা শ্রান্ত ও ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে এবং আসন্ন বিশ্রামের আশায় কাব্যপাঠের কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। রসবোধের প্রসঙ্গই উঠে না—শিক্ষকগণও সেজন্য মাথা ঘামান না। তাঁহারা জানেন বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের প্রবেশ নিষেধ।

কাব্যের রসসম্ভোগ মনের স্বচ্ছ প্রসাদ ও প্রাণের মুক্তির সহিত বিজড়িত। পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট বিদেশীয় অথবা প্রাচীন ভাষায় রচিত কবিতা পাঠের ব্যাপারে মনের প্রকৃতি প্রসন্ন, মুক্ত ও রসানুকূল থাকিতে পারে না। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রই এ ব্যাপারের নিয়ামক।—প্রশ্নপত্র রসবোধের পরীক্ষা করিবার পন্থা রচিত হয় না। বোধ হয় তাহা হইতেও পারে না। তাই পাঠদ্দশায় ছাত্রেরা যে কাব্যবিচার শিখে, তাহাতে রসসম্ভোগের দিকটা অর্থাৎ কাব্যের আস্বাদটাই বাদ পড়িয়া যায়। এই শ্রেণীর কাব্যবিচার পদ্ধতিটা তাহাদের মনে দৃঢ়মূল হয়, পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদ্দশায় কতকগুলি বিদেশীয় কাব্যবিচারের গ্রন্থ পড়িয়া। সেগুলিতে কাব্যের বিবিধ উপকরণের আলোচনাই মুখ্য, রসের কথা নিতান্ত গৌণ;—কাব্যের শরীরের কথা সেগুলিতে চৌদ্দ আনা, কাব্যের আত্মার কথা দুই আনা।

এই প্রকারের কাব্যবিচার-পদ্ধতি লইয়াই এতদিন আমাদের বেশ চলিতেছিল। এই পদ্ধতিতে আমরা রবীন্দ্রযুগের আগেকার স্বদেশীয় কাব্যের বিচার করিয়া প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি লিখিতেছিলাম। অনেকে চিরপ্রচলিত পদ্ধতিতেই রবীন্দ্রকাব্যেরও আলোচনা করিয়া আসিতেছিলেন। ইদানীং আমরা বুঝিতে পারিয়াছি "এহো বাহ্য আগে কহ আর।" রবীন্দ্রনাথের কাব্যবিচার ঐ পদ্ধতিতে সম্ভব নয়।

দেশে সাহিত্যসেবীদের মনে রবীন্দ্র সাহিত্যের একটা 'রস বিদ্যাপীঠ' গড়িয়া উঠিয়াছে। সে বিদ্যাপীঠের শিক্ষা অন্যরূপ, পঠন-পাঠনের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। সেখানে চিত্তের অবাধ মুক্তি ও স্বচ্ছ প্রসন্নতার সহিত কাব্যের মুগ্ধ পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়িতে পড়িতেই ক্রমে আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে, প্রচলিত গজকাঠির মাপে বা ওজনদরে রসভূয়িষ্ঠ রবীন্দ্র-কাব্যের মূল্য-মর্য্যাদা নিরূপিত হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ যে সকল তত্ত্ব, তথ্য, সমস্যা, সিদ্ধান্ত, আদর্শ ও চিন্তাকে উপাদানস্বরূপ এবং যে সকল ছন্দ, বাক্‌সম্পদ, অলঙ্কৃতি, রচনাভঙ্গি ও রচনার আকৃতি-প্রকৃতি-কে উপকরণস্বরূপ আশ্রয় করিয়া কাব্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন সে সকলের বিস্তৃত আলোচনা যে তাঁহার রচিত কাব্যের রসবোধে কোন সহায়তাই করে না,—তাহা আমি বলিতেছি না। বলিতে চাই, এ সকল তাঁহার কাব্য-সম্বন্ধে বহিরঙ্গের কথা—ইহাই তাঁহার কাব্যবিচারের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

অনেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটা ব্যঙ্গার্থ বা ধ্বনির আবিষ্কার করিতে পারিলেই কাব্যবিচার সম্পূর্ণ হইল মনে করেন। ব্যঙ্গার্থ বা ধ্বনি কাব্যের পক্ষে নেহাৎ বহিরঙ্গের কথা নয় সত্য—কিন্তু চরম কথাও নয়। ব্যঙ্গার্থ বা ধ্বনিই রস নয়—রসের পরিপোষক মাত্র অথবা রসের সহিত উপরিপাওনা মাত্র। Symbolical, Allegorical বা Universal significance যে কাব্যের পক্ষে চরম কথা নয়—এ তথ্যটি বুঝাইতে রবীন্দ্রনাথ নিজে 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের 'কাব্যের তাৎপর্য্য' নামক প্রবন্ধে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। রসানন্দ অপেক্ষা বোধানন্দ কাব্যের পক্ষে কখনই বড় কথা নয়।

কেহ কেহ রবীন্দ্রকাব্যে অনুভূতি-বিশেষের পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখিয়াই নিশ্চিন্ত। যেমন তাঁহারা বলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি চমৎকার—কারণ, ইহাতে কারুণ্য রসটি বেশ ফুটিয়াছে, পড়িলে চোখে জল আসে। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান—এই কারুণ্যরসটিও কাব্যের উদ্দিষ্ট ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর রস নয়,—ইহাও কাব্যের ভাবোপকরণ মাত্র। এই 'কারুণ্য ভাবের' সাহায্যে কবি কতটা রসসৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা না লক্ষ্য করিলে কাব্যবিচাব সম্পূর্ণাঙ্গ হইবে না।

কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের ক্রমবিবর্ত্তন ও চিন্তাধারার ক্রমপরিণতি দেখাইয়া রবীন্দ্রকাব্য বুঝাইতে চেষ্টা করেন। ইহাতে আমাদের ঐতিহাসিক মনোবৃত্তি যতটা তুষ্টিলাভ করে, রসবোধ ততটা তৃপ্ত হয় না। চিন্তাধারার ক্রমপারণতি হয়ত চলিতে পারে, কিন্তু কাব্যজীবনের ক্রমবিকাশ বয়ঃক্রমের ধারা ধরিয়া চলিবেই এমন কোন কথা নাই। রসজীবনের ধারা বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে এবং চিন্তাধারার ক্রমপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়াও আসিতে পারে। অথচ কবির বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে রসজীবনের ক্রমাভিব্যক্তি দেখাইবার একটা স্বাভাবিক নিষ্ঠা এই শ্রেণীর আলোচনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই অঙ্গস্বরূপ।

জরার আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে কবির রসজীবনের ধারা ক্ষীণতা লাভ করে। তাহা ছাডা, ঐ ধারা কবির জীবনে মাঝে মাঝে বন্যার মত আসে এবং সরিয়া যায়। মোটের উপর, কবির বয়ঃক্রমের সঙ্গে তাঁহার রস-জীবনের ক্রমোন্নতির বিশেষ সম্পর্ক আছে কিনা সন্দেহ। এই ধরণের কাব্যবিচারে রবীন্দ্রকাব্যের রসসম্ভোগে সহায়তা হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

কেহ কেহ বলেন—"কাব্য কবিমনের সৃষ্টি, কাব্য-বিচার করিতে গেলে কবি-মানসকেই বিশ্লেষণ করিতে হইবে। সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টা অনেক বড়। কাব্য একটি বিরাট কবিমানসের আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র। কাব্য ঐ কবিমনকে চিনাইয়া দেয় বা কবিচিত্তের গূঢ় লোকের সন্ধান দেয় বলিয়াই তাহার সার্থকতা। অতএব কাব্য যে রহস্যময় মনের প্রসব;

সেই মনের বিচারই প্রকৃত কাব্যবিচার। রবীন্দ্রনাথের কাব্যবিচার করিতে হইলে তাঁহার কবি মানসটিরই বিশ্লেষণ করিতে হইবে।"

এই বিশ্লেষণে রসবোধের কোন সহাযতা হয় না—একথা বলিতেছি না। বলিতে চাই,—কাব্যসম্বন্ধে ইহাই চরম কথা নয। এই ব্যাপারটা যতটা মনস্তত্ত্বের গণ্ডীতে পড়ে, ততটা রসতত্ত্বের অধিকারে আসে না। কীর্ত্তির চেয়ে কর্ত্তা যতই মহত্তর হউক, তাজমহলের চেয়ে শাহজাহানের চিত্ত যত বিরাটতরই হউক, রসজ্ঞ ও রসবিচারকের কাছে তাজমহলেরই মর্য্যাদা অধিক। আর যদি "মন দিয়ে যার নাগাল না পাই, গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই" কিংবা "সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই না তোমারে"—কবির এ উক্তি সত্য হয়—তবে স্রষ্টার চিত্তবিচার অপেক্ষা সৃষ্টির বিচারই অধিকতর বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মোটকথা,—রসবিচার স্রষ্টাকে লইয়া নয়, সৃষ্টিকে লইয়া। যতক্ষণ কবিমনের রসানুভূতি ছন্দোবদ্ধ বাক্যে বাহ্যরূপ লাভ না করিল, ততক্ষণ তাহা অন্যের ত কথাই নাই কবিরও অধিকারে আসিল না। কবিমন যত বিরাটই হউক, বিশ্বের কাছে তাহার কলারসে অভি-ব্যক্তিরই মূল্যমর্য্যাদা। ঐ অভিব্যক্তি আমাদের মনে কতটা রসোদ্বোধন করিতে পারে, রসবিচারকের দেখিতে হইবে তাহাই। কাষ্ঠের বিশ্লেষণের দ্বারা অগ্নির অথবা পঙ্কের বিশ্লেষণেব দ্বারা পঙ্কজেব বিচার হয না।

বিলাতী প্রথায কেহ কেহ কবির বাল্যেব শিক্ষা ও শিক্ষক, পারিবারিক ও সামাজিক পবিবেশ, উত্তরাধিকাব, মাতাপিতার প্রভাব, যুগধর্ম্ম, জাতীয় জীবনের অবস্থা ইত্যাদির সহিত কবিব প্রতিভাস্ফুরণের সম্বন্ধ দেখানোকেই কবির কাব্যবিচার মনে করিয়াছেন। ইহা বৈজ্ঞানিক বিচার, রসবিচার নয়। এই বিচারকেই যাঁহারা কাব্যবিচার মনে করেন, তাঁহারা কবিপ্রতিভাকে দৈবী শক্তি বলিয়া মনে করেন না, তাঁহারা ইহাকে নানাশক্তিব দৈবাৎ সংঘোটনাব ফল মনে করেন। এই পদ্ধতিতে মাইকেলের কাব্যবিচাব বরং চলিতে পারে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যবিচাব চলে না।

এতক্ষণ ত 'নেতি নেতি' চলিতেছে। প্রশ্ন হইতে পাবে, রবীন্দ্রকাব্যের বসবিচার তবে কি ভাবে করিতে হইবে?

রবীন্দ্রনাথের "গঠিত সাহিত্য-ভূমিতে একেবাবে ভূমিষ্ঠ" হইয়া একজন লেখকের পক্ষে তাঁহার কাব্যের রসবিচার করা বড় শক্ত। যাহারা উপভোগেই বিভোর—তাহারা উপভোগ্যের বিচাব-বিশ্লেষণ করিবে কি করিয়া? মধুকর যতক্ষণ মধুপান করে, ততক্ষণ তাহার গুঞ্জন করা-ত চলে না। যাহাই হউক, আমার যাহা মনে হয়, এসম্বন্ধে সসঙ্কোচে তাহারই কিছু কিছু ইঙ্গিত দিতে চাই।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলিকে যদি কোন রসসম্মত আদর্শের পরম্পরাক্রমে সাজাইয়া নূতন সংস্করণ করা হয়—অন্ততঃ তাহার একটি তালিকা প্রচার করা হয়, তাহা হইল রবীন্দ্র-কাব্যরস-বোধের যথেষ্ট সহায়তা করা হয়। শ্রদ্ধেয় মোহিত সেন মহাশয় একটা ভাবশৃঙ্খলায়

কবিতাগুলিকে সাজাইয়াছিলেন, তাহাতে রসবোধের যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছে, বহু প্রবন্ধের সাহায্যে তাহা হইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

বয়ঃক্রম বা কালক্রমের দিকে দৃষ্টির অপচয় না করিয়া কবির বিবিধ গ্রন্থের গ্রন্থিবন্ধন শিথিল করিয়া যদি কেহ রসদৃষ্টি-ভঙ্গির অনুসরণে কবিতাগুলিকে অধিকতর চাতুর্য্যের সহিত সাজাইতে পারেন,—তবে তিনি রসবোধে ও রসবিচারে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন।

✓ কবিগুরুর কাব্যে যে রস ঘনীভূত ও সংহত, তাহাই রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে অনেকটা তরল হইয়া বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এক হিসাবে রবীন্দ্র-শিষ্যগণের কাব্য গুরুর কাব্যেরই ছন্দোবন্ধে রস-সমালোচনা। ইঁহাদের কাব্যের রসগ্রহণ করা আদৌ কঠিন নয়—এই সকল কাব্যের সাহায্যে রবীন্দ্রকাব্যের নিবিড়তর ও গূঢ়তর রসের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। প্রতিবিম্বের সাহায্যে ভাস্বরপদার্থের স্বরূপ কতকটা বোঝা যায় বৈ কি!

যদি কেহ রবীন্দ্ররচনাবলী হইতে উৎকলিত রসঘন অংশগুলি ভিন্ন ভিন্ন রসদৃষ্টিভঙ্গির সূত্রে গাঁথিয়া মালিকা রচনা করেন,—তবে তিনিও রসসম্ভোগে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। অবশ্য এই রচনায় পরিচয়াত্মক টীকাটিপ্পনী থাকিবে, এবং রচয়িতার নিজস্ব বক্তব্যটুকু রস বোধের সূত্র হিসাবে সূত্রের মতই ক্ষীণ হইবে। উৎকলিত অংশগুলির নির্বাচনে ও বিন্যাসে যথেষ্ট রসজ্ঞতা ও সতর্কতার পরিচয় দিতে হইবে—সেগুলি যেন "সূত্রে মণিগণা ইব" অবাধে ভাস্বর হইয়া শোভা পায় এবং একটী মণির লাবণ্য তাহার পূর্ব্বের ও পরের লীলাসঙ্গিদ্বয়ের বিচ্ছুরিত অঙ্গদ্যুতির সহিত মিলিয়া ব্যবধানটুকুকে যেন ভরিয়া দেয়।

✓ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আর একটি কবিতার রসবোধের যেমন সহায়ক এমন আর কিছুই নয়। কোন্ কবিতার রসবোধে কোনটি সহায়ক তাহা স্থির করিয়া সামান্য একটু টিপ্পনীর সহিত পাশাপাশি দেখাইলে বিনা আয়াসেই রসোদ্বোধন সম্ভব হয়। তাহারাই একে অন্যের রসপরিচয়ের ভার লইতে পারে। কবি অনেক সময় যে কথাটিকে একটি কবিতায় বিবৃত করিয়াছেন মাত্র —ঠিক সেই কথাটিকেই আর একটি কবিতায় অভিনব রসরূপ দান করিয়াছেন। অর্থাৎ একটি কবিতায় যাহা বিবৃতিমাত্র, অন্য কবিতায় তাহাই নূতন একটি সৃষ্টি। কবি অনেক সময় একই ভাববস্তুকে বিভিন্ন পরিচ্ছদে মণ্ডিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রসা-বেষ্টনীর মধ্যে এমন কৌশলে উপনিবিষ্ট করিয়াছেন যে, সহজে ঐকিকতাটী ধরা যায় না। আবার একই পরিচ্ছদে ভিন্ন ভিন্ন ভাববস্তুকে গুণ্ঠিত করিয়া একই শ্রেণীর রসসৃষ্টি করিয়াছেন,—এই ঐকিকতা ও বৈচিত্র্য ধরিয়া ফেলাই রসবিচারের উপক্রমণিকা। ধরিয়া ফেলার সহায়তা করাই রস-সমালোচকের কাজ।

কবিগুরুর অনেক কবিতার রসসম্ভোগ নির্ভর করে তাহাদের কলাশ্রীসঙ্গত বিশুদ্ধ সরস আবৃত্তির উপর। আবৃত্তি-চাতুর্য্য এক এক জনের কণ্ঠে অভিনব সৃষ্টি হইয়া উঠে। বিশেষতঃ কাকু ও উদীরণভঙ্গির বৈচিত্র্য রসকুহরের মুখগুলি উন্মুক্ত করিয়া দেয়। তাহাই সুকণ্ঠে আবৃত্তি শুনিলে অনেক কবিতার রসটি সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়।

সুগায়কের কণ্ঠে গীতিগুলিকে উদ্‌গীত হইতে শুনিলে লাভ আরও অধিক হয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের কুহরে কুহরে সঙ্গীতের মাধুরী প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, আবৃত্তির ও গানের মধ্য দিয়া কি করিয়া তাহার আভাস পাওয়া যায়, তাহার সূত্রগুলি দেখাইয়া দেওয়া রস-সমালোচকের কর্ত্তব্য।

✓ নীরস পণ্ডিতী ভাষা বা ভঙ্গিতে রসসাহিত্যের সুষ্ঠু সমালোচনা হয় না। সমালোচনার উদ্দেশ্য যদি হয় রসোদ্বোধন, তবে তাহার দ্বারা একটা সরসসুন্দব আবেষ্টনীরও সৃষ্টি করিতে হয়। ভাষারনীরসতা, জটিলতা ও আবিলতা যদি মুহুর্ম্মুহুঃ মনের রসভঙ্গই করিয়া দেয়, তবে কাব্যের রসোদ্বোধন কি করিয়া সার্থক হইবে? প্রবচনের দ্বারা বা বক্তৃতার দ্বারা রসের পথে লইয়া যাওয়া যায় না, ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা ও বক্রোক্তির সাহায্য লইতে হয় অর্থাৎ ভাষা পুষ্পিত, রসাঢ্য ও ইঙ্গিতব্যঞ্জনাময় হওয়া চাই। ইংরাজি হইতে তরজমাকরা ভাষায় ববীন্দ্রকাব্যের বিচার করা চলে না। এক কথায় রসসাহিত্যের আলোচনা রসসাহিত্যের দ্বারাই সম্ভব। প্রত্যাশা কবা যায়, রবীন্দ্রকাব্যের Criticism নিজেই একটা Creation হইবে।

রবীন্দ্রকাব্য বিচার করিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের নানা শ্রেণীর কাবতা হইতে বহু অংশ উৎকলন করিতে হইবে, ঐ উৎকলিত অংশগুলির রসবত্তা নিশ্চয়ই চমৎকার। সে গুলির সহিত যদি আগের ও পরের গদ্যাংশের অর্থাৎ বিচারকের নিজস্ব অংশেব রসসামঞ্জস্য না থাকে, তবে তত্ত্ববিচার চলিতে পারে, রসবিচার চলে না। মোট কথা, কাব্যের ভাষায় আলোচনা করিলে গদ্যাংশ ও পদ্যাংশের মধ্যে ক্রমভঙ্গগুলি রসভঙ্গে পরিণত হইবে। সবুজঘাসে ভরা ঢালু দীঘির পাড যেমন করিয়া শৈবাল ও পদ্মবনে ভরা দীঘির জলেব সঙ্গে মিশিয়া যায়, তেমনি করিয়া রসবিচারকেব নিজস্ব অংশগুলি কবিগুরুর উৎকলিত কাব্যাংশের সহিত মিলিয়া গেলে রস উপলব্ধিতে পাঠকচিত্ত কোন বাধা পাইবে না।

কবিগুরু স্বয়ং এইশ্রেণীর বসবিচারেব উদাহরণ দিয়াছেন। তাঁহার সংস্কৃত কাব্যের ও লোকসাহিত্যেব রসবিচার যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহাদের অবিদিত নাই রসসাহিত্যের আলোচনা কি ভাষায়, কি ভঙ্গিতে, কি আদর্শে হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। বলা বাহুল্য, কবির পক্ষে প্রত্যাশা করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, তাঁহার নিজের কাব্যের রস-সমালোচনাও ঐ ভাবেই হইবে।

কবিগুরুর অনেক কবিতার রসবোধেব সূত্র তাঁহার রচিত সহিত্যসম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি, জীবনস্মৃতি ও ছিন্নপত্রধানীর মধ্যে সন্ধান করিলে পাওয়া যায়। সেই সূত্রগুলির আবিষ্কার করিয়া তদনুগত কবিতাগুলির সহিত মিলাইয়া দেখাইতে পারিলে রসবিচারে যথেষ্ট সহায়তা করা হয়। আমি অনেকটা গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজার কথা বলিতেছি।

কবিগুরুর যে সকল উক্তিতে সৎকাব্যের আদর্শ ব্যাখ্যাত হইয়াছে বা সৎকাব্যের লক্ষণাবলীর ইঙ্গিত আছে, সেই সকল উক্তির মূল্য সব চেয়ে বেশি। কারণ, কবি নিজে সেই আদর্শে আপন কাব্য নিশ্চয়ই রচনা করিয়াছেন, এ প্রত্যাশা করা যায়। বিশেষতঃ এদেশে তাঁহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ রসজ্ঞ কেহই নাই; নানা রচনায় রস-সম্ভোগের তিনি যে ইঙ্গিতগুলি দিয়াছেন তাহাদের চেয়ে অমোঘতর ইঙ্গিত কোথায় মিলিবে? অনেক স্থলে একই বাণী, একই সত্য এমন কি একই রসধর্ম্ম তাঁহার গদ্যে ফলিত এবং পদ্যে পুষ্পিত হইয়াছে।

'কবিরে খুঁজোনা কবির জীবন-স্মৃতিতে'—এমন কথাত কবি কোথাও বলেন নাই, "জীবন-চরিতে" খোঁজার সম্বন্ধেই তাঁহার আপত্তি। যে অনুভূতিগুলি কবিতা হইয়া রসসৌরভে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাদের বৃন্তগুলি জীবন-স্মৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। তাই মনে হয়, জীবনস্মৃতির দপ্তরখানা ও ছিন্নপত্রখানীর মধ্যে কবির বহু কবিতার রসকক্ষের কুঞ্চিকা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

উপমা আনুরূপ্যের (Simile ও Analogy) সাহায্যে কবিগুরুর কোন কোন কবিতার রসমর্ম বুঝানো যাইতে পারে। এ প্রথাও রস-বিচারের অঙ্গীভূত। যেমন কবির 'নিশীথে ও প্রভাতে' কবিতাটিকে কেহ যদি বলে, শরতের সেফালির মত। নিশীথের ফেনিলোচ্ছল যৌবনের সম্ভোগটুকু সেফালির অরুণাংশ, আর প্রাতের মন্দিরপথে গৃহলক্ষ্মীর শুচিতাটুকু তাহার শিশিরধৌত শুভ্রাংশ, আর কবিতার রসটুকু সেফালির মৃদুগন্ধের মতই মৃদু। অথবা কবির 'কাঙ্গালিনী' কবিতাটিকে কেহ যদি বলে করুণালক্ষ্মীর বেদীর নীচে যেন একটি মঙ্গলকলস অশ্রুজলে ভরা; কবির দরদটুকু,—বহিরঙ্গের দিক হইতে দেখিলে কবিতার শেষ চারিটি পল্লব —ঐ কলসীর মুখে স্নিগ্ধ শ্যামল সহকারশাখা; তাহা হইলে কি একভাবে রসোদ্বোধনে সহায়তা করা হয় না?

যদি সম্ভব হয়, তবে কোন কোন দেশী বা বিদেশী সুপরিচিত কবিতার সহিত রসানুরূপ্য বা ভাবসামীপ্য দেখাইয়াও রবীন্দ্রকাব্যের অন্তর্গূঢ় রসের সহিত পরিচিত করা যাইতে পারে।

'কবির সৃষ্টি পাঠকচিত্তে সৃজনশক্তির উদ্বোধন করে।' কবির সৃষ্টি এক হিসাবে অসম্পূর্ণ, পাঠক আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া লইলে তবে তাহা সম্পূর্ণাঙ্গ হয়। অর্থাৎ রস উপভোগ করিতে হইলে কবির সৃষ্টিকে মনের কলাভবনে পুনর্গঠন করিয়া লইতে হয়। এই পুনর্গঠনে সহায়তা করাই প্রকৃত রস-সমালোচকের কাজ। ঐ সৃজন-শক্তির প্রেরণা আছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অঙ্গে অঙ্গে। ঐ প্রেরণাগুলির দিকে পাঠকচিত্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে,—ভাব, ভাষা, ও ভঙ্গির ইঙ্গিতব্যঞ্জনার উদ্দিষ্ট রসবস্তুকে চিনাইয়া দিতে হইবে—অকথিত বাণীগুলির সন্ধান দিতে হইবে, যাহা প্রচ্ছন্ন তাহাকে আবিষ্কার করিতে হইবে—অব্যক্ত অপূর্ব্বতার সন্ধান দিয়া পাঠকচিত্তকে রসের পথে ভুলাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। তাই বলিতে ছিলাম, রবীন্দ্রনাথের রস-ঘন কবিতার বিচারও হইবে একটি নূতন সৃষ্টি; তাহার আধা দিবেন কবি, আধা দিবেন রসিক।

যত বড় রসিকচিত্তই হউক, রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যের বিচিত্র অঙ্গসৌষ্ঠব ও অফুরন্ত অন্তঃসম্পদের প্রত্যেকটি তাহার গোচরে আসিবে,-এমন ত মনে হয় না। যাঁহারা রসের উদ্বোধন করিতে চাহেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য, রবীন্দ্রনাথের ছন্দে, পদবিন্যাসে, অলঙ্করণে, লীলা-ভঙ্গিতে, গঠনপারিপাট্যে, রসসৃষ্টির বৈচিত্র্যে, অনুভূতির বৈশিষ্ট্যে ও ভাবের ব্যঞ্জনা ও গাঢ়তায় যেথানে যতটুকু রসোপকরণ বিদ্যমান, সবটুকু দেখাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা। প্রত্যেকটির সন্ধান না জানিয়া যে একেবারে রসোদ্বোধন করা যায় না—তাহা নয়, তবে কাব্যের পরিপূর্ণ উপভোগের জন্য সকলগুলিরই প্রয়োজন।

রসবিশ্লেষণের দ্বারাও রসোদ্বোধন হইতে পারে। রসবিশ্লেষণ করিতে হইলে কবিতার বিষয়বস্তু, ভাব বা মর্ম্মকথা, অনুভূতির প্রেরণা, ব্যঙ্গার্থ ও ধ্বনি, রূপসৌষ্ঠব, রচনাভঙ্গি, সঙ্গীত-মাধুর্য্য, চিত্র সৌষম্য, ছন্দ, পদবিন্যাস, অলঙ্কৃতি ও বহিরঙ্গের অন্যান্য সৌষ্ঠব ও পারিপাট্যের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ, কোন দুই-একটা অঙ্গ বা উপকরণের সহিত রস অভেদাত্মক নহে, সকল গুলির সমবায়েই তাহার উন্মেষ ও পরিস্ফূর্ত্তি।

কোন একটি বিশিষ্ট অনুভূতির দ্বারা আবিষ্ট মনের প্রকৃতির নাম Mood কেবল কাব্যের প্রেরণার মূলে কোন্ অনুভূতির অবস্থিতি তাহার উল্লেখই যথেষ্ট নয়, ঐ অনুভূতির বিশিষ্ট Moodটি রসসৃষ্টিকে ও রসদৃষ্টিকে কি ভাবে কতটা অনুরঞ্জিত করিতেছে, তাহাও বলিতে হয়।

অনুভূতি যাহাকে আশ্রয় করিয়া রসমূর্ত্তি ধরে, তাহাই কাব্যের মেরুদণ্ড, তাহা বস্তুও হইতে পারে, ভাবও হইতে পারে। ঐ ভাব রহস্যঘন, যুক্তিগর্ভ, সর্ব্বজনীন ও নিত্যধর্ম্মাত্মক হইলেই তত্ত্ব। কবিতা কোন' তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিলে তত্ত্বটিকে বিশ্লেষণ করিয়া আশ্রিত অনুভূতির সহিত তাহার মৈত্রীসম্পর্কটা পরিচ্ছন্ন করিয়া দেখাইতে হয়।

যে সকল কবিতা চিত্রাত্মক বা বর্ণনাত্মক নয়, তাহাদের অন্তরে সাধারণতঃ ব্যঙ্গার্থ ও ধ্বনি থাকে। "নানা জনে লয় তার নানা অর্থ টানি।" সেই ব্যঙ্গার্থগুলিকে আবিষ্কার করিয়া তাহারা কোন্ কোন্ ধ্বনির দ্যোতনা করিতেছে তাহারও বিবৃতি আবশ্যক।

চিত্রাত্মক বা বর্ণনাত্মক কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যে সৌষম্য ও সামঞ্জস্য আছে তাহা দেখাইতে হয়, সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও সাময়িক রসাবিষ্টতা চিত্র বা বর্ণনাকে কিরূপ বর্ণানুরঞ্জিত করিয়াছে তাহাও বলিতে হয়।

তারপর সঙ্গীতমাধুর্য্যের কথা। ইহা শব্দঝঙ্কার বা ছন্দোহিল্লোল মাত্র নয়, ইহা কাব্যের সেই অন্তরঙ্গ সুরের কথা, যাহা কাব্যকে অন্যান্য ছন্দোবদ্ধ উপসৃষ্টি হইতে স্বাতন্ত্র্যদান করিয়াছে। কবিতাবিশেষের অন্তরের ঐ সুরের সহিত তাহার অনুভূতির প্রেরণার কিরূপ মৈত্রী ও সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে, তাহা বুঝানো চাই। বহিরঙ্গের গঠনবৈচিত্র্যগত অপর্ব্ব সুক্ষ্মভাস্কর্য্যশ্রীর সহিত রবীন্দ্রকাব্যের রস ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। কাব্য শরীরের লালিত্য ও লাবণ্যই রসের একটি প্রধান আশ্রয়। সেজন্য, রচনাভঙ্গি, পদবিন্যাসচাতুর্য্য, ছন্দোরূপ ইত্যাদির যেখানে যতটুকু সৌষ্ঠবশ্রী আছে তাহাও দেখাইতে হয়। কোন অলঙ্কারটি, কোন শব্দটি, কোন সুক্ষ্ম চাতুর্য্যশ্রী (Subtlety) রসসৃষ্টির সমবেত সাফল্যে কতটুকু সহায়তা করিয়াছে তাহাও বিশদভাবে দেখাইতে হয়। পরে এই সকলের সৌষম্য (Harmony) টুকু পাঠককে দেখাইয়া দেওয়া উচিত।

এক্ষেত্রে কবির ব্যবহারিক জীবনের কোন মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার মানস-জীবনের সম্পূর্ণ সন্ধান না রাখিলে কিছুতেই চলিবে না। সর্ব্বোপরি দেখিতে হইবে, রবীন্দ্র-নাথের জীবনাদর্শের গূঢ় বাণীটি কি, এই বাণী কতপ্রকারে রূপরূপান্তর লাভ করিয়াছে, কবির মানস-জীবনের সহিত সমগ্র সৃষ্টি, বিশ্বপ্রকৃতি, মহামানব, যুগযুগান্ত, দেশদেশান্তর, নারীজগৎ,

বিশ্বমানব, ঐহিক জীবন, দৈহিক মৃত্যু, পরলোক, পরমাত্মা বা অব্যক্ত অনন্তের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে সেই বাণী কি বিচিত্র অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে'। দেখিতে হইবে,—সমাজ, সংসার, জাতীয়তা, রাষ্ট্রিয়তা, ধর্ম্ম, পরিবারিক জীবন ইত্যাদি মানব-সভ্যতার প্রতি অঙ্গে কবি-রবির ভাস্বর জীবনাদর্শ কি অভিনব আলোক-সম্পাত করিয়াছে।

মোটের উপর এই সমস্ত উপাদান উপকরণের কৌশলময় সমবায়ে কিরূপে রসসৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে তাহার বিবৃতিই কাব্যরস বিশ্লেষণ।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইহার চেয়ে রসবিচারাদর্শের গ্রন্থ লিখিয়া পাঠককে বলা ভালো, এই আদর্শ অনুসারে রবীন্দ্রকাব্যকে মিলাইয়া লও। অনেকটা তো তাহাই বটে। রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনা করিতে হইলে, আদর্শ রসবিচারের গ্রন্থই লিখিতে হইবে, কারণ, রবীন্দ্রকাব্য আদর্শকাব্য। কেবল, ঐ গ্রন্থের দৃষ্টান্ত ও উদাহরণগুলি রবীন্দ্রকাব্য হইতে উৎকলন করিলেই চলিবে।

কেহবা বলিতে পারেন, এ কাব্যবিচার ত রসজ্ঞদের জন্য। রসিক-জনের জন্য এত আয়োজনের প্রয়োজনই বা—কি? অরসিকের জন্য কি ব্যবস্থা? আমি বলি, সকলেইত জানেন,—তাহাদের জন্য কোন ব্যবস্থারই প্রয়োজন নাই। যাহার রসবোধ আছে তাহার রসবোধকে পরিপুষ্ট, মার্জ্জিত, শাণিত, উদ্দীপিত ও সম্পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য, সুপ্ত রসবোধের প্রবোধনের জন্য ও রসজ্ঞগণের সঙ্গে আনন্দ-বিনিময়ের গভীরতর আনন্দলাভের উদ্দেশ্যেই এই শ্রেণীর রসবিচার।

আর এক কথা। যে ভাবে বিচারবিশ্লেষণের কথা বলা হইল, তাহা বিশেষ বিশেষ কবিতা সম্বন্ধেই খাটে—সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যকে জড়াইয়া ধরিলে ঐ প্রথা চলে না। প্রকৃত রস-বিচার বা বিশ্লেষণ নির্দ্দিষ্ট কোন সৃষ্টিকে লইয়াই সম্ভব, সৃষ্টিপরম্পরা বা সৃষ্টিপুঞ্জকে লইয়া নয়,—অথবা স্রষ্টার মতিগতি, মানস-প্রকৃতি, জীবনী বা সাধনা লইয়াও নয়। রবীন্দ্রনাথের সমগ্রকাব্যের বিস্তার, বিশালতা, বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য বা পরম্পরা লইয়া যাহা কিছু লিখিত তাহা তাঁহার কবিমানস, কবিজীবন বা কবিব্রতের পূর্ণ বিচার হইতে পারে, সম্পূর্ণাঙ্গ রসবিচার নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা তত্ত্ববিচারেই পর্য্যবসিত হয়। সাধারণভাবে কবিমনের ক্রমবিকাশ, চিন্তাসূত্র, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনাদর্শ, রচনাভঙ্গি ইত্যাদি লইয়া কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই, তাহা-ত আমি বলিতেছি না। আমি কেবল বলিতে চাই—

"এহো বাহ্য আগে কহ আর।"

রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য

রবীন্দ্রনাথের অপরিমেয় সৃজনশক্তি ও সৃষ্টির চরমোৎকর্ষের সহিত সৃষ্টির অসাধারণ প্রাচুর্য্যের কথা চিন্তা করিলে মনে হয় না, একজন মানুষের দ্বারা (সে মানুষ যত বড়ই হউক) এই বিরাট সারস্বত সাধনা সম্ভবপর। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য মন দিয়া পড়িলে মনে হয়, ইহা যেন ব্যক্তিবিশেষের নয়, ইহা যেন একটা সমগ্র জাতির সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকে একটা আকস্মিক ঘটনা (accident) বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে একেবারে আকস্মিক বলা চলে না।

ইংরাজশাসনের সঙ্গে এদেশে ইংরাজি শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতা প্রপাত-ধারার মত আসিয়া পড়িল এবং এদেশের শিক্ষাদীক্ষা ও কৃষ্টির সহিত তাহার একটা সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। এই সংঘর্ষের ফলে সমগ্র জাতীয় জীবন আলোড়িত হইয়া উঠিল। এই দ্বন্দ্বে কোথাও বিজাতীয় সংস্কৃতির জয়, কোথাও জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন এবং কোথাও উভয় সংস্কৃতির মধ্যে সন্ধি-সামঞ্জস্য ঘটিতে লাগিল। এই আলোড়নের প্রথম ফল রামমোহনের আবির্ভাব এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজের উদ্ভব। এই সংস্কৃতিদ্বন্দ্বের আলোড়নের ফলে কোন কোন অনুকূল পরিবেষ্টনীতে মৃতপ্রায় ভারতীয় সংস্কৃতিরও পুনর্জীবন লাভ হইয়াছিল এবং প্রাচীন সভ্যতার লুপ্তপ্রায় ও বিস্মৃতপ্রায় বহু অঙ্গের পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এ বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। মোটের উপর, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংঘর্ষে ভারতীয় সংস্কৃতি দুর্বল না হইয়া বলীয়ানই হইয়াছিল। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধ্বজাধারী হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ এক চূড়ান্ত সীমায়, রক্ষণশীল হিন্দু পণ্ডিতগণ অন্য চূড়ান্ত সীমায়। এই দুই সম্প্রদায়ের সন্ধি-সামঞ্জস্য হইয়াছিল সে কালের আদি ব্রাহ্মসমাজে। এই ব্রাহ্মসমাজের নেতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনভূমি ছিল 'জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার'।

ভারতের অতীত সংস্কৃতিধারার পুনর্জীবন লাভে ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অভিযানে জাতীয় জীবনে রাশি রাশি উপাদান উপকরণ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। এইগুলি সাহিত্য-ক্ষেত্রে একজন প্রতিভাবান্ স্রষ্টার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মিলনের নামই সৃষ্টি-শক্তির সঞ্চার। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনে জাতীয় জীবনে একটা সিসৃক্ষার (creative tendency) সঞ্চার হইল। জাতীয় জীবনের তুমুল আলোড়নে একটা শক্তিরও উদ্ভব হইল। এই শক্তি জাতির পরিক্ষীণা সৃজন-শক্তিকে উজ্জিতা করিয়া তুলিল। মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিম ইত্যাদি কয়েকজন সাহিত্যস্রষ্টারও আবির্ভাব হইল। কিন্তু রূপান্তরিত জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তির পক্ষে শুধু তাঁহাদের প্রতিভাই যথেষ্ট নয়।

জাতীয় জীবনের নবপ্রবুদ্ধ অপরিমেয় সৃজনশক্তি একজন মহামানবের জীবনে আত্মাভিব্যক্তি লাভের জন্য উৎকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। যে আবেষ্টনীর মধ্যে এইরূপ মহা-

মানবের আবির্ভাব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, ঠিক সেই আবেষ্টনীতেই তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার জীবনের মধ্য দিয়াই সমগ্রজাতির সৃজনশক্তি, সাধনা ও আশা আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের শক্তিকে ব্যক্তিবিশেষের শক্তি বলিয়াও মনে হয় না, তাঁহার আবির্ভাব একেবারে আকস্মিক তাহাও বলা যায় না। সমগ্র জাতির শতাধিক বর্ষের তপস্যার ফল আমরা রবীন্দ্রনাথের অবদানমালায় পাইয়াছি। জাতির শতাব্দীব্যাপী সৃজন-তৃষ্ণার তৃপ্তি হইয়াছে—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায়।

দুর্লভ দৈবী শক্তি লইয়া অথবা জাতির তপস্যালব্ধ সৃজনশক্তি লইয়া রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে শক্তিকে যে সকল সুযোগসুবিধা ও অনুকূল অবস্থা ও ব্যবস্থা পরিপুষ্ট করিয়াছে তাহাদের মূল্যও অল্প নয়। অসাধারণ প্রতিভাকে কোন বাধাবিঘ্ন ব্যাহত করিতে পারে না—তাহা বাধাবন্ধ ভেদ করিয়া সার্থকতা লাভ করে একথা সত্য। সৃষ্টির উৎকর্ষকে বাধাবিঘ্ন ক্ষুণ্ণ করিতে না পারে, কিন্তু সৃষ্টির প্রাচুর্য্যকে ব্যাহত করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির উৎকর্ষ ও প্রাচুর্য্য শেষ জীবন পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাহার কতকগুলি কারণ আছে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে প্রতিভার উন্মেষ ও সর্ব্বাঙ্গীণ বিস্তার ও অভিব্যক্তি সাধনে রবীন্দ্রনাথকে বিধাতা নিম্নলিখিত সুযোগগুলি দিয়াছিলেন—

অগ্রগতিশীল সংস্কার-মুক্ত ধনী পরিবারে আদর্শস্থানীয় ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাপ্রাজ্ঞ মহাপুরুষের পুত্ররূপে জন্ম, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির শুভ মিলনতীর্থে আবির্ভাব, সর্ব্ববিধ শিক্ষাদীক্ষায় সমুন্নত পরিজনগণের সাহচর্য্য, স্বাচ্ছন্দ্যময় সুরুচিশোভন আভিজাত্যের আবেষ্টনীর মধ্যে প্রতিপালন, শিক্ষাবিষয়ে সম্পূর্ণ অবল্পিত স্বাধীনতা, প্রকৃতির সহিত শৈশবজীবনে ব্যবধান, দূর হইতে তটস্থভাবে পল্লী-জীবনের সহিত পরিচয়, স্বাধীনভাবে সমগ্র দেশময় বিচরণ, পৃথিবী-পর্য্যটনের সুবিধা ও প্রবৃত্তি, যৌবনারম্ভ হইতে ইউরোপীয় বিদ্বৎসমাজের সহিত পরিচয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব ও ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ, উপনিষদের শিক্ষা, জীবিকার্জ্জনের ক্লেশ ও দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি ; অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য, নিরবচ্ছিন্ন অবসর, সুদীর্ঘ জীবন, সংসার-বন্ধন হইতে ক্রমে ক্রমে মুক্তি, রসজ্ঞ ও বিদ্বজ্জনের সংসর্গ ও উৎসাহলাভ, তত্ত্ববোধিনী, ভারতী, বালক, সাধনা, বঙ্গদর্শন ও প্রবাসীর রসতৃষ্ণার আবেদন, শান্তিনিকেতনের শান্তিময় আবেষ্টনী ইত্যাদি। এইগুলি ছাড়া অন্যান্য সহায়কগুলি কবির অসামান্য চরিত্রেরই অঙ্গ। যেমন—

১। গভীর দেশাত্মবোধ। ২। বঙ্গভাষার প্রতি আবাল্য অনুরাগ। ৩। প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রীতি। ৪। সর্ব বিষয়ে সংযম। ৫। অপরিমিত সাহস ও বিক্রম। ৬। নিজের অলোকসামান্য শক্তি সম্বন্ধে আশৈশব সচেতনতা। ৭। দুর্দম উচ্চাভিলাষ। ৮। অদম্য অধ্যবসায়। ৯। অতৃপ্য পাঠানুরাগ। ১০। সারস্বতসাধনায় ক্লান্তিহীনতা। ১১। যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি—জীবনের মূলমন্ত্র হওয়া। ১২। অসাধারণ শোক-বিজয়ের শক্তি। ১৩। আভিজাত্যে সমুন্নত মনের মার্জিত রুচি ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় সব চেয়ে যাহা চোখে পড়ে—তাহা তাঁহার অসাধারণ স্বাতন্ত্র্য। তাঁহার এই স্বাতন্ত্র্য তাঁহার মানসিক আভিজাত্য ও চরিত্রগত কৌলীন্য হইতে সঞ্জাত।

এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ এ দেশের কবি, সাহিত্যিক, ভাবুক ও চিন্তানায়কদের স্বাভাবিক পরম্পরা হইতে বিচ্যুত। Wordsworth, Milton' এর উদ্দেশে যাহা বলিয়াছিলেন (Thou wert a star that dwelt apart) রবীন্দ্রনাথকে তাহাই বলা যায়!

রবীন্দ্রনাথ যুগপ্রবর্ত্তক কবি—নিজেই নিজের যুগ রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির রচনাভঙ্গী, রসাদর্শ বা ভাবধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সগোত্রতা নাই বলিলেই চলে। বিহারীলালের কাব্যধারার সহিত যৎসামান্য মিল দেখানো যাইতে পারে—কিন্তু তাহা পাঠশালার গুরুগিরির মত। কবি প্রথম জীবনে বিহারীলাল ও হেমচন্দ্রের ধারার অনুসরণ করিয়া রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৈশোর উত্তীর্ণ হইবার আগেই তিনি নিজস্ব স্বতন্ত্র সুরটির সন্ধান পাইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের প্রাচীন ও অর্বাচীন যুগের কবিদের রচনা শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও অনুসরণ করিবার জন্য অথবা কাহারও ভাববস্তু গ্রহণের জন্য নয়, তাঁহাদের সকলকে এড়াইয়া চলিবার জন্য। বলা বাহুল্য, তাঁহার প্রকৃতিগত আত্মশক্তি-দৃপ্ত স্বাতন্ত্র্যবোধই তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া যাইতে প্রণোদিত করিয়াছিল। তবু কোথাও সাদৃশ্য অথবা পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া না যায়, সেজন্য তিনি সর্ব্বদা সতর্ক ছিলেন। ব্যাস-বাল্মীকির মহাকাব্যের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল—তাঁহাদের কাব্য হইতে তিনি কথাবস্তু গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নূতন Interpretation দিয়া তিনি সেগুলিতে নিজস্ব সৃজনশক্তির প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আর একজন সংস্কৃত কবির কাব্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তিনি কালিদাস। বলা বাহুল্য, তিনি কালিদাসেরও অনুসরণ করেন নাই, তাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। কালিদাস কেবল ভারতেরই,—রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বের!

তারপর বাংলার বৈষ্ণব কবিদের কথা। অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ বুঝি বৈষ্ণব কবিদের অনুসরণ করিয়াছেন। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। যাঁহারা বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী ও রবীন্দ্রনাথের রচনা দুইই ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা একথা বলিবেন না। বৈষ্ণব কবিদের রচনা-সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া কবি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং বৈষ্ণব কবিদের অনুসরণে প্রথম জীবনে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী লিখিয়াছিলেন, সেজন্য বোধ হয় অনেকের এই ধারণা। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর উপজীব্য একমাত্র রাধাকৃষ্ণের নামে নরনারীর প্রেম। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই প্রেম একটা অপ্রধান অঙ্গ মাত্র। তাহা ছাড়া, বৈষ্ণব কবিদের প্রেম আর রবীন্দ্রনাথের প্রেম এক বস্তু নয়। বিদ্যাপতি ও তাঁহার অনুসারকদের বর্ণিত রিরংসামূলক প্রেমের স্থান রবীন্দ্র-কাব্যে নাই। বৈষ্ণব কবিদের আধ্যাত্মিক প্রেম ও রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক প্রেমও এক বস্তু নয়। বৈষ্ণব কবিদের প্রেমের কবিতায় আধ্যাত্মিক সার্থকতাকে নিগূহিত করা হইয়াছে—ঐশ্বর্য্যের সমাবেশে মাধুর্য্যের হানি হইবে এই ভয়ে। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক প্রেমের কবিতায় অধ্যাত্মভাবকে কোথাও স্পষ্টভাবে, কোথাও ব্যঞ্জনায় প্রকাশই করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রেমের কথায় অসীম অনন্তের কোন সরূপ প্রতীক বা ভাববিগ্রহ স্বীকার করেন নাই। চণ্ডীদাস

ছাড়া অন্যান্য বৈষ্ণব কবিরা কতকগুলি Convention অনুসরণ করিতেন, রবীন্দ্রনাথ সে সব Convention বর্জন করিয়াই চলিয়াছেন। আবার চণ্ডীদাসের ভাবাকুলতারও তিনি অনুসরণ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ সংযম এই শ্রেণীর হৃদয়াবেগের আতিশয্যের পক্ষপাতী ছিল না।

প্রেমের বিচিত্র লীলাবিলাস বিবৃত করিবার যে ভাষা দেশে প্রচলিত ছিল, বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ সে ভাষাকে প্রৌঢ়কাল পর্য্যন্ত বর্জ্জন করেন নাই। সে ভাষাকে তিনি অলঙ্কার-চাতুর্য্যে মণ্ডিত একটা মার্জ্জিত সুপরিচ্ছন্ন রূপ দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত ভাষা হইতে আহৃত বৈষ্ণবকবিদের প্রবর্ত্তিত ছন্দগুলিকে মাতৃভাষার সাধারণ সম্পদ হিসাবে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন। এই সকল ছন্দের মাধুর্য্য ও মহিমা রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এই সকল ছন্দ রবীন্দ্রনাথের পুনরাবিষ্কারের মত। কবি এই সকল ছন্দেও নিজস্ব কৃতিত্বের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং বহুরূপে বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি একই প্রকার মাত্রাবিন্যাসের হ্রস্ব দীর্ঘ চরণের সুরসঙ্গত সমাবেশে স্তবক (stanza) রচনার পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন।

দেশের অন্য কোন কবির সহিত রবীন্দ্রনাথের আত্মিক কোন যোগ নাই। মাইকেলের রসাদর্শ বা ভাবাদর্শ রবীন্দ্রনাথের প্রীতিকর হয় নাই। রবীন্দ্রনাথও নানা শ্রেণীর অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু মাইকেলকে অনুসরণ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ সনেট রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাও মাইকেলের অনুকৃতি নয়। রবীন্দ্রনাথের সনেট পয়ারছন্দের স্তবকমাত্র।

রবীন্দ্রনাথের কবিহিসাবে অভ্রভেদী স্বাতন্ত্র্য রসাদর্শে, বিষয়-বৈচিত্র্যে, নব নব রচনাভঙ্গী ও ছন্দো-বৈচিত্র্যে, ভাবের বিশ্বাত্মকতায় ও সার্বজনীনতায় এবং রচনার অপরিমিত অজস্রতায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

বঙ্গসাহিত্যে ছোটগল্পের তিনি প্রবর্ত্তক। ছোট গল্পের একটা খসড়াও তিনি দেশের সাহিত্যদপ্তরে পান নাই। বলা বাহুল্য, প্রচলিত রূপকগল্প বা কাহিনীগুলি ছোট গল্প নয়। উপন্যাসের প্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্র, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস আদৌ বঙ্কিম-প্রবর্ত্তিত ধারার অনুগত নয়। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস-সাহিত্যকে দ্বার হইতে মনোমন্দিরের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, হরু ঠাকুর, শ্রীধর কথক ইত্যাদির গানের যে কোন মিল নাই তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। রবীন্দ্রনাথ গানের রাজ্যে যুগান্তর আনিয়াছেন শুধু রচনায় নয়—সুর-সংযোগেও। প্রচলিত রাগ-রাগিণীকে একেবারে বর্জ্জন না করিয়া তিনি রাগরাগিণীর সাঙ্কর্য্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং সুরগুলিকে অভিনব রূপ দিয়াছেন। বাউলের সুর তিনি লইয়াছেন—তাহার ভাবসাধনা গ্রহণ করেন নাই। গানেরও সুর-বৈচিত্র্যে, ছন্দো-বৈচিত্র্যে, বিষয়-বৈচিত্র্যে ও অপরিমিত প্রাচুর্য্যে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য সুপ্রতিষ্ঠিত। গানে বাণীর এত ঐশ্বর্য্য দুই-এক জন বৈষ্ণব কবি ছাড়া অন্য কাহারও রচনায় নাই। গানের সুরকে তিনি বাণীর মরালরূপ দান করিয়াছেন।

তাঁহাব গানগুলি গাহিবার জন্য তিনি স্বতন্ত্র এক গীতিরীতিবও (style) প্রবর্ত্তন কবিয়াছেন।

দেশে প্রচলিত নাটকেব সহিত ববীন্দ্রনাথের নাটকের গোডাব দিকে কিছু মিল থাকিলেও শেষ পর্য্যন্ত কোন মিলই থাকে নাই। সেজন্য ববীন্দ্রনাথেব নাটক এ দেশেব বঙ্গমঞ্চে চলে নাই। এ দেশেব লোক নাটক বলিতে যাহা বুঝে এ নাটক সে শ্রেণীব নয়। এদেশে সাধাবণতঃ যে সকল নাটক রচিত ও অভিনীত হইত—তাহাদেব মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার কিংবা সমাজসংস্কাব—বিদগ্ধজনেব চিত্তে বসসঞ্চাব ছিল গৌণ। অবিমিশ্র সাহিত্যেব আনন্দের জন্য প্রথম নাটক লেখেন ববীন্দ্রনাথ। এ দেশের নাটক নাচ, গান, বঙ্গমঞ্চের শোভাশ্রী, চিত্র ও নটনটীর নিজস্ব কৌশলেব সহাযতা লইয়া শ্রোতাব মনোহবণ কবিত। ববীন্দ্রনাথ নাটকগুলিকে তাহাদেব স্বকীয় সাহিত্যিক শক্তিতে সার্থকতা দানেব প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ববীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে প্রলোভন-নিবপেক্ষ উৎকর্ষকে আর্টেব আভিজাত্য বলিযা প্রমাণ কবিবাব চেষ্টা কবিযাছেন। তাঁহাব নাটকগুলির বিচাবে এই সত্যেব প্রযোগ কবা যাইতে পাবে। প্রচলিত নাটকে অনেক সময় কোন ভাব-দ্বন্দ্বই দেখা যায় না—দ্বন্দ্ব থাকিলেও তাহা বহিবঙ্গেব দ্বন্দ্ব। ববীন্দ্রনাথেব নাটকগুলিতে দেখিতে পাই মানসিক দ্বন্দ্ব—আদর্শের সহিত আদর্শেব—ভাবেব সহিত ভাবেব—সত্যেব সহিত অন্ধ সংস্কাবেব দ্বন্দ্ব। তাহা ছাডা, তিনি কাব্যাত্মক নাটক (Musical) ও রূপক নাটক (Symbolical and allegorical) লিখিয়াছেন অনেকগুলি। এইগুলি বঙ্গমঞ্চ অপেক্ষা বসমঞ্চেবই অধিকতব উপযোগী। ইহাতেই ববীন্দ্রনাথেব স্বাতন্ত্র্য। ববীন্দ্রনাথেব নাটক অভিনীত হইলে তাহা বিদ্বজ্জনেব ও সাহিত্য-বসজ্ঞদেবই উপভোগ্য হয়—প্রাকৃত জনেব নয়।

পত্র বচনা অর্থাৎ পত্রাকাবে সাহিত্য বচনা ববীন্দ্রনাথেবই প্রবর্ত্তন। কথিকা, লিপিকা, ইত্যাদি ধবণেব গদ্যকাব্যেব প্রবর্ত্তকও তিনি।

ববীন্দ্রনাথেব সমালোচনা সাহিত্যগ্রন্থাদিব দোষগুণ বিচার মাত্র নয়—সমালোচনাচ্ছলে নূতন সৃষ্টি। কবি সমালোচনায় কোন বচনাব অন্তর্নিহিত বসেবই শুধু আবিষ্কাব করেন নাই—'তিনি আপন মনেব মাধুবী মিশাইয়া' সমালোচ্য বিষযেব অভিনব Interpretation দিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহাব স্বাতন্ত্র্য অনন্যকবণীয।

ববীন্দ্রনাথেব প্রবন্ধ কেবল যুক্তি-পবম্পবাব দ্বাবা সত্যবিশেষের প্রতিপাদন মাত্র নয়—ইহাও একপ্রকারের সাহিত্য। বাক্যের সবসতা ও সৌন্দর্য্যেব মধ্য দিয়া সত্যের আমন্ত্রণ। অনেক সময় "সত্যেব ধ্রুবভূমিব উপব দিয়া লঘু পদে সঞ্চবণ।" তথ্যের সহিত বসের, সত্যেব সহিত মাধুর্য্যেব মিলনে প্রবন্ধগুলি স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে।

প্রবন্ধের মধ্য দিয়া কবি তাঁহাব সামাজিক, সাহিত্যিক, বাষ্ট্রিয়, নৈতিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং বহু প্রকাবেব নব নব সমস্যা সম্বন্ধে নিজেব মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। কোথাও তিনি এ বিষয়ে গতানুগতিক নহেন। এ বিষয়ে তিনি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য কোথাও বিস্মৃত হ'ন নাই।

অনেক সময় দেশের লোকের সঙ্গে তাঁহার মতামত মিলে নাই—তাহাতে যথেষ্ট বাদানুবাদ ও তর্কদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। কবির মন ছিল সর্ব্বসংস্কারমুক্ত। তিনি সত্যের আলোকেই প্রত্যেক সমস্যা সম্বন্ধে অভিমত নিরূপণ করিতেন। যাহারা সংস্কারবিশেষের বশবর্ত্তী তাহাদের সঙ্গে সেজন্য মতভেদ হইত। কোন সম্প্রদায়ের দোষত্রুটী দেখাইয়া যখন তিনি কোন অভিমত প্রকাশ করিতেন—তখন তাহার বিরুদ্ধ সম্প্রদায় খুব উল্লসিত হইত। কিছুদিন পরেই কবি উল্লসিত সম্প্রদায়ের দোষগুলি দেখাইয়াও নিজের অভিমত প্রকাশ করিতেন। ইহাতে মনে হয়, তিনি যে কোন' সম্প্রদায়েরই অন্ধ অনুবর্ত্তী নহেন—তিনি যে স্বতন্ত্র, তাহাই তিনি প্রমাণ করিতেন। তাঁহার মনোধর্ম্ম ছিল Synthetic এবং সম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠ। তিনি জানিতেন—দুই চরম প্রান্তেই সত্য নাই—সত্য আছে দুইএর মাঝে। এই ভাবে অসত্যের সহিত অর্দ্ধসত্যের দ্বন্দ্বে তিনি সত্যকেই পরিচ্ছন্ন করিয়া দেখাইতেন। এইখানেই তাঁহার স্বাতন্ত্র্য। এই স্বাতন্ত্র্য-বোধের জন্যই তিনি ছিলেন এ দেশে রাজা ও প্রজার, হিন্দু ও ব্রাহ্মের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, পল্লী ও নগরের, নবীন ও প্রবীণের, বাস্তব ও স্বপ্নের, বস্তুতান্ত্রিকতা ও ভাবতান্ত্রিকতার মধ্যবর্ত্তী! কেহই তাঁহাকে নিজের দলের বলিয়া দাবি করিতে পারিত না। সুদীর্ঘ ৬৫ বৎসর ধরিয়া দেশে, সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্ম্মজগতে, সাহিত্যে কত পরিবর্ত্তনই না হইয়াছে! সমস্ত পরিবর্ত্তনের সহিত তিনি সুদীর্ঘ জীবনে সামঞ্জস্য—সেই সঙ্গে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

এদেশের কৌতুকসাহিত্যের রুচি কি জঘন্য ছিল তাহা সকলেই জানেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই কৌতুক রসকে মার্জ্জিত ও ভদ্রজনের উপভোগ্য করিয়া তোলেন। রবীন্দ্রনাথ এজন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ দেশের রসিকতা ও কৌতুকরসোপভোগের প্রবৃত্তিকে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক মর্য্যাদা দান করেন। বঙ্কিমচন্দ্র যাহাকে শিষ্টজনের উপভোগ্য করেন—রবীন্দ্রনাথ তাহাকে বিশিষ্টজনেরও উপভোগ্য করিয়া তোলেন—এইখানেই তাঁহার স্বাতন্ত্র্য।

রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতানুগ ভাষা একেবারে বর্জ্জন করেন নাই—কিন্তু খাঁটি বাংলাকেই দিয়াছেন প্রাধান্য। খাঁটি বাংলার কুলগৌরবের অভাব ছিল। কবি প্রভৃত অলঙ্কার ও লক্ষ্যার্থক বাক্যগুচ্ছের প্রয়োগে খাঁটি চলতি বাংলাকে অভিনব কৌলীন্য দান করিয়াছেন এবং উচ্চ ভাব-রসের বাহন করিয়া শূদ্রভাষাকে দ্বিজত্ব দান করিয়াছেন। ইহার ফলে যাঁহারা সংস্কৃতানুগ ভাষায় লিখিতেন একদিকে তাঁহাদের হইতে, যাঁহারা চলিত ভাষায় লেখেন অন্য দিকে তাঁহাদের হইতে নিজের ভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় অলঙ্কার ভূরি ভূরি। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তিগণের ব্যবহৃত অলঙ্কারে তিনি তাঁহার ভাষাকে সাজান নাই। রবীন্দ্রনাথের সকল অলঙ্কারই মৌলিক। অনেক সময় আমাদের চারিপাশের চিরপরিচিত জগৎ হইতেই অলঙ্কারগুলি আহৃত। নৈষধ বা শিশুপালবধের কবির মত চেষ্টা করিয়া তিনি অলঙ্কার প্রয়োগ করেন নাই—অলঙ্কারগুলি আসিয়া পড়িয়াছে—

ঢেউএর মুখে মোতির ঝিনুক যেন মরু-বালুর তীরে।

এইখানেই কবির স্বাতন্ত্র্য। এ সমস্ত ছাড়া, কবির জীবনযাত্রা, বেশভূষা, বসতি-নির্বাচন, কথাবার্ত্তা, হাতের লেখা ইত্যাদির মধ্যেও স্বাতন্ত্র্য ছিল। সর্ব্বত্রই একটা মার্জিত পরিচ্ছন্ন রুচি এই স্বাতন্ত্র্যের ভূষণস্বরূপ ছিল।

এই অভ্রভেদী স্বাতন্ত্র্যের জন্য কবিকে বুঝিতে এ দেশের বিলম্ব হইয়াছে। তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের মহিমা উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত মন অনেকটা তাঁহাকেই রচনা করিতে হইয়াছে। দেশের শিক্ষাধারা অতি ধীরে ধীরে দেশের লোকের মনের পূর্ব সংস্কারের বন্ধন খুলিয়াছে—এদিকে কবি বহুদূর আগাইয়া গিয়াছিলেন। দেশের লোক গতানুগতিক ব্যক্তিকে যত সহজে অন্তরঙ্গ বলিয়া বরণ করিতে পারিত—তত সহজে এইরূপ পারমার্থিক স্বাতন্ত্র্যে বলীয়ান অসাধারণ পুরুষকে অন্তরঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে নাই।

যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁহার জীবনে আত্মবিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা সমগ্র বিশ্বেই দুর্লভ। এই শক্তি কেবল তাঁহাকে বাংলাদেশের পক্ষ হইতেই নয়—সমগ্র বিশ্বের পক্ষ হইতেও অনন্যসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে। এই শক্তির অভ্যুদয় এ দেশে হইলেও—এ দেশের লোকের মন তাঁহাকে হাসিমুখে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু ইউরোপের মন প্রস্তুত ছিল বলিয়াই সে দেশের লোক সে শক্তির মাহাত্ম্য সহজে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। কবি এজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন—ইহা স্বজাতির প্রতি অভিমানবশে তাঁহার আত্মবিস্মরণ মাত্র।

কবি তাঁহার প্রথম যৌবনেই নিজের জীবনে অন্তর্নিহিত অফুরন্ত সৃজন-শক্তির সন্ধান পা'ন—সেই শক্তির উপলব্ধির আনন্দ তিনি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' ব্যক্ত করেন। এই শক্তির ক্রমবিকাশ হইতে লাগিল। এই ক্রমবিকাশ নিরবচ্ছিন্ন, বিচিত্র ইহার বিস্তার। কবি এই আত্মবিকাশের ধারার সহিত অনবরত অগ্রগতির সৌষম্য উপলব্ধি করিয়াছেন। এই আত্মবিকাশের আনন্দই তাঁহার বহু কবিতার আলম্বন ও উপজীব্য। তিনি এই আনন্দকে গতির ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। অফুরন্ত আত্মবিকাশই অফুরন্ত গতি।

গতির ভাষায় আত্মবিকাশের বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করিতে গিয়া কবি, পথ, পথিক, যাত্রী ইত্যাদির উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। সবচেয়ে তিনি ভাবপ্রকাশের ভাষা পাইয়াছেন নদীধারার ঔপম্যে। পদ্মা, গঙ্গা ও মধুমতীর নৌবিহারী কবি নিজেকে জীবনধারাপথে অসীমের উদ্দেশে নৌযাত্রী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। 'মনুষ্যত্ব' নামক প্রবন্ধে কবি নদীধারার সহিত মনুষ্যত্বের বিকাশের উপমা দিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার কবিজীবনের আত্মবিকাশ সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়। নদী মহাশৈলের রহস্যাবৃত গুহা হইতে জন্ম গ্রহণ করে—ক্রমে তাহার সংকীর্ণায়তন ধারা আয়ত হইতে আয়ততর হইতে থাকে—বহু উপনদী সমতলের বারিসম্পদে তাহাকে পুষ্টি দান করে—যাত্রাপথে বহু শাখায় বিভক্ত হয় এবং শেষে মহাসিন্ধুতে অর্থাৎ অসীমে আত্মবিলোপ করে। ঐ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের জন্য নদীধারার সহিত কবির জীবনধারার সুন্দর সাদৃশ্য আছে। কবি তাই নদীর ভাষায় আত্মবিকাশের আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ, কেবল প্রবাহেই—কেবল

চলাতেই যে সার্থকতা এই সত্য নদীধারাতেই দেখা যায়। আত্মবিকাশেই যে জীবনের সার্থকতা, সে সত্য সহজেই নদীপ্রবাহের ভাষাতেই—নদীর বাণী হইতেই বাণী লইয়া সুপ্রকাশিত হইতে পারিয়াছে। কবি আত্ম-শক্তির প্রথম উপলব্ধিও এই প্রবাহের ভাষাতেই—'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পূর্ণ যৌবনে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় পদ্মার সহিত। এই পদ্মাবক্ষে তাঁহার জীবনের অনেক সৃজনরত রসগর্ভ প্রহরগুলি কাটিয়াছে। পদ্মা তাঁহার জীবনের আত্মবিকাশের ভাষার সঙ্গে কবিকে ছন্দও দান করিয়াছে। কবি ছিন্নপত্রে বলিয়াছেন—

"আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি, বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করি, তবে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষ বা পশুর মধ্যে যে চলাচল তাতে খানিকটা চলা, খানিকটা না চলা। কিন্তু নদীর আগাগোড়াই চলছে, সেইজন্যে আমাদের মনের সঙ্গে চেতনার সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আমাদের শরীর আংশিকভাবে পদচালনা করে, অঙ্গ চালনা করে, আমাদের মনটার আগাগোড়াই চলেছে। এইজন্যই এই ভাদ্রমাসের পদ্মাটাকে একটা প্রবল মানস শক্তির মত বোধ হয়—সে মনের ইচ্ছার মত ভাঙছে চুরছে এবং চলেছে মনের ইচ্ছার মত। সে আপনাকে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গি এবং অস্ফুট কল সঙ্গীতে নানাপ্রকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে।" নিজের কবিচিত্তের অফুরন্ত অবিরত আত্মপ্রকাশের উপমা কবি ইহার মত আর কোথায় পাইবেন?

এই নৌ-যাত্রীর উপমায় তিনি নিজের কাব্যজীবনের প্রগতির কথা বলিয়াছেন কাব্যজীবনের কাণ্ডারী জীবনদেবতাকে উদ্দেশ করিয়া—

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরি?
বল কোন পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।

যে গতি-প্রবাহ তিনি নিজের জীবন-ধারায় দেখিয়াছেন—তাহাই তিনি এই বিশ্বজগতের সর্ব্বত্রই দেখিয়াছেন। ইহাই কবির বিশ্বাত্মকতার একটী রূপ।

কবির অরূপ, পূর্ণ, অনন্ত, অচিন, অসীম সব একই বস্তু। তত্ত্বজ্ঞেরা যে ভাবে এই পূর্ণের সন্ধান পাইয়া থাকেন, কবি সেভাবে তাঁহার সন্ধান পান নাই। তিনি ক্ষণিকের মধ্যে সেই শাশ্বতের, সসীমের মধ্যে অসীমের আভাস পাইয়াছেন। কবি যাঁহাকে চান তিনিও 'বেঠিক পথের পথিক' কাজেই কোন বাঁধাধরা পথ ধরিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এই বিশ্বের পানে চাহিয়া দিনে শতবার তাঁহার 'মন কেমন করে'। এই 'মন কেমন করাই' অচিনজনের জন্য তৃষ্ণা। সে অধরা স্বপ্নের মত আসিয়া চোখে মায়া ন বুলাইয়া চলিয়া যায়। এই স্বপ্ন অনির্বচনীয়। প্রকাশের জন্য কবি মনের মতন ভাষা ও সুর পান না—মনের মতন বাঁধনও পান না যে ধরিয়া ফেলিবেন।

এই পূর্ণ কি তবে মরীচিকা? অপূর্ণ যে অসমাপ্ত ব্রত ফেলিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়—

কোথাও কি নাই তার শেষ সার্থকতা ?
তবে কেন পঙ্গু সৃষ্টি খণ্ডিত এ অস্তিত্বের ব্যথা ?
অপূর্ণতা আপনার বেদনায়
পূর্ণের আশ্বাস যদি নাহি পায়
তবে রাত্রিদিন হেন
আপনার সাথে তার এত দ্বন্দ্ব কেন ?

এই পূর্ণের সঙ্গে কবির চকিত পরিচয় দিনে যে কত বার তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রকৃতির প্রতি রূপরূপান্তর কবিকে আনমনা করিয়া দিয়াছে। কবি বলিয়াছেন—

এই ধরণীর সকল সীমায় সীমাহারার গোপন আনাগোনা।
সেই আমারে করেছে আনমনা।

কবি বলিয়াছেন আমিই কেবল বিরহী নই—পূর্ণ যে সেও আমাকে না পাইয়া বিরহী "সঙ্গবিহীন চিরন্তনের বিরহগান বিরাট মনের শূন্যে করে নিঃশবদের বিষাদ বিস্তার।" চিরন্তনের বিরহগানই কবির চিত্তে অকারণ বেদনার সৃষ্টি করে। এই বেদনার কথায় কবি বলিয়াছেন 'বিনা কারণে ব্যথিত হিয়া উঠিল গাহি গুঞ্জরিয়া।' বিদ্যাপতি-রচিত সেই ভরা ভাদরের গান। অগোচর চেতনার এই অকারণ বেদনার ছায়া মনের দিগ্‌স্তে পড়িলে গোপন অশান্তি আঁখিপাতে উচ্ছলিয়া উঠে। কালিদাস 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনঃ' ইত্যাদি শ্লোকে এই বেদনার কথাই বলিয়াছিলেন।

শেলির কথায় এই Yearning for something afar—এই পূর্ণের তৃষ্ণা বহু কবিতায় বাণী রূপ লাভ করিয়াছে। এই খানেই কবির স্বাতন্ত্র্য। কবি বলিয়াছেন—'আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী। কবি বলেন—তাঁহার মাঝারে একটি বিরহিণী নারী চিরদিন মনের বাতায়নে তাহার অজানা দয়িতের আশায় বসিয়া আছে।

আমি কহিলাম "কারে তুমি চাও ওগো বিরহিণী নারি ?"
সে কহিল "আমি যারে চাই তার নাম না কহিতে পারি।"

কবি এই নাম না-জানা দয়িতের আভাস পা'ন প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে। ছিন্নপত্রে একস্থলে বলিয়াছেন—"অন্তরের মধ্যে যে একটি চিরবিরহ-বিষাদ সে এই সন্ধ্যাবেলাকার পরিত্যক্তা পৃথিবীর উদাস আলোকে কাহাকে যেন ঈষৎ প্রকাশ করিয়া দেয়।"

ভৈরবী সুর তাঁহার বিচ্ছেদ-বেদনা জাগাইয়া তুলে। তাই কবি বলেন—'ঐ ভৈরবী আর গেও না।' জীবনের যাহা কিছু সুন্দর সমস্তই পূর্ণের ইঙ্গিত জানায়—বেদনা জাগায়, কিন্তু মিলনের আশা দিয়া আশ্বস্তও করে—

এ জন্মের যা কিছু সুন্দর স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে বাজে মনে নহে দূর নহে বহু দূর।

কবি তাঁহার লীলাসঙ্গিনী কল্পলক্ষ্মীকে অসীমেরই দূতী বলিয়াছেন—

দেশের কালের অতীত সে মহাদূর তোমার কণ্ঠে শুনেছি তাহার সুর
বাক্য যেথায় নত হয় পরাভবে।
অসীমের দূতী ভ'রে এনেছিলে ডালা পরাতে আমারে নন্দনফুলমালা
অপূর্ণ গৌরবে।

পূর্ণের তৃষ্ণা জীবনের অন্যান্য তৃষ্ণার সহিত বিজড়িত হইয়াও বিস্তার লাভ করে। কবি বলিয়াছেন—"যে ক্ষুধা উদ্দেশহীন অজানার জন্য তাহা সঙ্গের ক্ষুধা, অঙ্গের ক্ষুধা, মনের ক্ষুধা, প্রাণের ক্ষুধা সব ক্ষুধার সঙ্গে জড়াইয়া নানা আকর্ষণবেগে আমাদের মনের আকৃতি গড়িয়া তুলে।" সকল ক্ষুধার মধ্যেই সেই পূর্ণের জন্য মিলনক্ষুধা বিরাজ করিতেছে।

কবি ধ্যানের চোখে এই অসীম পূর্ণকে উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থতার তৃপ্তি-গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিয়াছেন—

ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যান চোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান্
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান,
কত বার পরাভব কতবার কত লজ্জা ভয়,
তবু কণ্ঠে ধ্বনিয়াছে অসীমের জয়!

এই অসীম, এই ভূমা, এই পূর্ণের প্রতি গভীর প্রেমেই রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রনাথের প্রধান স্বাতন্ত্র্য তাঁহার নিজস্ব কবিদৃষ্টিতে। যে রসদৃষ্টিতে তিনি বিধাতার সৃষ্টিকে দেখিয়াছেন তাহা অনন্যসাধারণ। কোন সাধারণ লোকের দৃষ্টির সহিত তাহার মিল নাই। অন্যে পরে কা কথা, ভারতের কোন কবিব দৃষ্টির সহিতও তাহার মিল নাই। একমাত্র মেঘদূতের কবির দৃষ্টির সঙ্গে তাহার আংশিক মিল ছিল। এই দৃষ্টি যেন আর্ষ দৃষ্টি, বেদ বা উপনিষদের ঋষিদের দৃষ্টি অনেকটা যেন এই শ্রেণীর। কবি যে দিব্যদৃষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—সে দিব্য-দৃষ্টি কাহারও জীবনের অঙ্গীভূত নয় বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ জীবনের বিশিষ্ট অবস্থায় বিশ্বপ্রকৃতির বিশিষ্ট পরিবেষ্টনীর মধ্যে, সঞ্জয়ের সংসর্গে ধৃতরাষ্ট্রের মত, এই দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য প্রাপ্ত হয়। মাঝে মাঝে এইরূপ দৃষ্টি লাভ করি বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমরা উপভোগ করি।

রবীন্দ্রনাথ এই দিব্য-দৃষ্টি লইয়া, এই বিকসিত তৃতীয় নয়ন লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই দৃষ্টি অমৃতময়ী দৃষ্টি—এই দৃষ্টিতে বিশ্বসৃষ্টিকে দেখিয়াছেন বলিয়া বিধাতার সৃষ্টি তাঁহার কাছে মধুময়ী। সৃষ্টির মাধুরীসম্ভোগেই এই দৃষ্টির কাজ ফুরায় নাই—তাহা হইলে কবি আদর্শ রসজ্ঞ হইতেন সন্দেহ নাই কিন্তু রসস্রষ্টা হইতেন না। ঐ দিব্যদৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টির বাসনা ও শক্তি নিহিত আছে, বিধাতার সৃষ্টিকে নূতন করিয়া গড়িবার প্রবৃত্তিও জড়িত আছে। বিধাতার সৃষ্টি কবির চোখে সুন্দর—তাহাকে সুন্দরতর করিয়া দেখাইবার বাসনা ঐ দৃষ্টির অঙ্গ। বিধাতার সৃষ্টি বিশ্বজনীন (Cosmic) দৃষ্টিতে সুন্দর—কিন্তু আমাদের চোখে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর

নয়—তাহাতে আমরা দেখি অঙ্গহানিও অনেক। কবি তাই বিধাতার সৃষ্টির অঙ্গহানি দূর করিয়া তাহাকে আমাদের জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তাহাকে গড়িতে চাহিয়াছেন। কবির দিব্যদৃষ্টির পরিণতি তাই দিব্যসৃষ্টি। বিধাতার সৃষ্টির পরিপূরক কবির সৃষ্টি। কবি যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অর্দ্ধেক বিধাতার—অর্দ্ধেক কবির নিজস্ব। কবি তাঁহার দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যসৃষ্টির দ্বারা বিধাতার সৃষ্টিকে একদিকে যেমন আমাদের উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি বিধাতার সৃষ্টির অনেক অঙ্গকে ভাঙ্গিয়া আপনা মনের মাধুরী দিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছেন। কবিমাত্রই নূতন সৃষ্টি করেন,—কিন্তু এমন করিয়া বিধাতার সৃষ্টিকে নবকলেবরদান রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ভারতের আর কোন কবি করেন নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রকৃত রসজ্ঞের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি অঙ্গ, মানব-জীবনের প্রত্যেক তথ্য, বিশ্বরহস্যের প্রত্যেক তত্ত্বটি, মেঘদূত-কাব্যের উপভোক্তার চোখে নববর্ষার মেঘমালার ন্যায়, অভিনব রূপ লাভ করিয়াছে।

কবি যে দৃষ্টিতে বিশ্বজগৎকে দেখিয়াছেন—সেই দৃষ্টিকে বিস্ময়ময়ীও বলা যাইতে পারে।

বিস্ময়ই সকল দর্শন-তত্ত্বের নিদান, বিস্ময়েই সৎকাব্যেরও মূল উৎস। অলঙ্কারশাস্ত্রে বিস্ময়কে অদ্ভুত রসের স্থায়িভাব বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাকে প্রকৃতপক্ষে কোন রস-পর্য্যায়ে ফেলিতে হইলে অদ্ভুতরসের কবিতাই বলিতে হয়। কবির বিস্ময়ময়ী দৃষ্টি এই সৃষ্টির যে অঙ্গেই পড়িয়াছে—তাহাতেই অগাধ বিস্ময়-সঞ্চার করিয়াছে। এই বিস্ময়-সঞ্চারেই তাঁহার কবিতার জন্ম। জগৎ ও জীবনের এই বিস্ময়ঘন রূপই নূতন সৃষ্টি। ইহাকেই বলিয়াছি আমাদের দেখা বিধাতার জগৎকে ভাঙ্গিয়া গড়া।

কবির সেই বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিই ছন্দোভাষায় বাণীরূপ লাভ করিয়া এবং কবির বাঁশীতে ধরা পড়িয়া আমাদের হৃদয় বিস্ফারিত করিতেছে। কবি নিজে তাঁহার এই বিস্ময়ময়ী দৃষ্টি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি, আমি চোখ মেলে যা দেখলুম, চোখ আমার তাতে ক্লান্ত হলো না,—বিস্ময়ের অন্ত পাইনি। প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করার জন্যে যে—

যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।"

"আলোকিত ভুবনের মুখপানে চেয়ে নির্নিমেষ
বিস্ময়ের পাই নাই শেষ।
যে লক্ষ্মী আছেন নিত্য মাধুরীর পদ্ম উপবনে
পেয়েছি তাঁহার স্পর্শ সর্ব্ব অঙ্গে মনে।
যে নিঃশ্বাস তরঙ্গিত নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে,
তারে আমি ধরেছি বাঁশীতে।"

হিন্দু রবীন্দ্রনাথ

হিন্দুস্থানের কবিকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইলে হিন্দুত্বের ভাষাতেই করিতে হয়। বাংলা সাহিত্যের ভাষা হিন্দুত্বের ভাষা। এই ভাষার বাক্য, বাক্যাঙ্গ ও পদের সহিত হিন্দুর ঐতিহ্য, হিন্দুর পুরাণকথা, হিন্দুর সংস্কার, হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির সর্ববিধ শাখাতেই হিন্দুর নিষ্ঠাপূত সমাজসংসারের বহু প্রসঙ্গই পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করিতেন না, কিন্তু তাঁহার রচনার ভাবমহিমা ও রসমাধুর্য হিন্দুর মঠমন্দির, পৌত্তলিকতা, উৎসব-পার্বণের আবেষ্টনীর মধ্যেই বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। খ্রীষ্টান মধুসূদনও এই আবেষ্টনী ও উপাদান গ্রহণ না করিয়া পারেন নাই। বাংলা ভাষার কোন কবিই এ সমস্ত এড়াইয়া চলিতে পারেন নাই। প্রাচীন মুসলমান কবিদেরত কথাই নাই—বর্ত্তমান যুগের কাজী নজরুল পর্য্যন্ত।

কেবল ভাষার কথা নয়, রবীন্দ্রনাথের রচনার উপাদান উপকরণও হইয়াছে নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর জীবনযাত্রা, চিন্তা, সংস্কার ও সংস্কৃতি। প্রাচীন ভারতের আবেষ্টনী সৃষ্টির জন্য ও শুচি-সুন্দর পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টির জন্য, সাহিত্যের Romance সৃষ্টির জন্য হিন্দুর ধর্মজীবনের বহু অঙ্গই উপাদানহিসাবে অপরিহার্য্য হইয়াও উঠিয়াছে। তাই তাঁহার কাছে ভারতের সকল ভূধরই ধ্যানগম্ভীর, সকল প্রান্তরই নদীজপমালায় মণ্ডিত।

প্রবন্ধসাহিত্যে যে সকল সংস্কার ও আচারকে কবি আঘাত করিয়াছেন, দূষণীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কলাশ্রী সম্পাদনের প্রয়োজনে, সৌন্দর্যসৃষ্টির অনুরোধে সেই সমস্তকেই তিনি উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কবি ও কাব্যের উপভোক্তাদের মধ্যে ইহাই অন্তরের যোগসূত্র। এই যোগসূত্রের অভাব হইলে রবীন্দ্রসাহিত্য হয়ত বিশ্বসাহিত্য হইত, কিন্তু বঙ্গসাহিত্য হইত না।

বলা বাহুল্য, হিন্দুর ধর্মজীবনের উপাদান উপকরণকে অনেক ক্ষেত্রে বাচ্যার্থে গ্রহণ না করিয়া লক্ষ্যার্থেই গ্রহণ করিতে হইবে এবং বাণীরূপের উপাদানমাত্রই মনে করিতে হইবে। অনেকগুলিকে রূপক Symbol বা প্রতীক মনে করিতে হইবে। অনেকস্থলে তিনি ঐ সকলের নূতন উপব্যাখ্যা (Interpretation) দিয়াছেন। অনেক স্থলে ঐগুলির দেশকালাতীত ব্যঞ্জনাই কবির লক্ষ্য।

ধূপ, দীপ, পুষ্প, নৈবেদ্য, চন্দন, শঙ্খধ্বনি, জপমালা, যাগযজ্ঞ ইত্যাদি দ্বারা কবি নিজে কখনও উপাসনা করেন নাই। কিন্তু ভক্তির কথা, নিষ্ঠার কথা, শুচিতার কথা বলিতে গিয়া এই সকল উপচারের দ্বারাই তাঁহার ভাবপ্রকাশ করিতে হইয়াছে। এইগুলির দ্বারা যে শুচি-সুন্দর পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি হয়—সেই পরিবেষ্টনীটি কবির বারবারই প্রয়োজন হইয়াছে। ভারতের

প্রাচীন সভ্যতার পরম ভক্ত, পরম ভাগবত, দেশপ্রেমিক, জ্ঞানাভিজাত্যে উন্নত, মার্জিতরুচি কবির পক্ষে এই আবেষ্টনী অপরিহার্য।

বিদেশী বিজাতীয় ও বিধর্মী পাঠকগণ Roman Catholic ও Pagan সাহিত্যের যে ভাবে রস উপলব্ধি করে, সেইভাবেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের রস উপভোগ করিয়া থাকে। আমরা হিন্দু হইয়া হাফেজ, সাদী, রুমী, জামী, টল্‌ষ্টয়, মিল্‌টন ইত্যাদি কবিদের ধর্মসাহিত্যের রস উপভোগে কোন বাধা পাই না। এমন কি Scholastic Literature বা Christian Psalms এর রস উপভোগেও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। ইহার কারণ, ধেনু যে দেশেরই হউক এবং যে রঙেরই হউক—সকল দুগ্ধই যেমন সাদা এবং এক ধর্ম-বিশিষ্ট, রসও তেমনি যে দেশের, যে জাতির, যে ভাষার, যে ধর্মের উপাদান হইতেই উদ্গত হউক—তাহার প্রকৃতি ও ধর্ম একই।

রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের উপাদান, উপকরণ ও চিত্রাবলীও হিন্দু-সংসার ও সমাজ হইতে গৃহীত। হিন্দুর জীবন-যাত্রাই তাঁহার ছোট গল্পগুলিতে প্রতিফলিত—পাত্রপাত্রী সবই হিন্দু নরনারী। দেশের পাঠকপাঠিকাদের যে-জীবনযাত্রার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে—সেই জীবনযাত্রাকেই কথাসাহিত্যের উপাদান করিতে হয়। নতুবা, পাঠক-সমাজের মনে রসসৃষ্টি করা যায় না। বিদেশীয়গণের পক্ষে এই শ্রেণীর কথা-সাহিত্যের রস উপভোগ করা অবশ্য কঠিন। তাই বলিয়া নিজের চারিপাশের জীবন্ত সমাজসংসার ত্যাগ করিয়া একটা সার্বজনীন সমাজসংসার কল্পনায় সৃষ্টি করিলে সৎকথাসাহিত্য রচিত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উত্তরজীবনে চারিপাশের হিন্দু-সমাজ ত্যাগ করিয়া সংকীর্ণ অভিজাতসমাজ লইয়া কথা-সাহিত্য রচনাও করিয়াছিলেন। সাহিত্য হিসাবে প্রথমজীবনের গল্প উপন্যাসের তুলনায় তাহা অপকৃষ্টই হইয়াছে।

কথাসাহিত্য ও নাট্যসাহিত্যে অনেক সময় রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুজাতির অনেক ভ্রান্ত সংস্কার, ভাবাদর্শ ও আচার বিচারকে আঘাত করিয়া সত্যের জয় ঘোষণা করিতে হইয়াছে। তাহাতে অনেক গোঁড়া হিন্দু মনে করিয়াছেন, কবি বুঝি হিন্দু-সমাজের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতেছেন। বলা বাহুল্য, প্রবন্ধের মধ্য দিয়া অনেক সময় হিন্দুর দূষিত আচারবিচারকে আঘাত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু নাট্যসাহিত্যে ও কথাসাহিত্যে হিন্দুর সমাজ বা ধর্মকে আঘাত করিবার উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না। রসসৃষ্টির জন্য ও সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্য অসত্যকে আঘাত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এই অসত্য সকল দেশে, সকল সমাজে রূপে রূপান্তরে বিরাজ করে। কবি আমাদের দেশের ধর্ম ও সমাজে প্রচলিত অসত্যকে তাহার প্রতীক বা প্রতিনিধিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। কবি এই অসত্যকে আঘাত করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের সমাজের প্রতি তাঁহার গভীর দরদের অভাব কোথাও ঘটে নাই। ঐ দরদটুকুর জন্য আঘাতও রসসৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র আমাদের হিন্দুসমাজের অসত্য ও অনাচারকে যেরূপ কঠোরভাবে আঘাত করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ ততটা কঠোর কোথাও হইতে পারেন নাই—তবু শরৎচন্দ্রকে হিন্দুবিরোধী লেখক মনে করা হয় না। তাহার

কারণ, এই হতভাগ্য অধঃপতিত সমাজের প্রতি শরৎচন্দ্রের গভীর দরদের অভাব কোথাও নাই।

যাহাই হউক, হিন্দুর পবিত্র আচার অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা যেমন রবীন্দ্রকাব্যের রসোপাদান—কোন কোন দূষণীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতিবাদও সাহিত্যসৃষ্টির উপাদান মাত্র।

Protestant কবিরা এমন কি নিরীশ্বরবাদী কবিরাও অনেক সময় Roman Catholic বা Pagan দৃষ্টিভঙ্গীতে ও Ritualismএর ভাষায় রসসৃষ্টি করিয়াছেন। Shelley, Keats, Swinburne, Rosetti ইত্যাদি কবিরা Paganism-কে রসরচনার উপকরণ করিয়াছেন। রুশকবি পুশকিন, ইংরাজ কবি Cowper, Chesterton ও Byron এবং ফরাসী কথাসাহিত্যিক Anatole France Roman Catholic দৃষ্টিভঙ্গী ও Ritualism অবলম্বনে সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছেন। কেবল রসসৃষ্টির জন্য ঐরূপ উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন বলিলেই যথেষ্ট হইবে না। এই সকল সাহিত্যিকদের দেশকালাতীত উদার রসসৃষ্টির মধ্যে বুঝা যায়—সকল ধর্মের উপরে রসধর্মের স্থান। রবীন্দ্রনাথ এই সকল কবিরই সগোত্র। ব্রাহ্মসমাজের মত Protestant Christianityও ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানের আচার উপচার ইত্যাদি বর্জন করিয়া রসসৃষ্টির বহু উপাদান হইতেই বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু কবিরা—ত রসসৃষ্টির ঐ সকল রসানুকূল উপাদানগুলি বর্জন করিতে পারেন না। সামাজিক রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম, কিন্তু সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ হিন্দু। এই সত্যটুকু না বোঝার জন্য হিন্দুরা মনে করিয়াছে রবীন্দ্রনাথ অহিন্দু, ব্রাহ্মরা মনে করিয়াছে রবীন্দ্রনাথ অব্রাহ্ম। কবি রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মও ছিলেন, হিন্দুও ছিলেন অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাহাই ছিলেন, যাহার মধ্যে হিন্দুত্ব ও ব্রাহ্মত্ব নির্দ্বন্দ্ব হইয়া সমন্বয় লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষার আলঙ্কারিকতার অনেকটুকু হিন্দুর সংস্কৃতি ও সংস্কার কে অবলম্বন করিয়া রচিত। এই ধরণের আলঙ্কারিকতার একটা দৃষ্টান্ত দিই। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য—বাক্যের অপূর্ণতাকে সঙ্গীত যেমন আপন রসে পূর্ণ ক'রে তুলে, স্নেহ তেমনি স্নেহাস্পদের সুযোগ্যতার অপেক্ষা করে না।

এই কথাটিই কবি বুঝাইয়াছেন পৌরাণিক আলঙ্কারিকতার ভাষায়—

"দেবতার মনের ভাব ঠিকমত জানি ব'লে অভিমান রাখিনে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস কার্ত্তিকের চেয়ে গণেশের পরে দুর্গার স্নেহ বেশি। এমন কি লম্বোদরের অতি অযোগ্য ক্ষুদ্র বাহনটার পরে কার্ত্তিকের খোসপোষাকী ময়ূর লোভদৃষ্টি দেয় ব'লে তার পেখমের অপরূপ সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও তার উপরই তিনি বিরক্ত। ঐ দীনাঙ্গ ইঁদুর যখন তাঁর ভাঁড়ারে ঢুকে তাঁর ভাঁড়গুলোর গায়ে সিঁধ কাটতে থাকে, তখন হেসে তিনি তাকে ক্ষমা করেন। শাস্ত্রনীতিজ্ঞ পুরুষবর নন্দী বলেন—"মা, তুমি ওকে শাসন কর না, ও বড় প্রশ্রয় পাচ্ছে। দেবী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলেন—চুরি ক'রে খাওয়াই যে ওর স্বধর্ম। তা' ওর দোষ কি? ওযে চোরের দাঁত নিয়েই জন্মেছে, সে কি বৃথা হবে?"

বাংলার সমাজ, সংসার ও প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গটির সহিত বহু ঐতিহ্য ও জাতীয়

জীবনের স্মৃতি বিজড়িত। কবি অবশ্য সেগুলিকে সংস্কারমুক্ত সত্যদৃষ্টি দিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহারও একটা সীমা আছে; কোনটিই তাই একেবারে নিরপেক্ষ ও নিরাভরণ রূপে তাঁহার চোখে পড়ে নাই।

প্রত্যেকটির সহিত কিছু-না-কিছু স্মৃতি-সংস্কার জড়াইয়া আছে—এই স্মৃতি সংস্কার যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা এবং হিন্দু রক্তপ্রবাহ ধরিয়া কবির দেহ-মনকে আশ্রয় করিয়াছে। তাহা লক্ষ লক্ষ বার 'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্'—জপ করিলেও যাইবার নয়।

আমাদের হিন্দুসংস্কৃতির যাহা কিছু দেশকালের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং যাহা কিছু সত্যধর্মের বিরোধী সে সমস্তই তিনি শিক্ষাদীক্ষায় সমুন্নত উদারপন্থী হিন্দুর মতই বর্জন করিয়াছেন মানস জীবনে এবং সাহিত্যিক জীবনে। কিন্তু যে সকল আচার অনুষ্ঠান নিরর্থক হইলেও নির্দোষ, সৌন্দর্যবোধ ও রসসৃষ্টির অনুকূল এবং জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক, সেগুলির কোনটিই তিনি, লৌকিক জীবনে না হউক, মানস-জীবনে ও সাহিত্যিক জীবনে বর্জন করেন নাই। তিনি তাঁহার সত্যদৃষ্টির আলোকে সেগুলিকে সুসঙ্গত ব্যাখ্যা (Interpretation) দান করিয়া নিজস্বীকৃত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার রচিত প্রবন্ধে গায়ত্রী হইতে গঙ্গাস্নান পর্যন্ত সমস্তই অভিনব ব্যাখ্যা লাভ করিয়াছে—কবিতার মধ্যে পরম শ্রদ্ধার সহিত ঐগুলি যথাযোগ্য স্থানও লাভ করিয়াছে।

আমি দৃষ্টান্তের সংখ্যা না বাড়াইয়া হিন্দুর ভক্তিপূত নিষ্ঠাব্রত নারীত্ব সম্বন্ধে কবির অকৃত্রিম সশ্রদ্ধ মনোভাব কিরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে তাহাই দেখাইব—

রবীন্দ্রনাথ নারীর দুইটি রূপ দেখিয়াছেন। এই দুই রূপের কথা পাশাপাশি বলিয়াছেন—'দুই নারী' (বলাকা) ও 'রাত্রে ও প্রভাতে' (চিত্রা) এই দুইটি কবিতায়। একজন কামনা রাজ্যের রাণী, আর "অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী বিশ্বের জননী তারে জানি স্বর্গের ঈশ্বরী।"

এই কল্যাণীরূপা নারীই রবীন্দ্র-লেখনীর উপাস্যা। হিন্দু ভারতের আদর্শ নারীকেই তিনি কল্যাণীরূপে কাব্যে বরণ করিয়াছেন। পথযাত্রীর ডায়েরিতে তিনি লিখিয়াছেন—"অনুষ্ঠানের যে সকল আয়োজন, যে সকল চিহ্ন শুভ-সূচনা করে, আমাদের দেশে তার ভার মেয়েদের উপর। নারীশক্তিতে আমরা মধুরের সঙ্গে মঙ্গলের মিলন অনুভব করি। মনে হয় যেন ঘরের ভিতর হ'তে মেয়েদের প্রার্থনা উঠছে। দেবতার কাছ হ'তে সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়ার মত সে প্রার্থনা সিঁদুরের ফোঁটায়, তাদের কঙ্কণে তাদের উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে, তাদের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছায়। বিশ্বপ্রকৃতিতে যে প্রেমের শক্তি বিশ্বকে পালন করছে সেই শক্তিইত লক্ষ্মী, বিষ্ণুর প্রেয়সী। লক্ষ্মীর সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে ভাবকল্পনা আছে তাকে আমরা দেখি নারীর আদর্শে।"

রবীন্দ্রনাথ যে মনে প্রাণে হিন্দু কবি—তাহা তাঁহার পরিকল্পিত এই নারীর আদর্শ হইতে বুঝা যায়। "রাত্রে ও প্রভাতে" কবিতায় তিনি এইভাবে ইহার রূপ দিয়াছেন :—

"আজি—নির্মল বায় শান্ত উষায় নির্জন নদীতীরে
স্নান অবসানে শুভ্রবসনা চলিয়াছ ধীরে ধীরে।

তুমি—বাম করে লয়ে সাজি কত—তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে—দেবালয়তলে উষার রাগিণী বাঁশিতে উঠেছে বাজি।
এই—নির্ম্মল বায় শান্ত উষায় জাহ্নবীতীরে আজি।
দেবি—তব সীঁথি মূলে লেখা নব—অরুণ সিঁদূররেখা
তব—বামবাহু বেড়ি শঙ্খ বলয় তরুণ ইন্দুলেখা।
একি—মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি প্রভাতে দিয়েছ দেখা॥
আমি—সম্ভ্রম ভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনত শিরে,
আজি—নির্ম্মল বায় শান্ত উষায় নির্জ্জন নদীতীরে।"

আর একটি কবিতায় কবি "তাহার সর্ব্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান" সেই গানটিই ঐ কল্যাণীর উদ্দেশেই উৎসর্গ করিয়াছেন—তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া কবি বলিয়াছেন—

"প্রভাত আসে তোমার দ্বারে পূজার সাজি ভরি'
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির বরণ ডালা ধরি'।
সদা তোমার ঘরের মাঝে নীরব পূজার শঙ্খ বাজে,
কাঁকণ দুটির মঙ্গলগীত উঠে মধুব স্বরে।"

রূপসীরা এই কল্যাণীর চরণতলে পূজার ডালা রাখে,—বিদুষীরা তাহার কণ্ঠে বরণমালা পরায়, অচলা শ্রী তাহাকে ঘেরিয়া চিরদিন বিরাজ করে এবং তাহার শিরে তীর্থসলিল বর্ষণ করিতে থাকে। এই কল্যাণীই জননীরূপে শিশুর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন—

"ছিলি আমার পুতুলখেলায় ভোরে শিবপূজার বেলায়,
তোরে আমি ভেঙ্গেছি আর গড়েছি,
তুই আমার ঠাকুরের সনে ছিলি পূজার সিংহাসনে
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা ক'রেছি।"

মা-হারা সন্তান তাহার কল্যাণী জননীর আভাস পায়—পূজার গন্ধে—

"শিশিরভেজা হাওয়া বেয়ে ফুলের গন্ধ ভাসে,
তখন কেন মায়ের কথা আমার মনে আসে।
কবে বুঝি আসত মা সেই ফুলের সাজি ব'য়ে,
পূজোর গন্ধ আসে যে তাই মায়ের গন্ধ হ'য়ে।"

মাতৃ-অঙ্কচ্যুতা বধূ মায়ের কথা ভাবিতে গিয়া ঐ কল্যাণীকে স্মরণ করিয়া বলিতেছে—

"হৃদয় বেদনায় শূন্য বিছানায় বুঝি মা আঁখি জলে রজনী জাগো।
কুসুম তুলি লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো।"

কবি তাঁহার গানের সমঝদারের সন্ধানচ্ছলে বলিয়াছেন—

"ভাণ্ডারেতে লক্ষ্মী বধূ যেথায় আছে কাজে।
ঘরে ধায় সে ছুটি পায় সে যখন মাঝে মাঝে।

বালিশতলে বইটি চাপা টানিয়া লয় তারে,
পাতাগুলিন্ ছেঁড়া খোড়া শিশুর অত্যাচারে।
কাজল আঁকা সিঁদুর মাখা চুলের গন্ধে ভরা
শয্যাপ্রান্তে ছিন্নবেশে চাস্ কি যেতে ত্বরা ?”

কবির গান এইখানেই গিয়া স্বস্তি পাইবার জন্য এবং স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য “লোভে কম্পমান।”

কবি প্রকৃতির মধ্যেও ঐ কল্যাণীর রূপ বার বার দেখিয়াছেন। বঙ্গের শারদশ্রী তাঁহার চোখে এইরূপেই দেখা দিয়াছে।

কবি আশ্বিনের উষার উন্মেষেও এই মূর্ত্তি দেখিয়াছেন—

“শিউলি ফুলের নিশ্বাস বয় ভিজে ঘাসের পরে,
তপস্বিনী উষার পরা পূজোর চেলির গন্ধ যেন
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।”

কবি সন্ধ্যার রূপে এই কল্যাণীর জপরতা মূর্ত্তি দেখিযাছেন—

ঐ যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তার—সোনার অলংকার,
ঐ যে আকাশে লুটায়ে আকুল চুল,
অঞ্জলি ভরি ধরিল তারার ফুল,
পূজায় তাহার ভরিল অন্ধকার,
বনের গহনে জোনাকি রতন জ্বালা
লুকায়ে বক্ষে শান্তির জপমালা— জপিল সে বারবার।

কবি তাঁহার বঙ্গমাতাকে এই কল্যাণী মূর্ত্তিতে দেখিয়াছেন।

তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে
তব আম্রবণঘেরা সহস্র কুটীরে,
দোহনমুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,
গঙ্গার পাষাণ ঘাটে দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্য কল্যাণী লক্ষ্মী হে বঙ্গজননী,
আপন সহস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশ হাস্যমুখে।

কবি তাঁহার মৃন্ময়ী জননীকে এই মূর্ত্তিতে দেখিয়া বলিয়াছেন:—

আজকে খবর পেলাম খাঁটি মা আমার এই শ্যামল মাটি
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন,
অভ্রভেদী মন্দিরে তার বেদী আছে প্রাণ-দেবতার
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।

এইখানে তার অঙ্ক মাঝে প্রভাতরবির শঙ্খ বাজে
আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে,
এইখানে সে পূজার কালে সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বালে,
শান্ত মনে ক্লান্ত দিনের শেষে।

নগরের হাটের কোলাহল হইতে কবি যখন বিশ্রাম ও স্বস্তি লাভের জন্য পল্লীর পল্লবঘন আম্রকাননচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছেন, তখনও এই কল্যাণীকে স্মরণ করিয়াছেন—

স্নিগ্ধ হসিত বদন ইন্দু সিঁথায় আঁকিয়া সিঁদুর বিন্দু
মঙ্গল কর সার্থক কর শূন্য এ মোর গেহ।
এস কল্যাণী নারী বহিয়া তীর্থ বারি।

আবার রবিকরদাহে প্রতপ্ত প্রবাসীর রূপে যখন লোকালয়ে আশ্রয় সন্ধান করিয়াছেন, তখনও এই কল্যাণীকে স্মরণ করিয়াছেন।

বাজাও তোমার নিষ্কলঙ্ক শত চাঁদে গড়া শোভন শঙ্খ,
বরণ করিয়া সার্থক কর পরবাসী পথিকেরে।
আনন্দময়ি নারী আন তব সুধাবারি।

সংসারের তুচ্ছাদপি তুচ্ছ গৃহকর্ম্ম ও সেবার মধ্যেও 'দেবী চৌধুরাণীর' বঙ্কিমচন্দ্রের মত কবি কল্যাণীর মহিমা দেখিয়াছেন।

রাজ মহিমারে
যে কর পরশে তব পারো করিবারে
দ্বিগুণ মহিমান্বিত, সে সুন্দর করে
ধূলিঝাঁট দেও তুমি আপনার ঘরে।
সেইত মহিমা তব সেই তো গরিমা
সকল মাধুর্য্য চেয়ে তারি মধুরিমা।

জননীরূপা শ্যামাঙ্গী কল্যাণীর স্নেহগদ্গদ অঙ্ক উজ্জ্বল করিয়া যে শিশুটি কলভাষণে বঙ্গগৃহ মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে—সেই শিশুটিই ত রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে বার বার আলোড়িত করিয়াছে; তাহার ফলে আমরা তাঁহার অতুলনীয় শিশু-কবিতাগুলি পাইয়াছি। কল্যাণী জননী ও তাঁহার অঙ্কের শিশু দুইয়ে মিলিয়া যে চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের মানস চক্ষুতে উদ্ভাসিত হইয়াছে, সেই চিত্রই ত বাংলার ঘরে ঘরে আজিও অক্ষয় হইয়া আছে।

কবি তাঁহার জীবন-সঙ্গিনীর মধ্যে তাঁহার আদর্শ নিষ্ঠাবতী সেবাপরায়ণা কল্যাণীর সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন। কবি তাঁহার স্বর্গতা প্রেয়সীর উদ্দেশে বলিয়াছেন—

তুমি ওগো কল্যাণরূপিণী মরণেরে করেছ মঙ্গল
জীবনের পর পার হ'তে প্রতিক্ষণে মর্ত্তের আলোতে
পাঠাইছ তব চিত্ত খানি মৌন প্রেমে সজল কোমল।

মৃত্যুর নিভৃত স্নিগ্ধ ঘরে বসে আছ বাতায়ন 'পরে
জ্বালায়ে রেখেছ দীপখানি চিরন্তন আশায় উজ্জ্বল।
তুমি ওগো কল্যাণরূপিণী মরণেরে করেছ মঙ্গল।

মৃত্যুকে বরণ করিয়া এই কল্যাণী মৃত্যুকেও কল্যাণময় করিয়াছেন। কবি এই কল্যাণীর ধ্যান-মূর্ত্তিকে একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী বলিয়াছেন।

তোমার কঙ্কণ
কোমল কল্যাণ-প্রভা করেছে অর্পণ
সকল সতীর করে। স্নেহাতুর হিয়া
নিখিল নারীর চিত্তে গিয়াছে গলিয়া,
সেই বিশ্বমূর্ত্তি তব আমারি অন্তরে
লক্ষ্মী সরস্বতীরূপে পূর্ণরূপ ধরে।

কবি তাঁহাব জীবন-লক্ষ্মীর কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন—

যেথা মোর পূজাগৃহ নিভৃত মন্দিরে
সেথায় নীরবে এস দ্বার খুলি ধীরে।
মঙ্গল কনব ঘটে পুণ্যতীর্থজল
সযত্নে ভবিয়া রাখ, পূজাশতদল
স্বহস্তে তুলিযা আন। সেথা দুইজনে
দেবতার সম্মুখেতে বসি একাসনে।

এই কল্যাণী মূর্ত্তিব একটি ক্রমোন্মেষ-চিত্র তিনি 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায দিয়াছেন—এই কল্যাণীর মঙ্গলপাণির আকর্ষণ স্বর্গবাসীকে মর্ত্ত্যে নামিতে প্রলুব্ধ করিতেছে।

"ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, * * শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্ত্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিযা লবে বর। সন্ধ্যা হ'লে
জ্বলন্ত প্রদীপ খানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্য গণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে
চন্দনচর্চ্চিতভালে রক্তপট্টাম্বরে
উৎসবের বাঁশরী সঙ্গীতে। তারপরে
সুদিনে দুর্দ্দিনে কল্যাণ-কঙ্কণ করে
সীমন্ত-সীমায় মঙ্গল সিন্দুরবিন্দু

গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে।

কবি তাঁহার শেষ জীবনের দিকে আর এই কল্যাণী মূর্ত্তিটিকে তাঁহার চারিপাশে দেখিতে পান নাই। তাঁহার চারিপাশে বিদুষী ও আধুনিক রূপসীদের ভিড়ই দেখিয়াছেন। তাহার তাঁহার কাছে তাহাদের বিজাতীয় শিক্ষাসংস্কৃতির রঙ্গভঙ্গী ও লীলাচাপল্যের দাবি আদায় করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কবি তাহাদের নাতিনীর মর্য্যাদা দিয়াছেন, মাতা বা কন্যার মর্য্যাদা দিতে পারেন নাই। এই সকল বিদুষী ও রূপসীদের ভিড়েও তিনি তাঁহার উপাস্যা সেই কল্যাণীকে ভুলেন নাই। তিনি নাম্নী-কবিতায় যখন হেঁয়ালী, কাকলী, দেয়ালী, নাগরী, জয়তী, মালিনী, নন্দিনী ইত্যাদির জয় গান করিয়াছেন—তখন তাঁহার স্মৃতিলোকের অধীশ্বরী সেই কল্যাণীকে ভুলেন নাই—করুণী ও শ্যামলী নাম দিয়া তাঁহারও প্রাপ্য দান করিয়াছেন।

কবির পক্ষে এই কল্যাণীকে ভুলিয়া যাইবার উপায় নাই। বাঙ্গালার পল্লীপ্রকৃতির সহিত কল্যাণীর মহিমা যে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। তাই শেষ বয়সেও দোতলার জানালা হইতে একটি পুকুরের পানে চাহিতে চাহিতে কাহাকে কবির মনে পড়ে?

আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দূরকালের কার একটি ছবি নিয়ে এল মনে। স্পর্শ তার করুণ, স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ, মুগ্ধ সরল তার কালো চোখের দৃষ্টি। তার সাদা শাড়ির রাঙা চওড়া পাড় দুটি পা ঘিরে ঢেকে পড়েছে। সে আঙ্গিনাতে আসন বিছিয়ে দেয়, সে আঁচল দিয়ে ধূলো দেয় মুছিয়ে। সে আমকাঁটালের ছায়ায় ছায়ায় জল তুলে আনে। যখন তার কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসি সে ভালো ক'রে কিছুই বলতে পারেনা। কপাট অল্প একটু ফাঁক ক'রে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। (পুনশ্চ)

এই স্মৃতি কাহার? সেই কল্যাণীর।

বৈষ্ণব রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া ভক্ত তাহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। আকাশ যেমন গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াও অসীম এবং আকাশই, সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অসীম ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। মানবমনে অসীমের সার্থকতা সীমা-বন্ধনে আসিয়া। তাহার মধ্যে আসিলেই তাহা প্রেমের বস্তু হয়। নতুবা প্রেমাস্বাদ সম্ভবই নয়। অসীমার মধ্যে সীমাও নাই, প্রেমাও নাই। সঙ্গীহারা অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ লাভ করিতে চায়—প্রেমের জন্য। ব্রহ্মের কৃষ্ণরূপ ও রাধারূপের মধ্যে এই তত্ত্বই নিহিত। অসীম ও সীমার মিলনের আনন্দই পদাবলীর রূপ ধরিয়াছে—সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে।"

বৈষ্ণব রসতত্ত্বের,—শ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদমূলক প্রেমতত্ত্বের এত অল্প কথায় এমন চমৎকার পরিচয় আর কেহ দিয়াছেন বলিয়া জানি না। অসীমের মধ্যে সীমাও নাই—প্রেমাও নাই। সান্ত জীবাত্মার মধ্যে প্রেমের ক্ষুধা সহজাত—সে ক্ষুধা অনন্ত পরমাত্মায় নাই, ইহা হইতে পারে না। জলবিন্দুতে শৈত্য আছে কিন্তু জলে নাই, অগ্নিস্ফুলিঙ্গে দাহিকাশক্তি আছে কিন্তু অগ্নিতে নাই—একথা যেমন অশ্রদ্ধেয়—ঐ কথাও তাহাই। অন্তরের প্রেম তৃষ্ণাও অনন্ত—তাই তাহার প্রেমলীলারও অন্ত নাই। জীবাত্মার প্রেম পরমাত্মার উদ্দেশে অনন্তকাল ধাবিত হইয়াছে—পরমাত্মার প্রেমও অনন্তকাল জীবাত্মার উদ্দেশে ছুটিয়াছে। জীবাত্মার প্রতি প্রেমের এই অনন্ত প্রবাহ ছাড়া পরমাত্মার সার্থকতা নাই—পূর্ণতা নাই। তাই বৈষ্ণবগণ কল্পনা করিয়াছেন—ব্রহ্ম আপনার অন্তর্নিহিত প্রেমতৃষ্ণাকে সার্থক করিবার জন্য আপনার হ্লাদিনী শক্তিকে রাধারূপে প্রকটিত করিয়াছেন এবং নিজে শ্রীকৃষ্ণরূপে নরদেহ ধারণ করিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় ব্রহ্মের মুখে কথা বসাইয়া বলিয়াছেন—

রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।

তিনি হ্লাদিনী শক্তির ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিয়াছেন—

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেমনাম। আনন্দ বিস্ময়রস প্রেমের আখ্যান।

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি। সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী।

রবীন্দ্রনাথ কেবল এই লীলাতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়াই তাঁহার কর্তব্য শেষ করেন নাই। এই তত্ত্বকে তিনি নানাভাবে কাব্যে ও গানে রূপ দান করিয়াছেন।

কবি বলিয়াছেন—'অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ'। নিত্যই সে একা, সেইত একান্ত বিরহী। সে যেন 'পথিকহীন পথের পরে একেলা পথিক।' সসীমকে, ভক্তকে, জীবাত্মাকে তাহার চাই-ই। নতুবা সে লীলাময়, রসময়, আনন্দময় হইতে ত পারে না।

সসীমকে না চাহিলে—সসীমের প্রেম উপভোগ না করিলে—সে ত শূন্য, সে ত ভাবমাত্র, সে ত abstraction.

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নিজ্বালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ।
রাধাকৃষ্ণ তৈছে সদা একই স্বরূপ। লীলারূপ আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।

সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান কেবল লীলানন্দ উপভোগ করিবার জন্য নয়, ভক্তগণকে সেই আনন্দ উপভোগ করাইবার জন্য তাঁহাব যে নিত্যসিদ্ধা শক্তিকে আশ্রয় করেন, তাহারই নাম হ্লাদিনী শক্তি। এই হ্লাদিনী শক্তিই রাধা।

চির-পিপাসিত জীবাত্মার জন্য পরমাত্মা অনন্তকাল ধরিয়াই অভিসারে আসিতেছেন। কবি বলিয়াছেন—

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে
তোমার চন্দ্রসূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে।

*　　　*　　　*

বাতাস আসে হে মহারাজ গন্ধ তোমার মেখে।

তিনি আসেন—তাঁহাব পায়ের ধ্বনি আমরা শুনিতে পাই।—'কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার পায়ের প্রতিধ্বনি'। গভীর রাত্রিকালে মত্ত সাগরে পাড়ি দিয়া সাদা পা'লের চমক দিয়া নিবিড় অন্ধকারে তরী বাহিয়াও তিনি আসেন।

তিনি অবসর খোঁজেন। দুঃখের বরষায় চক্ষের জল নামিলেই বক্ষেব দরজায় সে বন্ধুব রথ আসিয়া থামে। 'ঝড়ের রাতে তাঁহার অভিসার।' কবি তাই বলিয়াছেন—

আমায় দেখবে ব'লে তোমার অসীম কৌতূহল।
নইলে ত' ঐ সূর্যতাবা সকলি নিষ্ফল।

আমাকে যে তোমার চাই-ই—নতুবা তোমার লীলা—যাহাকে সাধারণ লোকে বলে সৃষ্টি,—তাহা যে একেবারেই শূন্য।

আমি এলাম এলো তোমার আগুনভরা আনন্দ।
জীবনমরণ তুফান তুলে ব্যাকুল বসন্ত।

আরও স্পষ্ট করিয়াই কবি বলিয়াছেন 'গীতাঞ্জলি'তে

তাই, তোমার আনন্দ আমার 'পর　　তুমি—তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর　　তোমার—প্রেম হ'তো যে মিছে।

আমার মধ্যেই অর্থাৎ সসীমের মধ্যেই হে অসীম, তুমি তোমার নিজের সৃষ্টিলীলা উপভোগ করিতে চাও—কাজেই আমাকে তোমার চাই-ই—

হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।

আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ চায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।

এই ভাবেরই কথা—

অসীম ধন ত আছে তোমার তাহে সাধ না মেটে।
নিতে চাও তা আমার হাতে কণায় কণায় বেঁটে।

কবি বলিয়াছেন—যাহার যে ধন নাই সে ধনের জন্যই ত তাহার ব্যাকুলতা। অসীমের সীমা-ধন নাই, তাই সে সীমার স্পর্শ চায়। যেমন কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—আনন্দময়ের দুঃখধন নাই, ভক্ত তাই এই ধনই তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারে।

আমার পরশ পাবে ব'লে আমায় তুমি নিলে কোলে
কেউ ত জানে না তা।

চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

রাই, তুমি যে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি।

ঐ সুরই শুনি রবীন্দ্রনাথের এই সকল গানে :—

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে।
আমি চোখ এই আলোকে মেল্‌ব যবে, তোমার ঐ চেয়ে থাকা সফল হবে।
এ আকাশ দিন গুণিছে তারি তরে॥ সেদিনে ধন্য হবে তারার মালা
তোমার এই লোকে লোকে আলোক জ্বালা, আমার এই আঁধারটুকু ঘুচলে পরে॥

অদ্বৈত ব্রহ্ম বা অসীম একটা predicateless unity, abstraction, unreal idea মাত্র, সে সীমার মধ্যেই নিজেকে realised করে। এই কথাই বৈষ্ণব কবিরা প্রেমের ভাষায় বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও প্রেমের ভাষাতেই সেই কথাই বলিয়াছেন, তবে বৈষ্ণব symbol তিনি গ্রহণ করেন নাই এবং মধুর রসের বদলে প্রধানতঃ শান্তদাস্য রসকেই আশ্রয় করিয়াছেন। কোথাও কোথাও মধুর রসের ভাষারও ব্যবহার করিয়াছেন—

এ পথ বেয়ে, সে আসে তাই আছি চেয়ে।
কতই কাঁটা বাজে পায়ে কতই ধূলা লাগে গায়ে
মরি লাজে। সকাল সাঁজে।

*   *   *

দূরের পানে মেলে আঁখি কেবল আমি চেয়ে থাকি
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে।

* * *

তুমি, পার হয়ে এসেছ মরু, নাই যে সেথায় ছায়াতরু
পথের দুঃখ দিলাম তোমায় এমন ভাগ্যহত।

মনে পড়ে সাধক কবির—

'আঙিনার কোণে বঁধুয়া ভিজিছে দেখিয়া পরাণ ফাটে।'

শ্যামের মত দয়িতরূপী ভগবানও প্রতীক্ষা করিয়া আছেন—মিলনের জন্য তাঁহারও উৎকণ্ঠার অবধি নাই। বৃন্দার মত 'বেদনাদূতী গাহিছে ওরে প্রাণ, তোমার লাগি জাগেন ভগবান। নিশীথে ঘন অন্ধকারে ডাকেন তোমা প্রেমাভিসারে।'

যে আমিত্ব-বিসর্জ্জন বৈষ্ণব-রসধর্ম্মের মূল কথা, তাহা রবীন্দ্রনাথের ভজন-সঙ্গীতের বহুস্থলেই বিকীর্ণ হইয়া আছে—

কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ,
চির জনম এমন ক'রে ভুলিয়োনাক,
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব,
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।

বৈষ্ণবতার দৈন্য ও আকিঞ্চনে তাঁহার ভজনসঙ্গীতগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যেরই ধারা রক্ষা করিয়াছে। ব্রজপদাবলীতে চন্দ্রাবলীর আমিত্ব বিসর্জ্জনেব কথা আছে, রাধাব আমিত্ব বিসর্জ্জনের কথা নাই, রাধার আমিত্ব বিসর্জ্জন করিলে ত মানের পালাই হয় না। ববং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ হইতে স্বামিত্ব বিসর্জ্জনের চবম কথাই আছে। গৌরপদাবলীর প্রধান সুরই আমিত্ব-বিসর্জ্জন। রবীন্দ্রনাথ সেই সুরেই বলিয়াছেন—

নীচে সব নীচে এ ধূলির ধবণীতে
যেথা আসনের মূল্য না হয় দিতে,
যেথা রেখা দিয়ে ভাগ করা নেই কিছু
যেথা ভেদ নাই মানে আর অপমানে।
স্থান দাও সেথা সকলের মাঝখানে।

আমিত্ব-বিসর্জনের এই আকিঞ্চন বৈষ্ণবের, ব্রাহ্মের নয়।

নামাও নামাও আমায় তোমার চরণতলে,
গলাও হে মন ভাসাও জীবন নয়নজলে,
একা আমি অহংকারের উচ্চ অচলে
পাষাণ আসন ধূলায় লুটাও ভাঙো সবলে।

বৈষ্ণব ভক্তের চিরন্তন প্রার্থনা ইহা ছাড়া আর কিছু নয়। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—শেষ পর্য্যন্ত এই আমিত্ব বিসর্জন না করিলে প্রিয়তমের সহিত চিরমিলনের সম্ভাবনা নাই। প্রিয়তমের সহিত মিলনের পথে সব চেয়ে বড় বাধা, স্বামিত্ব ও আমিত্ব। কবি তাই বলিতেছেন—

একলা আমি বাহির হ'লাম তোমার অভিসারে।
সাথে সাথে কে চলে মোর নীরব অন্ধকারে।
সে যে আমার 'আমি' প্রভু লজ্জা তাহার নাই যে কভু
তারে নিয়ে কোন লাজে বা যাব তোমার দ্বারে।

পরম বৈষ্ণবের মতই কবি লীলাময়ের লীলায় বিশ্বাসী। তবু নরোত্তম দাসের মত বৈষ্ণবজনোচিত দৈন্যের সহিত বলিয়াছেন—

অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে,
আমি পরম অবিশ্বাসী।
এ পাপ মুখে সাজে না যে তোমায় আমি ভালবাসি।
গুণের অভিমানে মেতে আর চাহি না আদর পেতে
কঠিন ধূলায় ব'সে এবার চরণ সেবার অভিলাষী।

কবি তাই প্রার্থনা করিয়াছেন—সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। কৃতজ্ঞতাভরে বলিয়াছেন—

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই—বঞ্চিত করি বাঁচালে মোরে।

আমিত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকে ধন, জন, মান, যশ, লজ্জা, ভয় ও সংস্কারপুঞ্জ। বৈষ্ণব কবিদের মতে এই সমস্ত বিসর্জন না করিলে প্রিয়তমকে পাওয়া যায় না। সর্বত্যাগিনী কুলবধূ রাধার সর্ববাধাবন্ধনমুক্তির মধ্য দিয়া তাহা দেখানো হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবের কথা বহু গীতিতেই ব্যক্ত করিয়াছেন—

শক্তি যারে দাও বহিতে অসীম প্রেমের ভার,
একেবারে সকল পর্দা ঘুচায়ে দাও তার।
না রাখ তার ঘরের আড়াল না রাখ তার ধন,
পথে এনে নিঃশেষে তায় কর অকিঞ্চন।
না থাকে তার মান অপমান শঙ্কা শরম ভয়,
একলা তুমি সমস্ত তার বিশ্বভূবনময়।

বৈষ্ণব কবি রাধাকেই এই অসীম প্রেমের পশারিনী বা ভারবাহিনীরূপে কল্পনা করিয়াছেন।

বৈষ্ণবসাহিত্যে দুর্গম শঙ্কিল পঙ্কিল পথে রাধা কিংবা শ্যামের অভিসার কবির কল্পনাকে উদ্বেলিত করিয়াছে। এই অভিসারের রূপকে (metaphor, allegory) তিনি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনাগ্রহ বহু স্থলেই প্রকাশ করিয়াছেন :—

ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
সুদূর কোন নদীর পারে গহন কোন বনের ধারে
গভীর কোন অন্ধকারে হতেছ তুমি পার।

আর একস্থলে কবি বলিয়াছেন—

তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে আনন্দের নবনব পর্যায়। পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে নিত্যপুষ্প, নিত্যচন্দ্রালোকে। নিত্যই সে একা, সেইত বিরহী। যে অভিসারিকা, তারই জয়, আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে। সেও ত নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ। সে যে বাজায় বাঁশি, প্রতীক্ষার বাঁশি, সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকারপথে। বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা, পদে পদে মিলেছে একতালে। তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে, সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে। (পুনশ্চ)

ভক্তের চেয়ে ভগবানের ব্যাকুলতা অল্প নয়। তাই ভগবানের সহিত ভক্তের মিলন সম্ভব। ভক্তের আকুল আকাঙ্ক্ষা ও ভগবানের আকুল প্রতীক্ষায় অর্থাৎ "বাঞ্ছিতের আহ্বান ও অভিসারিকার চলা"—দুইএর মিলেই ত সাধনা।

লোকভয়, সমাজভয়, শাস্ত্রশাসনভয়, গুরুজনের ভয় সকল ভয়ই রাধা জয় করিয়াছিল। প্রেম তাহাকে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা ও দুঃসাহসিকা করিয়াছিল। ভীষণতম প্রাকৃতিক ভয়ও যে রাধা জয় করিয়াছিল তাহা দেখাইবার জন্য বৈষ্ণব কবি দারুণ দুর্দিনে অতি দুর্গম শঙ্কিল পঙ্কিল পথে বজ্রঝঞ্ঝার মধ্যে রাধাকে অভিসারে পাঠাইয়াছেন। কবি তাহার অভিনব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়া লিখিয়াছেন—

জীবনে ঘন অন্ধকারে দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিল। বৃষ্টিবারিধারায় দিগ্‌বিদিক ভাসিয়া যায়, নিষ্ঠুর বিদ্যুৎ-শিখা কুটিল কটাক্ষে হাসিযা চলিয়া যায়, উতরোল বাতাসে অবণ্য উতলা হইয়া উঠিয়াছে—এমন দুর্দিনে

আজি তুমি ডাক অভিসারে হে মোহন,
হে জীবনস্বামী। অশ্রুসিক্ত বিশ্বমাঝে
কোন দুঃখে কোন ভয়ে কোন বৃথা কাজে
রহিব না রুদ্ধ হ'য়ে। * * *

তারপর কবি প্রার্থনা করিয়াছেন—

যে দীপটি অঞ্চলের আড়ালে বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝার তাড়না হইতে বাঁচাইয়া আমি সংসারের পিছিল তিমিরময় পথে চলিয়াছি, সে পথে আমার সেই দীপটি যেন বার বার নিভিয়া না যায়। দুঃখের পরিবেষ্টনে জীবনের এই দুর্দ্দিন যে নিবিড় নির্জ্জনতার সৃষ্টি করিল সেই নির্জ্জনতায়—

'হোক আজি তোমা সাথে একান্ত মিলন।'

বৈষ্ণব কবিদের ভাব, ভাষা, রসসৃষ্টির বিবিধ অঙ্গ কবির বহু রচনার উপজীব্য হইয়াছে। কবি যমুনায় হৃদয়-শব্দ যোগ দিয়া 'হৃদয়-যমুনা' কবিতাটিকে রূপকের রূপ দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কালিন্দীর কলধ্বনির মধ্যে কালার আহ্বানের সুরটি থাকিয়াই গিয়াছে। স্তরে স্তরে যে প্রেমের প্রগাঢ়তা ঐ কবিতায় ফুটিয়াছে তাহা প্রাকৃত প্রেম নয়, তাহা অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের সেই প্রেম যে প্রেমে বিরহ ও মরণের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া যায়। মনে পড়ে গোবিন্দ দাসের—

এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ। ঐছনে মিলই যব গোকুল চন্দ।

কবি যমুনার স্থলে প্রেমনদী ও বেণুর স্থলে বীণা প্রয়োগ করিলেও বৈষ্ণব কবির কথাই প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন, যখন লিখিয়াছেন—

এখন—বিজন পথে করে না কেউ আসা যাওয়া
ওরে—প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ উতল হাওয়া—
জানিনা আর ফিরব কিনা কার সাথে আজ হবে চিনা
ঘাটে—সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে।
চলরে ঘাটে কলসখানি ভ'রে নিতে॥

হয়ত কিনা ও চিনার সঙ্গে মিলের জন্যই বীণা আসিয়াছে, নতুবা বেণুই বাজিত।

আমরা যাহা দেখিয়াছি শুনিয়াছি কেবল তাহাই দিয়া আমাদের স্মৃতিলোক গড়া নয়। আমরা সারস্বতজগৎ হইতে যাহা কিছু পাই—তাহাও আমাদেব মানসজীবনের অঙ্গীভূত হয়, সেজন্য আপ্ত ও প্রত্যক্ষলব্ধ দুইশ্রেণীর উপাদান (imageries) আমাদের স্মৃতিলোক গড়িয়া তোলে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিলোকের অনেকটুকু জুড়িয়া আছে বৈষ্ণবপদাবলী হইতে আপ্ত ছায়াচিত্রগুলি। কবির কাছে এইগুলি প্রত্যক্ষলব্ধ উপাদানের চেয়ে অধিকতর সত্য।

বর্ষাব বাতাস অঙ্গে লাগিলেই যেমন মেঘদূতের অভিযান-পথটি কবিব মনে পড়ে তেমনি মনে পড়ে বাধিকাব অভিসাব-পথটি।

মনে পড়ে ববিষার বৃন্দাবন অভিসাব
একাকিনী রাধিকাব চকিত চবণ,
শ্যামল তমালতল নীলযমুনার জল
আর দুটি ছলছল নলিন নয়ন।
এ ভবা ভাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।
বিজন যমুনাকূলে বিকসিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরাণ বুলে বিরহব্যথায়।

রসিকতায় ভরা 'পত্র' নামক একটি পরিহাসবিজল্পিত কবিতা হইতে এই অংশ উদ্ধৃত। কৌতুক-রসায়িত মনে বন্ধুকে পত্র লিখিতে লিখিতে কবি যেমন বাহিরে বর্ষা-প্রকৃতির পানে চাহিয়াছেন—অমনি রসান্তর সঞ্চাব ঘটিয়া গিয়াছে অর্থাৎ মুখে কৌতুকের হাসি মিলাইয়া গিয়াছে, বর্ষাভিসারিণী শ্রীরাধিকার বেদনায় কবির চোখও ছল ছল করিয়া উঠিয়াছে।

বৃন্দাবনের বংশীধারী রাখালটি নানা অপরূপ রূপ ও রূপকের মধ্য দিয়া কবির কাব্যে দেখা দিয়াছে। যেমন—

মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখী
হে রাখাল বেণু তব বাজাও একাকী।

তাহা শুনিয়া শ্রান্তপ্রান্তরের কোণে রুদ্রেরও জ্বালাময় নয়ন স্বপ্নমগ্ন হয় মধুরের

ধ্যানাবেশে। কবি মধ্যাহ্নপ্রকৃতির মধ্যে ব্রজরাখালের রূপটি এইভাবে দেখিয়াছেন। মধ্যাহ্নের সঙ্গীত ত ব্রজরাখালের বেণুতেই চিরদিন বাজিতেছে, গোষ্ঠলীলার কবিরাই সেদিকে প্রথম আমাদের শ্রুতি আকর্ষণ করেন।

অন্যত্র—

ঐ তো তোমার আলোক-ধেনু সূর্যতারা দলে দলে
কোথায় ব'সে বাজাও বেণু চরাও মহাগগনতলে।

কবি প্রার্থনা করিয়াছেন—হে আমার জীবনের রাখাল, তোমার আলোকধেনু বিশ্বের প্রান্তরময় ছড়াইয়া পড়ে সকালবেলায়, সন্ধ্যাকালে আঁধার আসন্ন হইলে নিত্য সাঁজের সুরে তাহাদের আপনার গোষ্ঠগৃহে ফিরাইয়া আনো। আমার সকল আশাতৃষ্ণা ঐ ধেনুগুলির মত চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তুমি আমার জীবনসন্ধ্যায় তাহাদের তোমাব যাত্রাপথে কি তাহাদের ডাকিয়া লইবে না? আবাব—

কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিন-ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠ-গৃহ মাঝে উৎকণ্ঠিত বেগে।
এই শিঙা ব্রজগোষ্ঠের বলরামের শিঙাকেই মনে পড়ায়।

কবিগুরু বৈষ্ণব কবিদের মত নামব্রহ্মকেও স্বীকার করিয়াছেন। কেবলমাত্র ভগবানের নাম জপেরও সার্থকতা আছে তাহা বৈষ্ণব সাধক যবন হরিদাসের মতই তিনিও উপলব্ধি করিয়াছেন—

তোমারি নাম বলব নানান ছলে।
বলব মুখের হাসি দিয়ে বলব চোখের জলে।
বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকব তোমার নাম।
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই পূরবে মনস্কাম।

বৈষ্ণবেরই ডাক 'বিনা প্রয়োজনের' ডাক। প্রার্থনীয় তাহার কিছুই নাই,—শাক্তের দেহি দেহি কামনার ডাকও নয়—খৃষ্টানের কৃতজ্ঞতার ডাকও নয়। বৈষ্ণব নাম জপ করে, নামকীর্ত্তন করে, নিজেকে নামীর ভাবে আবিষ্ট করিবার জন্য। সাংসারিক অন্য প্রয়োজনের ত কথাই নাই বৈষ্ণব মুক্তিও চায় না।

আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে।
আমার নীরবতায় তোমার নামটি রাখ থুয়ে।

আমার সব আকাঙ্ক্ষা আশায় তোমার নামটি শিখা হইয়া জ্বলুক। আমার সকল ভালবাসায় তোমার নামটি লিখিত থাকুক। আমার সকল কাজের শেষে তোমার নামটি ফলিত হউক। হাসিয়া কাঁদিয়া তোমার নামটি বুকে ও কোলে করিয়া রাখিব। মহাপ্রভু এই নামকীর্ত্তনের মহিমা বর্ণনায় বলিয়াছিলেন ইহা চেতোদর্পণমার্জ্জন ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপন, কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণ, আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধন, সর্ব্বাত্মস্নপন ইত্যাদি। এস্থলে এই কথাগুলি স্মরণীয়।

জীবনপদ্মে সংগোপনে র'বে নামের মধু।
তোমায় দেব মরণক্ষণে তোমারি নাম বঁধু।

মনে রাখিতে হইবে যাঁহার নামের কথা কবি বলিলেন, তিনি নামরূপহীন নিরুপাধিক ব্রহ্ম নহেন—তিনি বঁধু; অর্থাৎ বৈষ্ণবের ভগবান্। এই গানটি শুনিবার সময় মনে হয় রবীন্দ্র-নাথের অন্তর্দেহটিকে বেড়িয়া রহিয়াছে একখানি গেরুয়া রঙের নামাবলী।

বাংলা পল্লীর আঙিনায় দীনের কণ্ঠে যে নাম নিত্যই ধ্বনিত হইতেছে, বলা বাহুল্য তাহা ব্রহ্মনাম নয়, তাহা হরিনাম—কিংবা দীন পল্লীবাসীরা আপন চেনা লোকের মত তাঁহার যে নাম দিয়াছে সেই নাম।

জ্বলে নেভে কত সূর্য নিখিল ভুবনে,
ভাঙে গড়ে কত প্রতাপ রাজার ভবনে।
তারি মাঝে আঁধার রাতে পল্লীঘরের আঙিনাতে,
দীনের কণ্ঠে নামটি তোমার উঠছে গগনে।

দীন পল্লীবাসীরা ভক্তিভরে যে নামেই ডাকুক তাহা সমস্ত কোলাহল ভেদ করিয়া তাঁহার দিকেই ছুটিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহাব নাটকগুলিতে কয়েকটি প্রকৃত বৈষ্ণব-চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এই চবিত্রগুলি সর্বহারা নিবভিমান, তৃণাদপি স্থনীচ, তরোরিব সহিষ্ণু এবং সর্বসংস্কারমুক্ত। কবির অন্তরের গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি এই আত্মভোলা বাউল দাদাঠাকুরদের চরিত্রগুলি।

কবি পীয়ারসন সাহেবেব মধ্যে এইরূপ 'অমানিনে মানদ' বৈষ্ণব চরিত্রের আভাস পাইয়া 'বলাকা'র উৎসর্গ-পত্রে লিখিয়াছেন—তুমি সকলের পিছনে নিজেকে গোপন রাখিতে চাও, তুমি সহজে নিজেকে ভুলিয়া থাক। অর্থাৎ তুমি বৈষ্ণবের মতই জান—প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা।

ছোটরে কখনো ছোট নাহি কর মনে,
আদর করিতে জান অনাদৃত জনে।
প্রীতি তব কিছু না চাহে নিজের জন্য,
তোমারে আদরি' আপনারে করি ধন্য।

বৈষ্ণব সাধকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া কবি বলিয়াছেন—

তোমারে বলেছে যারা পুত্র হতে প্রিয়,
বিত্ত হ'তে প্রিয়তর, যা কিছু আত্মীয়,
সব হ'তে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে
আত্মার অন্তরতর, তাঁদের চরণে
পাতিয়া রাখিতে চাহি হৃদয় আমার।

তারপর কবি বলিয়াছেন—হে অন্তর্যামী, কেমন করিয়া আমি সেই সরল গভীর উদার শান্ত প্রেম, সেই নিশ্চিত নিঃসংশয় সুনিবিড় সহজ মিলনাবেগ, আত্মার সেই চিরস্থির একাগ্রলক্ষ্য, সকল কর্মে তোমার মধ্যে গভীর প্রশান্তচিত্তে সেই সহজ সঞ্চরণ করিবার অধিকার লাভ করিব?

কবি নানা প্রবন্ধে বৈষ্ণব কবিদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের কবিতার রস উপলব্ধি করিয়া সে উপলব্ধির অংশ আমাদিগকে দিয়াছেন, তাঁহাদের রসবস্তুর অভিনব Interpretation দিয়াছেন এবং আপন বক্তব্যের সমর্থনের জন্য তাঁহাদের রচনা হইতে অনেক অংশ উৎকলন করিয়াছেন। সে সকল রচনায় কবির সহিত তাঁহাদের অন্তরের যোগটি পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির জন্য সে সমস্ত আর উদ্ধরণ করিলাম না।

বৈষ্ণবকবিগণ পদাবলী-সাহিত্যে বৃন্দাবনের যে সরল অনাড়ম্বর রসঘন রূপটি চিত্রিত করিয়াছেন—তাহার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ পরিস্ফুট হইয়াছে, 'ক্ষণিকার' 'জন্মান্তরে' কবিতাটিতে। যাহারা বংশীবটের তলে নিত্য ধেনু চরায়, যাহারা গুঞ্জাফলের মালা গাঁথিয়া গলায় পরে, যাহারা বৃন্দাবনের বনে শ্যামের বংশীধ্বনি শোনে, যাহারা যমুনার শীতল কালো জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে তাহাদের প্রতি প্রাণের দরদ জানাইয়া কবি বলিয়াছেন—

আমি—হ'ব না ভাই নব বঙ্গে নবযুগের চালক,
আমি—জ্বালাব না আঁধার দেশে সুসভ্যতার আলোক।
যদি—ননীছানার গাঁয়ে কোথাও—অশোক নীপের ছায়ে
আমি—কোন জন্মে হ'তে পারি ব্রজের রাখাল-বালক।
তবে—চাই না হ'তে নববঙ্গে নবযুগের চালক।

বহুদিন পরে ভক্তিব দিক হইতে কবি এই সুরের পবিণতি দেখাইয়াছেন তাঁহাব ভাগবত সঙ্গীতগুলিতে। 'গীতিমাল্যে' লিখিয়াছেন—

ওদের সাথে মেলাও যারা চরায় তোমার ধেনু,
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু।

আর এক স্থলে ঐ রাখালরাজের সঙ্গে মানসমিলন অনুভব করিয়া বলিয়াছেন—

সঙ্গে তারি চরাই ধেনু বাজাই বেণু
তারি লাগি বটের ছাঁয়ায় আসন পাতি।
নিত্যপ্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে।

প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদের ব্রজবুলিতে রচিত পদাবলীর অনুসরণে ভানু সিংহের পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। এই পদগুলির ছন্দোবন্ধ, ভাষাবিন্যাস, রচনাভঙ্গী, রসসৃষ্টির আদর্শ লক্ষ্য করিলে মনে হয়—এগুলি যেন গোবিন্দ দাস, রায়শেখর বা বলরামদাসের মত প্রাচীন কবিদের রচনা। বৈষ্ণবপদাবলী কতদূর নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত পাঠ করিলে পদকর্তাদের ভাবভঙ্গী সমস্তই আত্মসাৎ করা যায় তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। মনে হয় যেন প্রাক্তন সংস্কার কবিকে আশ্রয় করিয়াছে। অবশ্য এই পদগুলিতে কবি তাঁহার অসামান্য হৃদয়মাধুর্য্য সঞ্চার করিতে পারেন নাই। এইগুলি তরুণ রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ রচনা-চাতুর্যের নিদর্শনস্বরূপ থাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী পাঠে কবি যে সুললিত ভাষা ছন্দ অধিগত করিয়াছিলেন উত্তরকালে তাহা তাঁহার বহু কবিতাব মধ্যে অনুস্যূত হইয়া লালিত্য ও লাবণ্যের সঞ্চার করিয়াছে। বৈষ্ণবপদাবলী পাঠে তিনি যে নব নব ছন্দের সন্ধান

পাইয়াছিলেন—সেই ছন্দগুলিই তাঁহার কাব্যে অভিনব রূপ-রূপান্তর লাভ করিয়াছে। আর ঐ পদাবলীর রসাদর্শও তিনি 'খেয়া'র এপার পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন। পদাবলীর লীলাতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা খেয়াপার হওয়ার পর তাঁহার ভাগবত-সঙ্গীতগুলির মধ্যে অভিনব অপূর্ব বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। অভিনব সার্থকতা লাভ করিয়াছে পদাবলীর অভিসার,—অনন্ত-পথ-যাত্রায়, পদাবলীর বিরহ অসীমের জন্য আবেগময় ব্যাকুলতায়, পদাবলীর বেণুধ্বনি অসীমের আহ্বানে, সখীদের দৌত্য প্রকৃতির নব নব বৈচিত্র্যের ইঙ্গিতে ও বেদনাদূতীর দূতিয়ালিতে। আর পদাবলীর প্রাকৃতিক আবেষ্টনী তাহার কল্পনায় মেঘৈর্মেদুর অম্বর, তমালের ছায়ান্ধকার, ধেনুচরা বেণুবাজা গোষ্ঠভূমির শ্যামলতা, যমুনার তলতল ছলছল জলকল্লোল, শিখণ্ডিশিখণ্ডমণ্ডিত রোমাঞ্চিত কদম্ববনের মধ্যে অভিনব রসরূপ লাভ করিয়াছে তাঁহার কাব্যে। বিশেষতঃ ব্রজের বর্ষাপ্রকৃতি যেন তাঁহার বঙ্গের বর্ষাপ্রকৃতিকেও আত্মসাৎ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

কবি বর্ষার ঝিমিঝিমি বর্ষণে বৃন্দাবনী বর্ষার সুর শুনিয়া বলিয়াছেন—

শুনি সেই সুর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা, মধুময় হয়ে ওঠে
আমাদের বনচ্ছায়ে যে নদীটি ছুটে
মোদের কুটীরপ্রান্তে যে কদম্ব ফুটে
বরষার দিনে।

প্রকৃতির নবনব বৈচিত্র্য বাল্য হইতেই কবির চোখে মধুর। যাহা তাঁহার কাছে মধুর ছিল—তাহা যৌবনে পদাবলী পাঠের ফলে দ্বিগুণ মধুর হইয়াছে। আমরা সেই দ্বিগুণিত মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পাইয়া ধন্য হই যখন কবি বলেন—

আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে,
শরতের পূর্ণিমায় শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।
এখনো সে বাঁশী বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা সারা দিন সারা বেলা,
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটীরে।

মানবের মনে আছে কিনা জানি না—তবে মহামানব রবীন্দ্রনাথের মনে তাহা চিরন্তন আসন গ্রহণ করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিদ্যাপতির বর্ষাবিরহের কবিতায় তিনি আপন প্রাণের সুর খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তাই কবি একস্থলে বলিয়াছেন, "বিনা কারণে ব্যথিত হিয়া—উঠিল গাহি গুঞ্জরিয়া বিদ্যাপতি রচিত সেই ভরাবাদর গান।"

চণ্ডীদাসের পদাবলীর গভীর প্রেমের সুরের তিনি Mystic interpretation দিয়াছেন। জ্ঞানদাসের 'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন' পদটি কবিগুরুর কল্পনাকে চঞ্চল

করিয়াছিল। তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন—"অন্ধকার বাদলা রাতে মনে পড়েছে ঐ পদটা—রজনী শাঙন ঘন…স্বপন দেখিনু হেনকালে। সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে কবির চোখের কাছে কোন একটি মেয়ে ছিল। ভালবাসার কুঁড়িধরা তার মন। মুখচোরা সেই মেয়ে। চোখে কাজল পরা। ঘাট থেকে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা। সে মেয়ে আজ নেই। আছে শাঙন ঘন, আছে সেই স্বপ্ন, আজো সমানই।"

আর একস্থলে কবি বলিয়াছেন—

যখন নিশীথে গর্জিছে দেয়া রিমিঝিমি বারি বর্ষে।
মনে মনে ভাবি কোন পালঙ্কে কেবা নিদ যায় হর্ষে।
গিরির শিখরে ডাকিছে ময়ূর কবি কাব্যের রঙ্গে।
স্বপ্নপুলকে কে জাগে চমকি বিগলিত চীর অঙ্গে।

স্মর্তব্য জ্ঞানদাসের পদ—

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিন্দ্রা যাই মনের হরিষে।
শিয়রে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল কোকিল কুহরে কুতূহলে।
স্বপন দেখিনু হেনকালে।

জ্ঞানদাসের—রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর—পদটি কবির যৌবনে 'দেহের মিলন' নামক একটি সনেটের প্রেরণা দিয়াছিল। রূপ গোস্বামী অনুভবের যে ব্যাখ্যা দিয়াছে, সেই ব্যাখ্যাসম্মত অর্থে কবিবল্লভ লিখিয়াছেন.

"সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়।"

রবীন্দ্রনাথ সেই অনুভবকে উপলব্ধি কবিযা বলিয়াছেন—"দেখি আমার মধ্যকার অচেনাকে, তখন আপন অনুভবের তল খুঁজে পাইনে। সেই অনুভব তিলে তিলে নূতন হোয়।"

প্রেমের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলরামদাসের একটি পদে কবি নিজের বক্তব্যের সমর্থন লাভ করিয়াছেন—

"প্রেমিক হৃদয়ের মধ্যে যখন যথার্থ প্রেম অনুভব করে, তখন সেই প্রেমকে প্রকাশ অর্থাৎ বাহিরে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য সে ধন-প্রাণ-মান সমস্তই এক নিমেষে বিসর্জন করিতে পারে। এমন করিয়া বাহিরকে অন্তরের ও অন্তরকে বাহিরের সামগ্রী করিবার একান্ত ব্যাকুলতা হৃদয়ের কিছুতে ঘুচে না। বলরামদাসের একটি পদে আছে—

তোমায় হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।

অর্থাৎ প্রিয় বস্তু যেন হৃদয়ের ভিতরকারই বস্তু, তাহাকে কে যেন বাহরে আনিয়াছে—সেইজন্য তাহাকে আবার ভিতরে লইবার জন্য এতই আকাঙ্ক্ষা।"

বৈষ্ণবপদাবলীর নব সার্থকতা আবিষ্কারের ইহা একটি নিদর্শন। শুধু তাহাই নয়, চণ্ডীদাসের পদাবলীর মুখ্য রসসূত্রের কথাই এখানে কবি বিবৃত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ‘শ্রাবণ-সন্ধ্যা’ নামক প্রবন্ধে বিদ্যাপতির (বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিশেষজ্ঞদের মতে কবিশেখরের) ‘ভরাবাদর মাহ ভাদর’ পদটির চমৎকার mystic interpretation দিয়াছেন। শ্রাবণসন্ধ্যার অবিরল বর্ষণ তাঁহার চিত্তে আত্মার যে চিরন্তন গূঢ় বিরহ বেদনা জাগাইয়াছে, ঐ পদে তাহার প্রকাশের ভাষা তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তাই বিদ্যাপতির সঙ্গে একাত্মক হইয়া তিনি গাহিয়াছেন—‘কৈসে গোঙায়ব হরি বিনে দিন রাতিয়া।’

‘সাহিত্য-সৃষ্টি’ প্রবন্ধে ঐ পদের সবজনীন আবেদন (Universal appeal) লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—‘ভরা বাদরে ভাদ্রমাসে শূন্য ঘরের বেদনা কত লোকেরই মনে কত কথা না কহিয়া কত দিন ঘুরিয়া ফিরিয়াছে—যেমান ঠিক কথাটি বাহির হইল অমনি সকলেরই এই অনেক দিনের কথাটা মূর্তি ধরিয়া আঁট বাঁধিয়া বসিল।’

কবি যৌবনে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর একটি তুলনামূলক সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে দেখাইয়াছিলেন একজন অন্যজনের অনুপূরক। ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিলে মনে হয় এই দুই কবির রসাদর্শের অপূর্ব মিলন হইয়াছে তাঁহার প্রেমের (প্রাকৃত ও আধ্যাত্মিক) কবিতায়।

ভগবান ভিখারী হইয়া ভিক্ষা চান, রাজাধিরাজ হইয়াও ভিখারী সাজেন, ক্ষুধিত হইয়া অন্ন চান, তৃষিত হইয়া তিনি জল চান—এ সমস্ত বৈষ্ণব ভাবেরই কথা। কবি লিখিয়াছেন—

ঝুলি হ’তে দিলাম তুলে একটি ছোট কণা।
যবে—পাত্রখানি ঘরে এনে উজাড় করি একি,
ভিক্ষা-মাঝে একটি ছোট সোণার কণা দেখি।
দিলেম যা রাজভিখারীরে স্বর্ণ হয়ে এলো ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন ভ’রে।
তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শূন্য ক’রে।

মনে পড়ে ঘনশ্যামদাসের একটি পদ:

এত কহি ফলহারী ফল দিল কর ভরি’
প্রেমভরে গদ্‌গদ্ চিত।
কৃষ্ণচন্দ্র ফল হাতে খাইতে খাইতে সাথে
আসি নিজ গৃহে উপনীত।
ফল দেখি যশোমতী আনন্দে না জানে কতি
খাওয়াইয়া প্রেমসুখে ভাসে।
ধন্য সেই ফলহারী ফলে পাইল নন্দহরি
কহে কিছু ঘনশ্যামদাসে।
কিন্তু—ডালা হইল রতনে পূরিত। ফলহারী সবিস্ময় চিত।
আপনা আপনি করে খেদ। মনে মনে ভাবে নিরবেদ।

কৃষ্ণচন্দ্রকে ফলের পশারী যে ফল দান করিল, তাহা স্বর্ণ নয়, রতন হইয়া ফিরিয়া

আসিল। তখন ফলহারীর মনে নির্বেদ জন্মিল—'তোমায় কেন দিইনি আমার ডালা শূন্য ক'রে।' রবীন্দ্রনাথের 'পসারিনী' কবিতার

এতভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি কোমল করুণ ক্লান্ত কায়।
কোথা কোন রাজপুরে যাবে আরো কতদূরে কিসের দুরূহ দুরাশায় ?
সম্মুখে দেখত চাহি পথের যে সীমা নাহি তপ্ত বালু অগ্নিবাণ হানে।
পশারিণী কথা রাখ দূর পথে যেও নাক ক্ষণেক দাঁড়াও এইখানে। * *
মধ্যদিনে রুদ্ধ ঘরে সবাই বিশ্রাম করে দগ্ধপথে উড়ে তপ্ত বালি,
দাঁড়াও যেওনা আর নামাও পশরাভার মোর হাতে দাও তব ডালি।

পড়িতে পড়িতে মনে পড়ে—বংশীবদনের পদটি—

বিনোদিনি এ পথে কেমনে যাবে তুমি ?
শীতল কদম্বতলে বৈসহ আমার কোলে সকলি কিনিয়া নিব আমি।
এ ভর দুপুর বেলা তাতিল পথের ধূলা কমল জিনিয়া পদ তোরি।
রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুখ শ্রমভরে আউলিল কবরী।
মথুরা অনেক পথ তেজ অন্য মনোরথ মোর কাছে বৈস বিনোদিনি,
বংশীবদনে কয় এই সে উচিত হয় শ্যাম সঙ্গে কর বিকিকিনি।

জ্ঞানদাসের ঐ ভাবের পদ

আইস বৈস মোর কাছে রৌদ্রে মিলাও পাছে বসনে করিয়ে মন্দ বায়।
এ দুখানি রাঙা পায় কেমনে হাঁটিছ তায় দেখিয়া হালিছে মোর গায়।

রবীন্দ্রনাথ যৌবনে বৈষ্ণব কবিতার উপর একটি চমৎকার কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে বৈষ্ণব রসতত্ত্বের সার কথা একটি চরণে ঘনীভূত হইয়া আছে। 'প্রিয়েরে দেবতা করি দেবতারে প্রিয়'। আর একটি কবিতায় কবি বলিয়াছেন—'যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা।' রবীন্দ্রনাথের 'ভাগবত' কবিতার সার কথাও ইহাই। প্রাকৃত-প্রেমকেই ভাগবত প্রেমে পরিণতি (Sublimation)—অর্থাৎ প্রিয়ের দেবতায় পরিণতিই এ প্রেমের ক্রমাভিব্যক্তি।

যে প্রেম মানবীর নয়ন-শরাঘাতে প্রথম উন্মেষিত হইল—তাহাই অর্দ্ধেক-মানবী অর্দ্ধেক কল্পনায় রূপায়িতার উদ্দেশে—পরে মানসীর উদ্দেশে—পরে জীবনদেবতার উদ্দেশে, তারপরে বিশ্বদেবতার উদ্দেশে তারপর অনন্তের উদ্দেশে সে প্রেমই ক্রমরূপরূপান্তর লাভ করিয়া যাত্রা করিয়াছে। মানবীর প্রতি প্রেমপ্রকাশের যে ভাষা ছিল, শেষ পর্যন্ত সে ভাষার রেশ থাকিয়া গিয়াছে—কেবল তাহার দৈহিকতা একেবারে চলিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব কবিরা দেবতাকে দেবতা বলিয়া দূরে সরাইতে চাহেন নাই—আপন জন ভাবিয়া বুকের কাছে টানিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার আরাধ্যকে বন্ধু বা দয়িত-ভাবেই বক্ষে পাইতে চাহিয়াছেন। রসের ভুবনে প্রভু নাই, আছে প্রিয়, আছে সখা, আছে বল্লভ, আছে দোসর। কবি তাই বলিয়াছেন—"সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে, বন্ধু বলি ডাকি মোর প্রভুকে।" ইহাই তাঁহার সাধক মনোভাবের কথা। এই সুরের ঘোরের মনোভাব স্থায়ী হয় না বলিয়া ক্ষোভের সঙ্গে

বলিয়াছেন 'দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়িয়ে, আপন জেনে আদর করিনে।' কবি তাই তাঁহার ভজনসঙ্গীতগুলিতে বৈষ্ণবের মত দেবতাকে আপন জানিয়া আদর করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

কবি একস্থলে বলিয়াছেন—তাঁহার মধ্যে একটি চিরবিরহিণী নারী বিরাজ করিতেছে। আর একটি কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—আজিও কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটীরে। ঐ রাধাই ত চিরবিরহিণী নারী, আর হৃদয়-কুটীর—কবিরই হৃদয় কুটীর। রাধার চিরবিরহের আবেদন আকিঞ্চনই (Yearning) কবির বহু কবিতার মধ্যে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। তাই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের মতন এত বড় বৈষ্ণব কবি অনেক 'পদকর্ত্তা' কবিও নহেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"প্রকৃতির প্রতিশোধের পরবর্ত্তী আমার সমস্ত কাব্য রচনার একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দিতে পারা যায় সীমার মধ্যে অসীমের মিলনসাধনের পালা—এই একটি মাত্র Idea অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্য্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।"

সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালাই—বৈষ্ণব লীলাতত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ নিজেই একথা স্বীকার করিয়াছেন তাহা গোড়াতেই উৎকলন করিয়াছি। সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধি বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব,—একথা তিনি 'পঞ্চভূতে'র 'মনুষ্য' প্রবন্ধেও বলিয়াছেন—

"যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার অন্য নাম ভালোবাসা। সমস্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।

বৈষ্ণবধর্ম্ম সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন সে আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।"

বৈষ্ণব ধর্ম্মের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের সাধনার চমৎকার ব্যাখ্যা এই অংশে আমরা পাইতেছি। কবি এই অভিনব ব্যাখ্যা দিয়া বৈষ্ণবরসতত্ত্বকে স্বীকার করিতেছেন।

পদাবলী সাহিত্যের ভাষা ও ছন্দের ঐশ্বর্য এবং সেই সঙ্গে কীর্তনসঙ্গীতের উৎকর্ষ সম্বন্ধে অন্তরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া কবি বলিয়াছেন—

"প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব্ব স্বাধীনতা প্রবলবেগে বাংলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, যাহা পূর্ব্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্তে দূর হইল। অলঙ্কার-শাস্ত্রের পাষাণবন্ধন সকল কেমন করিয়া এক মুহূর্তে বিদীর্ণ হইল। ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়, ছন্দ এত সঙ্গীত কোথা

হইতে আহরণ করিল, বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নয়, প্রবীণ সমালোচকের অনুশাসনে নয়, দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল। প্রকাশ করিবার এত আনন্দ, আবেগ এত যে, তখনকার উন্নত মার্জিত কালোয়াতী সঙ্গীত থৈ পাইল না। দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব সঙ্গীত-প্রণালী তৈরি করিল, আর কোন সঙ্গীতের সহিত যাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত। মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহেন—এই মন্ত্র যেমনি উচ্চারিত হইল, অমনি দেশের যত পাখী সুপ্ত হইয়া ছিল, সকলেই এক নিমেষে জাগরিত হইয়া গান ধরিল।

ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, বাংলাদেশ আপনাকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছিল বৈষ্ণবযুগে। এই সময়ে এমন একটি গৌরব সে প্রাপ্ত হইয়াছিল যাহা অলোক-সামান্য, যাহা বিশেষরূপে বাংলা দেশের, যাহা এদেশ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছিল।”

কবি পদাবলী-সঙ্গীতকে বাঙালী জাতির আত্মপ্রকাশের উৎসমুখ বলিয়াছেন। জাভাযাত্রীর পত্রে লিখিয়াছেন—“এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলা দেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তনগানে সে আপন আবেগ সঞ্চারের পথ পেয়েছে, এখনও সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি।”

বৈষ্ণব সাহিত্য ও চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের প্রভাব জাতীয় জীবনে যে কত বড় তাহা রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার উক্তি হইতেই তাহা জানাই—

“শক্তি যখন সকলকে পেষণ করিতেছিল, উচ্চ যখন নীচকে দমন করিতেছিল, তখনই সে প্রেমের কথা বলিয়াছিল। তখনই সে ভগবানকে তাঁহার রাজসিংহাসন হইতে আপনাদের খেলাঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল—এমন কি প্রেমের স্পর্ধায় সে ভগবানের ঐশ্বর্যকে উপহাস করিয়াছিল। ইহাতে করিয়া যে ব্যক্তি তৃণাদপি সুনীচ সে-ও গৌরব লাভ করিল। যে ভিক্ষার ঝুলি লইয়াছে, সেও সম্মান পাইল। যে ম্লেচ্ছাচারী সেও পবিত্র হইল। তখন সাধারণের হৃদয় রাজার পীড়ন ও সমাজের শাসনের উপরে উঠিয়া গেল। বাহ্য অবস্থা সমানই রহিল, কিন্তু মন এই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিখিল জগৎ সভার মধ্যে স্থান লাভ করিল। প্রেমের অধিকারে সৌন্দর্যের অধিকারে কাহারও বাধা থাকিল না।”

পদাবলীর বাথালী কাণ্ডের মধ্যে তিনি শাস্ত্রসংস্কার-মুক্তির বাণী লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

“কৃষ্ণরাধার বিরহমিলন সমস্ত বিশ্ববাসীর বিরহমিলনের আদর্শ। ইহার উপরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ্য সমাজ বা মনুসংহিতা নাই। ইহার আগাগোড়া বাথালী কাণ্ড। যেখানে সমাজ বলবান সেখানে বৃন্দাবনের সঙ্গে মথুরার রাজ্যপালনের একাকার হওয়া একান্ত অসঙ্গত। কিন্তু কৃষ্ণরাধার কাহিনী যে ভাবলোকে বিরাজ করিতেছে সেখানে কোন্ কৈফিয়ৎ আবশ্যক করে? এমন কি, সেখানে চিরপ্রচলিত সমস্ত সমাজপ্রথাকে অতিক্রম

করিয়া বৃন্দাবনের রাখালবৃত্তি মথুরার রাজত্ব অপেক্ষা অধিকতর গৌরবজনক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের দেশে যেখানে কর্মবিভাগ, শাস্ত্রশাসন এবং সামাজিক উচ্চনীচতার ভাব সাধারণের মনে এমন দৃঢ়বদ্ধমূল, সেখানে কৃষ্ণরাধার কাহিনীতে এই প্রকার আচারবিরুদ্ধ বন্ধনহীন ভাবের স্বাধীনতা যে কত বিস্ময়কর তাহা চিরাভ্যাসক্রমে আমরা অনুভব করি না।

শাক্তধর্মের সহিত বৈষ্ণব ধর্মের তুলনা করিয়া কবি একস্থলে লিখিয়াছেন—

"শক্তিপূজায় নীচকে উচ্চে তুলিতে পারে, কিন্তু উচ্চ-নীচের ব্যবধান সমানই রাখিয়া দেয়—সক্ষম অক্ষমের প্রভেদ সুদৃঢ় করে। বৈষ্ণবধর্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি—যে শক্তি বলরূপিণী নয়, প্রেমরূপিণী তাহাতে ভগবানের সহিত জগতে যে দ্বৈতবিভাগ স্বীকার করে, তাহা প্রেমের বিভাগ, আনন্দের বিভাগ। ভগবান বল ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন নাই, তাঁহার শক্তি সৃষ্টির মধ্যে নিজেতে নিজে আনন্দিত হইতেছে—এই বিভাগের মধ্যে তাঁহার আনন্দ নিয়ত মিলনরূপে প্রতিষ্ঠিত। শাক্তধর্মে অনুগ্রহের অনিশ্চিত সম্বন্ধ, বৈষ্ণব ধর্মে প্রেমের নিশ্চিত সম্বন্ধ। শক্তির লীলায় কে দয়া পায়, তাহার ঠিকানা নাই, কিন্তু বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে সকলেরই নিত্য দাবী। শাক্তধর্মে ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে, বৈষ্ণবধর্ম এই ভেদকে নিত্যমিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

শাক্ত যে পূজা অবলম্বন করিয়াছিল তাহা তখনকার কালেরই অনুগামী অর্থাৎ সমাজে তখন যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, যে শক্তির খেলা প্রত্যক্ষ হইতেছিল, যে সকল আকস্মিক উত্থান পতন লোককে প্রবলবেগে চকিত করিয়া দিতেছে মনে মনে তাহাকেই দেবত্ব দিয়া শাক্তধর্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। বৈষ্ণবধর্ম একটা ভাবের উচ্ছ্বাসে সাময়িক অবস্থাকে লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। সাময়িক অবস্থার বন্ধন হইতে এক বৃহৎ আনন্দের মধ্যে সকলকে নিষ্কৃতি দান করিয়াছিল।"

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে বাঙলা দেশে রসের বর্ষা নামিয়াছিল—তাহার ফলে বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্রে যে সোনার ফসল ফলিয়াছিল কবি সে কথার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"বর্ষাঋতুর মত মানুষের সমাজে এমন একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিতে থাকে। শ্রীচৈতন্যের পরে বাংলা দেশের সেই অবস্থা হইয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই দেশে সে সময়ে যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব্ব ভাষায় নূতন ছন্দে, কত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।" (সাহিত্য।

উপরে রবীন্দ্রনাথের যে সকল উক্তি উৎকলিত হইল তাহাতে দেখা যাইবে তিনি বৈষ্ণবতার বহু অঙ্গের অভিনব ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন এবং পরম শ্রদ্ধাসহকারে অন্তরের অকপট নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের ভাবাদর্শের ও মতবাদের সহিত মিলাইয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

এইগুলির মধ্যে আর একটি বস্তু লক্ষ্য করিতে হইবে—বৈষ্ণব রসতত্ত্ব এবং বৈষ্ণবতার প্রভাব ও মহিমার কথা বিবৃত করিতে গিয়া তাঁহার ভাষা আবেগের আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত ও উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে—সর্বত্রই অন্তরের আকুতি পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয়, বৈষ্ণব ভাবের দ্বারা তাঁহার জীবন, চরিত্র ও সারস্বত সাধনা কতটা প্রভাবান্বিত ও রসাবিষ্ট।

তাঁহার রচনার মধ্যে সর্বত্র বৈষ্ণবভাব সুস্পষ্ট নয় বটে, কিন্তু ঐভাব তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-সাধনায় ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত হইয়া আছে।

কবি শান্ত সাত্ত্বিক অনুন্মত্ত বৈষ্ণবভাবের পক্ষপাতী। প্রচলিত বৈষ্ণবতার ভাবোন্মাদকে তিনি বর্জন করিয়া গিয়াছেন। শুধু বর্জন কেন, তাহাকে নিন্দনীয় বলিয়াছেন। 'নৈবেদ্যে' তিনি বলিয়াছেন—

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীত গানে
ভাবোন্মাদ মত্ততায় সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ। দাও ভক্তি শান্তিরস
স্নিগ্ধ সুধাপূর্ণ করি মঙ্গলকলস
সংসার ভবন দ্বারে।

তিনি আনুষ্ঠানিক তত্ত্বনিষ্ঠ বৈষ্ণবতাকে, বিশেষতঃ বৈষ্ণব Symbolismকে এড়াইয়া যাইতেও কম চেষ্টা করেন নাই। জ্ঞাতসারে তিনি সেই চেষ্টাই করিয়াছেন, কিন্তু অজ্ঞাতসারে তিনি বঙ্গদেশের অন্তরাত্মার পরম ধর্মের দ্বারা মুহুর্মুহুঃ আবিষ্ট হইয়াছেন। বৈষ্ণবতার মধ্যে যাহা সর্বজনীন পরম সত্য, তাহাকে তিনি কি করিয়া এড়াইবেন? বাংলার মর্মস্থল হইতে প্রবাহিত রসধারাকেই বা কি করিয়া এড়াইবেন?

অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন বাবু রবীন্দ্রনাথকে একদিন বলিয়াছিলেন, "না জানিয়া নিজেরই অজ্ঞাতসারে এমন সব কথা আপনি বলিয়াছেন যাহা হইল বৈষ্ণবদের নিগূঢ়তম কথা। ইহাতেই বুঝা যায় ভারতের সেই প্রাচীন রসসাধনার ধারার সঙ্গে নাড়ীতে নাড়ীতে আপনার কি গভীর যোগ; ভারতীয় সাধনার নিত্যধারাই আপনার মধ্যে প্রবাহিত।"

(পুরাতনকথা, রসিকজয়ন্তী)।

রবীন্দ্রনাথ ভারতের সর্বযুগের, সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রতিনিধি। ভারতের সকল প্রকার সাধনা ও সংস্কৃতির ধারা মহাসমুদ্রে বহু নদীধারার ন্যায় তাঁহার সারস্বত জীবনে মিলিত হইয়াছে। তাঁহার বিরাট জীবনে ভারতের সকল সংস্কৃতির সমন্বয় হইয়াছে। বৈষ্ণবতার মত সমস্ত ধর্মসংস্কৃতির ধারা সন্ধান করিলে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার কোন না কোন স্তরে বা অঙ্গে পাওয়া যাইবে।

শৈব রবীন্দ্রনাথ

ভারতীয় সাহিত্য ও পুরাণের শিবরুদ্র চরিত্রের পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনাকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবান্বিত করিয়াছে,—শুধু প্রভাবসঞ্চার নয়, তাঁহার কবি-চিত্তকে রসাবিষ্ট করিয়াছে। মহাকবি কালিদাস মহাদেবের যে আদর্শকে মহামহিমায় ভাস্বর করিয়া দেখাইয়াছেন, কবির কাব্যে সেই আদর্শ বারবার নব নব রূপে দেখা দিয়াছে। ইহা ছাড়া, নটরাজরূপে শিব কবিকল্পনার রঙ্গভূমিতে কত বিচিত্র লীলাই না বিস্তার করিয়াছেন! শৈব সাহিত্যের মহাদেবের তপস্যা, মদনভস্ম, উমার তপস্যা, মহাদেবের বিবাহযাত্রা, তাঁহার শ্মশান-জীবন, হরগৌরীর সংসার জীবন, রুদ্রের তাণ্ডবনৃত্য, আত্মভোলা ভাব, তাঁহার সাজসজ্জা ইত্যাদি বহু উপাদান কবির কাব্যের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। শিবের রূপ-পরিকল্পনা ও চরিত্রের নিম্নলিখিত অঙ্গগুলি রবীন্দ্রনাথের কবিমর্ম্মকে স্পর্শ করিয়াছে।—শিব—নটরাজ। তাঁহার নর্ত্তনের ছন্দের তালে তালে বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংস—উদয় ও বিলয়—গোপন ও প্রকাশ। তিনি সন্ন্যাসী সর্ব্বরিক্ত—কিন্তু কুবের তাঁহার চরণতলে কৃতাঞ্জলি, অন্নদা তাঁহার পাশে। ললাটে বহ্নির পাশেই চন্দ্রকলা। সন্ন্যাসী তিনি,—কিন্তু উমার প্রেমে সংসারী, সংসারী হইয়াও অনাসক্ত। তিনি ভোলানাথ—শিশুর মত সরল—মান-অপমান স্তুতি-নিন্দায় উদাসীন। তিনি আশুতোষ—ক্ষমা তাঁহার ধর্ম্ম—ভুলিয়া যাওয়াই প্রকৃতি—সঞ্চয়ে তাঁহার মন নাই—যাহা পান দুই হাতে ছড়াইয়া দেন। তিনিই মহাকাল—একাধারে সৃষ্টি ও ধ্বংস—গতিবেগ ও স্থাণুতা—শীত গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষা, জরা, যৌবন—সমস্তই তাঁহার মধ্যে সমন্বয় লাভ করিয়াছে। তিনি শ্মশানবাসী—মৃত্যুর মধ্যে জীবনের বিষাণধ্বনি তাঁহার ফুৎকারে। মুখে তাঁহার অট্টহাস্য—সেই সঙ্গে মাভৈঃ নাদ। তিনি রসগঙ্গাধর—ললাটে তাঁহার জ্বলদর্চ্চি, কিন্তু বিশ্বসঞ্জীবনী রস-গঙ্গাধারা তাঁহার জটা হইতেই নির্গত। কন্দর্পকে ভস্ম করিয়া তিনি কামকে প্রেমে পরিণত করিয়াছেন।

শিবের সর্ব্বসংস্কার-মুক্ত নির্বিকার বৈরাগ্য কবি-চিত্তকে ভক্তিভাবে মুগ্ধ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কত ভাবে মহাদেবকে তাঁহার কাব্যে রূপ দান করিয়াছেন এই প্রবন্ধে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

ঋতুতে ঋতুতে রূপ-বৈচিত্র্যে নিত্য নবনবায়মানা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে কবি বিশ্বনাথের বিশ্বরূপ দেখিয়াছেন। বিশ্বনাথের ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও অলৌকিক মহিমাকে অবলম্বন করিয়াই কবির কাব্যে Pantheism.

প্রকৃতির প্রখর রৌদ্র-জ্বালাময় রূপে তিনি শিবের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়াছেন।

হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল

কারে দাও ডাক ?
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ !

অন্যত্র কবি বৈশাখকে ধ্যানমগ্ন তাপসের রূপে দেখিয়াছেন। রুদ্রদেবের উদ্দেশে বলিয়াছেন—

ভয় হয় দেখি নিখিল হবে কি জড় দানবের ভৃত্য ?
পিনাকে তোমার দাও টঙ্কার ভীষণে মধুরে দিক ঝঙ্কার,
ধূলায় মিশাক যা কিছু ধূলার, জয়ী হোক যাহা নিত্য।

এই বিশ্বের নশ্বর অনিত্য লীলার মধ্যে যিনি শাশ্বত—নিত্য, ঋতুচক্রের নেমিতে থাকিয়া যিনি মহাশক্তিকে আবর্ত্তিত করিতেছেন তিনিই মহাকাল শিব। এই কূটস্থ মহাযোগীর মহিমা কীর্ত্তনে তিনি নিত্যেরই জয়গান গাহিয়াছেন।

বৈশাখের রুদ্রতার অন্তরালে যে বর্ষার ব্যঞ্জনা লুপ্ত হইয়া আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া কবি উমার কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন—

রৌদ্রদগ্ধ তপস্যার মৌনস্তব্ধ অলক্ষ্য আড়ালে
স্বপ্নে রচা অর্চ্চনার থালে
অর্ঘ্যমালা সাঙ্গ হয় সঙ্গোপনে সুন্দরের লাগি।

কবি রুদ্রকে আষাঢ়ের ঘনঘটাময় রূপেও দেখিয়াছেন।

ওগো সন্ন্যাসী কী গান ঘনালো মনে
গুরু গুরু গুরু নাচের ডমরু বাজিলো ক্ষণে ক্ষণে।
তোমার ললাটে জটিল জটার ভার
নেমে নেমে আজ পড়িছে বারংবার,
বক্ষে তোমার অক্ষের মালা কাঁপে।

কবি শীতের মধ্যেও এই রূপই দেখিয়া প্রসন্নমূর্ত্তিতে উদিত হইতে বলিয়াছেন—

ধরণী যে তব তাণ্ডব-সাথী প্রলয় বেদনা নিল বুক পাতি
রুদ্র এবার বরবেশে তারে করগো ধন্য।

যিনি মহাকাল, কালের যে কোন অঙ্গের সহিত তাঁহার অভিন্নতা উপলব্ধি কবির বিশ্বাত্মিকা (cosmic) দৃষ্টির ফল। যিনিই মহাকাল, তিনিই নটরাজ। কবি মহাকাল ও নটরাজ এই দুই রূপের সমন্বয় দেখিয়াছেন—ঋতুরঙ্গের বিচিত্র লীলায়। নৃত্যের তালে তালে কালপ্রবাহে ভুবনে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লীলায়িত হইতেছে তাহাই ষড়্‌ঋতুর অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যরূপে আমাদের, জীবন ও মনকেও অভিক্রত করিতেছে। তাহাতেই আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখ, জীবন-মরণ সমস্তই তরঙ্গিত।

তব নৃত্যের প্রাণ বেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে।

ওগো সন্ন্যাসী ওগো সুন্দর ওগো শঙ্কর, হে ভয়ঙ্কর,
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
জীবন মরণ নাচের ডমরু বাজাও জলদমন্দ্র হে।

কবি এই নটরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা প্রার্থনা করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন—

আমার আহ্বান যেন অভ্রভেদী তব জটা হ'তে
উত্তারি আনিতে পারে নির্ঝরিত রসসুধাস্রোতে,
ধরিত্রীর তপ্ত বক্ষে নৃত্যচ্ছন্দে মন্দাকিনী-ধারা
ভস্ম যেন অগ্নি হয়, প্রাণ যেন পায় প্রাণহারা।

কবি যে মুক্তির দীক্ষা চাহিয়াছেন তাহা কি মুক্তি—সে কথা তাঁহার 'মুক্তিতত্ত্ব' নামক কবিতায় আছে। ঐহিক জীবনের সর্ব্ববিধ সংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্তিকেই কবি জীবন্মুক্তি মনে করেন। আমাদের দেশের শৈব সাধকগণও তাহাকেই মুক্তি মনে করিতেন। শিবই একমাত্র দেবতা যিনি সর্ব্বসংস্কারমুক্তির আদর্শ। কাজেই ব্রহ্মবাদী রবীন্দ্রনাথ হিন্দু পুরাণের সকল দেবদেবীর প্রতীকাত্মক (Symbolical) বা ভাবাত্মক (Spiritual) ব্যাখ্যা দিয়াছেন—কেবল শিবের পরিকল্পনাকেই বাচ্যার্থে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। তাই তাঁহার বহু কবিতাই ধুতুরা ও বিল্বপত্রের রূপ ধরিয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথকে শৈব রবীন্দ্রনাথ বলিতে পারিয়াছি। কোন রূপকল্পনা অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মের উপাসক রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম নয়, কিন্তু সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। শিবই তাঁহার সগুণ ব্রহ্ম। কাব্যে রসসৃষ্টি কবির মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও মাধুর্য্যের মধ্যে শিবের ঐশ্বর্য্য ও নিজের গভীর ভক্তিকে নিগৃহিত করিতে পারেন নাই।

শিশুর মধ্যে কবি এই সর্ব্বসংস্কারমুক্তির প্রাতীক্য লাভ করিয়া শিশুর ইষ্টানিষ্টে উদাসীন অনিদান লীলাবৈচিত্র্য ও স্বাভাবিক আত্মবিস্মৃতির মধ্যে ভোলানাথকে দেখিয়াছেন।

সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে যে কন্দর্পের উদ্দীপনী শক্তির সঞ্চার দেখা যাইতেছে, কবি বলিতেছেন—তাহার জন্য দায়ী হে কন্দর্পজিৎ সন্ন্যাসী তুমিই—

পঞ্চ শরে দগ্ধ ক'রে করেছ একি সন্ন্যাসী বিশ্বময় দিয়াছ তারে ছড়ায়ে।

কবির প্রশ্ন—হে সন্ন্যাসী, তুমিত অপরিমিত সংযমের বলে আত্মরক্ষা করিলে, কিন্তু অনঙ্গ রূপে কন্দর্প যে সমগ্র বিশ্ব জয় করিয়া বসিল—তাহার প্রতিকার কি করিলে ?

'মরণ' কবিতায় কবি শিবের বিবাহযাত্রার একটি চিত্র দিয়াছেন। তারপর মরণকে বলিতেছেন—'তুমি কি ঐ শিবের মত আমার পরাণবধূকে বিবাহ করিতে আসিবে না ?' এখানে কবি মরণকে প্রসন্ন শিবময় মূর্ত্তিতেই দেখিয়াছেন। উমার মতই কবির প্রাণবধূ আত্মসমর্পণের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। মৃত্যুকে আমরা ধ্বংসাবসান মনে করি বলিয়াই ইহা এত ভীষণ—মৃত্যুর নামে হৃদয় থরথর করিয়া কাঁপে। মৃত্যু সম্বন্ধে এধারণা ভ্রান্তি, মায়ামাত্র। প্রকৃত পক্ষে মৃত্যু দশান্তরের পথ ছাড়া আর কিছু নয়—কুমারীজীবন হইতে বধূজীবনে

প্রবেশের মত ইহা দশান্তর ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই দশান্তরের দেবতা মহাদেব। তিনি ভয়ঙ্কর নহেন,—তিনি শুভঙ্কর। ইঁহাকে চিনিতে পারিলে আর মৃত্যুভয় থাকে না।

কবি হিমাচলের বিরাট মহিমায় মহাদেবের রহস্যময় প্রেম-মহিমাই দেখিয়াছেন। কবি হিমাদ্রিকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

"নিরাকাঙ্ক্ষ নিরাসক্ত ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর,
কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্ব্বল সুন্দর
বাহুর করুণ আকর্ষণে? কিছু নাহি যাঁর
কেন তিনি চাহিলেন ভালবাসিলেন নির্ব্বিকার
পরিলেন পরিণয়পাশ? এই যে প্রেমের লীলা
ইহারি কাহিনী বহে হে শৈল, তোমার যত শিলা।

'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় বর্ষার মহানদ ব্রহ্মপুত্রের দুর্দ্দামতায় কবি ক্ষিপ্ত ধূর্জ্জটির রূপ দেখিয়াছেন। ব্রহ্মপুত্র চলিয়াছে—

তটারণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে ক্ষিপ্ত ধূর্জ্জটির প্রায়।

যেখানেই আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের কবিগুরু কালিদাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন সেখানেই কালিদাসের উপাস্য পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের কথা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যে শৈব, তাহার প্রধান কারণ তাঁহার কবিগুরু ছিলেন শৈব। অথবা কালিদাসও তাঁহার মতই শৈবই ছিলেন বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে এত ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন। শৈব বলিলে কেহ যেন রবীন্দ্রনাথকে চাঁদ সদাগরের মত শৈব মনে না করেন। কবি বলিয়াছেন—হরগৌরীই মহাকবির কুমারসম্ভব গানের প্রথম শ্রোতা। আর একটি সনেটে মহাকবিকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

সন্ধ্যাভ্রশিখরে
ধ্যান ভাঙ্গি উমাপতি ভূমানন্দভবে
নৃত্য করিতেন যবে, জলদ সজল
গর্জ্জিত মৃদঙ্গরবে, তড়িৎ চপল
ছন্দে ছন্দে দিত তাল তুমি সেই ক্ষণে
গাহিতে বন্দনাগান, গীতি-সমাপনে
কর্ণ হতে বর্হ খুলি স্নেহ-হাস্যভরে
পরায়ে দিতেন গৌরী তব চূড়া 'পরে।

ভক্ত কালিদাসকেই আবার তাঁহার উপাস্যের ঔপম্যগৌরব দান করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

জীবন-মন্থন-বিষ নিজে করি পান। অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

আজ ঠিক এই কথাই রবীন্দ্রনাথকেও বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ ভক্ত ও ভগবান দুই-এরই অনুসরণ করিয়াছেন।

কালিদাসের অনুসরণে কবিগুরু কনখলের বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

যেথা সেই জহ্নু-কন্যা যৌবন চঞ্চল
গৌরীর ভ্রূকুটিভঙ্গী করি অবহেলা
ফেন পরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা
লয়ে ধূর্জ্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যমন্দাকিনীও শিবকে নিতান্ত আপন জন জানিত বলিয়া তাঁহার চন্দ্রকরোজ্জ্বল জটা লইয়া খেলা করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ মরণকূলের ধ্বংসোৎসবের পথের বর্ণনায় ধ্বংসদেবতার তাণ্ডবের চিত্রণ দিয়া লিখিয়াছেন—

"যাবো সেথা শঙ্করের টলমল চরণ পাতনে
জাহ্নবী তরঙ্গমন্দ্র মুখরিত তাণ্ডব মাতনে
গেছে উড়ে জটাভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নভিন্ন দল
কক্ষচ্যুত ধূমকেতু লক্ষ্যহারা প্রলয় উজ্জ্বল
আত্মঘাত মদমত্ত আপনারে দীর্ণকীর্ণ ক'রে
নির্ম্মম উল্লাস বেগে খণ্ড খণ্ড উল্কাপিণ্ড ঝ'রে
কণ্টকিয়া তোলে ছায়াপথ।

শঙ্করের বিশ্বাত্মক রূপকল্পনার ইহা একটি দৃষ্টান্ত—

রবীন্দ্রনাথ 'তপোভঙ্গ' কবিতায় রুদ্রকে আপন জীবৎকালের অধিষ্ঠাতা মহাকাল মূর্ত্তিতে দেখিয়াছেন।

যে বৈরাগী মহাকাল চিরদিন নির্বিকার উদাসীন, নিরাকাঙ্ক্ষ ও অনাসক্ত—তিনি তপোভঙ্গ-দূত কবির জীবনের চক্রান্তে ধরা পড়িয়া ছদ্মবেশে সুন্দরের হাতে পরাভব স্বীকার করিয়াছেন। "বারে বারে পঞ্চশরে অগ্নিতেজে দগ্ধ করে" শেষে তাহাকে দ্বিগুণ উজ্জ্বল করিয়া বাঁচাইতে বাধ্য হইয়াছেন। কবির বক্তব্য—হে মহাকাল, একদিন কবি তোমার তপোভঙ্গ সাধন করিয়া তোমাকে বরবেশে সাজাইয়াছিলেন—যুগে যুগে সেই কবিই ফিরিয়া আসে, আর তাহার সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে তোমার তপোভঙ্গ হয়।

তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে বিলীন বিরহ তলে
উমাকে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্ত দুঃখদাহে।

* * *

হেনকালে মধুমাসে মিলনের লগ্ন আসে
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য বিকশিত লাজ
সেদিন কবিরে ডাক—
ভগ্ন তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী,
আমি সেই কবি।

মোহধ্বান্তহর চৈতন্যময় সুপ্রভাতের রূপে কবি মহারুদ্রকে দেখিয়াছেন। ঝঞ্ঝা-বজ্রঘনঘটাময় প্রভাতের প্রকৃতির মধ্যে কবি মহাজাগরণের বিষাণধ্বনি শুনিয়াছেন। ঈশানের বিষাণধ্বনি প্রলয়ঙ্কর, কিন্তু মুখে তাঁহার মাভৈঃ বাণী।

এসেছে প্রভাত এসেছে।
তিমিরান্তক শিবশঙ্কর কী অট্টহাস হেসেছে।
জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর পেতে হবে তব পরিচয়
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে সকল শঙ্কা করি জয়,

*   *   *

মহাসম্পদ তোমারে লভিব সব সম্পদ খোয়ায়ে।
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া তোমার চরণ ছোঁয়ায়ে।

ঈশান শুধু ধ্বংসকর্ত্তা নহেন—ত্রাণকর্ত্তাও তিনি। তিনি ধ্বংস করেন ঐহিক সম্পদ্, ত্রাণ করেন এই মরলোক হইতে অমৃতলোকে স্থান দিয়া। ঐহিক সম্পদ্ সমস্তই উৎসর্গ না করিলে তাঁহার করুণা পাওয়া যায় না।

নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

একটি কবিতায় কবি তাঁহার উপাস্য মহারুদ্রকে আহ্বান করিয়াছেন, বর্ত্তমান জড়বাদী সভ্যতার নরকক্ষেত্র এই নাগরিক জীবনকে ধ্বংস করিয়া নীচতার ক্লেদপঙ্ক হইতে মানবাত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য বিরাট প্লাবনকে জটাবন্ধ হইতে মুক্ত করিতে।

প্রথম যৌবনে প্রভাত-সঙ্গীতের 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতায় কবি বলিতে চাহিয়াছেন—এই রুদ্র দেবতাই নিয়মের কঠোর শাসন হইতে—শৃঙ্খলার শৃঙ্খল হইতে কল্পে কল্পে এই বিশ্বকে ধ্বংসের পথে মুক্তি দিয়াছেন। মহাকালের এই ধ্বংস অন্ধকারে ধ্বংস নয়, অগ্নিবন্যায় ধ্বংস—তাহা হইতে আবার নূতন সৃষ্টির অভ্যুদয়।

অগ্নিবন্যা বিস্তারিয়া যে প্রলয় আনে মহাকাল
চন্দ্র সূর্য্য লুপ্ত করে আবর্ত্তে ঘূর্ণিত জটাজাল
দিব্য দীপ্তিচ্ছটায় সে সাজে
বজ্রের ঝঞ্ঝনা মন্দ্রে বক্ষে তার রুদ্রবীণা বাজে।
সে বিশ্বে বেদনা হানে তাহারি দাহনে করে তার
পবিত্র সৎকার।
জীর্ণ জগতের ভস্ম যুগান্তের প্রচণ্ড নিশ্বাসে
লুপ্ত হয় ঝঞ্ঝার বাতাসে।
অবশেষে তপস্বীর তপস্যা-বহ্নির শিখা হ'তে
নব সৃষ্টি উঠে আসে নিরঞ্জন নবীন আলোতে।

জীবনের অপরাহ্ণে আবার রুদ্রের সেই রূপকে স্মরণ করিয়া তাঁহার তাণ্ডবসাথী জগতের দুর্দ্দম দলের বর্ণনায় বলিয়াছেন—

দুর্বার দুরন্ত তারা শাসন না মানে
তোমারে আপন সাথী জানে।
সকল নিয়ম বন্ধহারা
আপন অধীর ছন্দে তোমারে নাচাতে চায় তারা
তব বাহু ধরি।
তুমি মনে মনে হাস ভৃঙ্গীর ভ্রূকুটী লক্ষ্য করি
এদের প্রশ্রয় দিলে, তাই যত দুর্দ্দমের দল
চরাচর ঘেরি ঘেরি করিছে উন্মত্ত কোলাহল
সমুদ্রতরঙ্গতালে, অরণ্যের দোলে,
যৌবনের উদ্বেল কল্লোলে।

বিশ্বনাথের শিবরূপ কবির মনকে যে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। একটি কারণ, শিবের জীবনে দারিদ্র্যের সহিত আনন্দের সম্মিলন। রবীন্দ্রনাথ যে দেশের কবি, সে দেশ দরিদ্র, কিন্তু দারিদ্র্যের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করার শক্তিও তাহার প্রচুর। দরিদ্র দেশের জীবনে নিঃস্বতার সহিত আনন্দের সংযোগ দেখাইতে বারবারই তাঁহাকে শিবকেই স্মরণ করিতে হইতেছে—ইন্দ্রের বা কুবেরের নামও তিনি করেন নাই। সমগ্র দেশ যে চিররিক্ত শিবের আনন্দময় আদর্শে সান্ত্বনা পাইয়াছে, কবি সেই শিবকেই তাঁহার কাব্যে উপাস্যরূপে বরণ করিয়াছেন। এ বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের শিষ্য।

কবি নিজের সৃষ্টির একটা সমর্থনও পাইয়াছেন শিবের চরিত্রে ও জীবনে। এই দুর্গত নিরন্ন দেশে তিনি কাব্য-বিলাসের আনন্দ দিয়াছেন—সুকুমার শিল্পকলার রস দান করিতে চাহিয়াছেন। যাহারা চাহিয়াছে অন্নজল, তাঁহাদিগকে দিয়াছেন কাব্যকলার মাধুর্য্য। এই অদ্ভুত কার্য্যের সমর্থনের জন্য কবিকে শিবেরই শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। একখানি চিঠিতে তিনি বলিয়াছেন—

"দরিদ্র শিবের আনন্দ নাচে। প্রতিদিনকার দৈন্যটাই যদি একান্ত সত্য হতো তা'হলে এই নাচ আমাদের একেবারেই ভালো লাগত না। * * আমাদের পুরাণে শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দরিদ্র বেশ আর অন্নপূর্ণায় তাঁর ঐশ্বর্য্য। বিশ্বে এই দুইএর মিলনেই সত্য। সাধুরা এই মিলনকে যখন স্বীকার করতে চান না তখন কবিদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধে। তখন শিবের ভক্ত কবি কালিদাসের দোহাই পেড়ে এই যুগলকেই আমাদের সকল অনুষ্ঠানের নান্দীতে আহ্বান করব যারা বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ। যাদের মধ্যে অভাব আর অভাবের পূর্ণতার নিত্যলীলা।"

ভারতীয় সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন, তিনি ভারতের সর্ব্বযুগের চিন্তানায়কগণের প্রতিনিধি। বৈদিক কবির আর্ষ-দৃষ্টি তাঁহার মানসনয়নে, উপনিষদের ঋষির ব্রহ্মোপলব্ধি তাঁহার সৃষ্টির অঙ্গে অঙ্গে, পৌরাণিক বীর ও তাপসগণের সত্যনিষ্ঠা ও তেজস্বিতা তাঁহার সাধনায়। বৌদ্ধ মহাস্থবিরদের মত গতানুগতিকতার বিরোধী স্বাধীন চিন্তার প্রচারক তিনি। মধ্যযুগের ধর্ম্মবিপ্লবের সামঞ্জস্যসম্পাদক মিষ্টিক সাধকদের বাণী তাঁহার সাহিত্যে অনুস্যূত। অর্বাচীন যুগে যাঁহারা সংস্কৃতি-সংঘর্ষের সন্ধিস্থলে অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ও সত্যপিপাসু, তাঁহাদের সর্ব্বশক্তির মিলনভূমি তাঁহার সাধনায়। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতীক রবীন্দ্রনাথ। ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার যে তপঃশক্তি যাজ্ঞবল্ক্য হইতে রামমোহন পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে সেই শক্তি যেন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথে। ভারতের বীরের বিক্রমে, সাধকের সাধনায়, কবির বাণীতে কবি আপন মহত্তর সত্তার ধারাবাহিকতা অনুভব করিয়া বলিয়াছেন—

"এই 'আমি' যুগে যুগান্তরে কত মূর্ত্তি ধ'রে কত নামে
কত জন্ম কত মৃত্যু করি পারাপার কত বারংবার।"

কেবল কবিতার মধ্য দিয়া আমরা পূর্ণ রবীন্দ্রনাথকে পাই না। তাঁহার জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ সাধনা, তাঁহার ব্রত, বাণী ও চিন্তার মধ্যে তাঁহাকে আমরা সমগ্র ভাবে পাই। ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত যাঁহার পরিচয় আছে এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সাধনার সঙ্গে যাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে—তিনিই এ কথার যাথাথ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কবিব নিজের কথায়—

যেখানেই যে তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞযাগ
আমি তার লভিয়াছি ভাগ।
মোহবন্ধমুক্ত যিনি আপনারে করেছেন জয়,
তার মাঝে পেয়েছি আপন পরিচয়।
যেখানে নিঃশঙ্ক বীর মৃত্যুরে লঙ্ঘিল অনায়াসে
স্থান মোর সেই ইতিহাসে।

ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ সাধনার বিবিধ ধারার মহামিলন নিজের সত্তার মধ্যে অনুভব করিয়া কবি বলিয়াছেন—

লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জ্জনের সঙ্গী
যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে।
আলো নিয়ে অস্ত্র নিয়ে মহাবাণী নিয়ে
তারা বীর, তারা তপস্বী, তারা মৃত্যুঞ্জয়,

তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার সবর্ণ, সগোত্র,
তাদের নিজ শুচিতায় আমি শুচি।
তারা সত্যের পথিক জ্যোতির সাধক অমৃতের অধিকারী।

যুগে যুগে ভারতীয় সংস্কৃতি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সংক্রামিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ কবিরূপে সেখানকার ভারতীয় সংস্কৃতির শেষ দূত। 'সাগরিকা'-নামক কবিতায় কবি আপনাকে ভারতের সর্ব্বযুগের সংস্কৃতির প্রতিনিধি বলিয়া কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন—

এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে
ধনুক বাণ নাহি আমার হাতে।
এবার আমি আনিনি ডালি দখিন সমীরণে
সাগরকূলে তোমার ফুলবনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কিনা।

অর্থাৎ বার বার যুগে যুগে কত রূপে তোমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি—এবার কবিরূপে আসিয়াছি। তুমি কি আমাকে চিনিতে পার?

যাঁহারা দেশের চিন্তাগুরু ও দার্শনিক—যাঁহারা সত্যপ্রচারক তাঁহারা কবির কাব্যে দেন প্রেরণা এবং যোগান উপাদান। তাঁহারা যাহা তত্ত্বের আকারে সূত্রনিবদ্ধ করেন—তথ্যের রূপে প্রচার করেন, কবি সেগুলির মধ্যে করেন জীবনসঞ্চার—সেগুলি কবির কাব্যে রসরূপ লাভ করিয়া সাধারণের অধিগম্য ও উপভোগ্য হয়। সকল দেশেই দেখা যায় বড় বড় চিন্তাগুরু ঋষিকল্প মহাপুরুষদের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই কবিগণ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের তত্ত্বচিন্তাকে সাহিত্যে রূপদান করিয়াছেন। আমাদের দেশে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরে বৌদ্ধসাহিত্য ও জাতক সাহিত্যের জন্ম হইয়াছে। এই সাহিত্যের মধ্য দিয়া বুদ্ধদেবের বাণী সরস ও হৃদ্য হইয়া দেশে প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর যে সকল কবির আবির্ভাব হইয়াছিল—তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীকে সঙ্গীত ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমাদের অধিগম্য করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদের ঋষিদের বাণী পুরাণ ছাড়া কোন সংস্কৃত কবির কাব্যনাট্যে বা প্রাদেশিক ভাষার কবির রচনায় রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে রসরূপ ধারণ করে নাই। উপনিষদের ঋষিদের অমৃতবাণী এত কাল রবীন্দ্রনাথের প্রতীক্ষায় দেশের ভাবগুহায় ধ্যানমগ্ন ছিল বলিয়া মনে হয়।

কেবল ঋষিদের বাণী নয়, মহাকবিদের স্বপ্ন ও রসাদর্শও পরবর্ত্তী কবিদের কাব্যে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় প্রাচীন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের রসাদর্শ আমরা পরবর্ত্তী সংস্কৃত কবিদের এবং প্রাদেশিক কবিদের রচনার মধ্যে দেখিতে পাই না। কালিদাসের রসাদর্শও এই বর্ত্তমান যুগের মহাকবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ কেবল কালিদাসের রসাদর্শে যৌবনে আবিষ্ট হ'ন নাই—রস-বিচারচ্ছলে তাঁহার কাব্যের অভিনব সার্থকতা (Interpretation) উদ্ঘাটন করিয়া তাহাতে

নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছেন। কালিদাসের রসাদর্শ দেশে বিলুপ্ত হওয়ায় তাঁহার কাব্যের রসোপভোগ তাঁহার নিজস্ব আদর্শে সম্পাদিত হইত না, প্রচলিত আদর্শেই হইত। তাহার ফলে মহাকবির প্রতি অবিচারই হইত। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের নিজস্ব রসাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কালিদাসের রচনার রসবিচার করিয়াছেন। ইহার দ্বারা ভারতীয় সাহিত্যজগতে তিনি যে কি উপকার করিয়াছেন—তাহা রসজ্ঞ ব্যক্তিরাই জানেন। নিশ্চয়ই এজন্য তিনি অমর কবি কালিদাসের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন এবং নিশ্চয়ই মহাকবি সেই সঙ্গে স্বর্গলোকে ভবভূতিকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছেন—"ঠিকই বলিয়াছিলে বৎস, উৎপৎস্যতেঽস্তি কোঽপি সমানধর্ম্মা কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী।"

রবীন্দ্রনাথের যে রসদৃষ্টি বিশ্বপ্রকৃতিকে কাব্যে নবকলেবর দান করিয়াছে—সেই রসদৃষ্টি প্রাচীন ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সাহিত্য, আর্যবাণী ও জীবনধারাকেও অভিনব সার্থকতা (Interpretation) দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাই ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ সংস্কৃতিধারার অভিনব ব্যাখ্যাতা। এই ব্যাখ্যানের কার্য্য তিনি অভিনব সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়াই করিয়াছেন—প্রবন্ধের মধ্য দিয়াও করিয়াছেন। অনেকস্থলে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ নূতন সৃষ্টির রূপ লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধীয় আলোচনাগুলি।

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের ঋষিদের বাণী, গীতার ভাগবতী বাণী, বিবিধ পৌরাণিক উপাখ্যান, প্রাচীন সাহিত্য, বৌদ্ধযুগের শীলানুশীলন, বুদ্ধদেবের বাণী, প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রথাপদ্ধতি, বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সাহিত্য, শাক্তধর্ম্ম ও সাহিত্য, শিব ও রুদ্রের পরিকল্পনা ইত্যাদি ভারতীয় সংস্কৃতির বহু অঙ্গের অভিনব ব্যাখ্যান দিয়াছেন। আমি এখানে দুই চারিটির উদাহরণ দিব। কবি প্রথমে গায়ত্রী মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করি।

"আমরা জানি বা না জানি—ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্বোধিত করিয়া তোলাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা। ভারতবর্ষে এই উদ্বোধনের যে মন্ত্র আছে তাহাও অত্যন্ত সরল। তাহা এক নিশ্বাসেই উচ্চারিত হয়—তাহা গায়ত্রী মন্ত্র। 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ' গায়ত্রীর এই অংশটুকুর নাম ব্যাহৃতি। ব্যাহৃতি শব্দের অর্থ—চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনা। প্রথমতঃ ভূর্লোক—ভূবর্লোক—স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হয়—মনে করিতে হয়, আমি বিশ্বভুবনের অধিবাসী—আমি কোন বিশেষ প্রদেশবাসী নহি—আমি যে রাজ অট্টালিকার মধ্যে বাসস্থান পাইয়াছি, লোক-লোকান্তর তাহার এক একটি কক্ষ। এইরূপে, যিনি যথার্থ আর্য্য, তিনি অন্ততঃ প্রত্যহ একবার চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারকার মাঝখানে নিজেকে দণ্ডায়মান করেন, পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া নিখিল জগতের সহিত আপনার চিরসম্বন্ধ একবার উপলব্ধি করিয়া লন—স্বাস্থ্যকামী যেরূপ রুদ্ধগৃহ ছাড়িয়া প্রত্যূষে একবার উন্মুক্ত মাঠের বায়ু সেবন করিয়া আসেন, সেইরূপ আর্য্য সাধু দিনের মধ্যে একবার নিখিলের মধ্যে, ভূর্ভুবঃ—স্বর্লোকের মধ্যে নিজের চিত্তকে প্রেরণ করেন। তিনি সেই অগণ্য জ্যোতিষ্ক-খচিত বিশ্বলোকের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কি মন্ত্র উচ্চারণ করেন—তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

এই বিশ্বপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তির ধ্যান করি। এই বিশ্বলোকের মধ্যে সেই বিশ্বলোকেশ্বরের যে শক্তি প্রত্যক্ষ, তাহাকেই ধ্যান করি। একবার উপলব্ধি করি বিপুল বিশ্বজগৎ এক সঙ্গে সেই মুহূর্ত্তে এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহা হইতে অবিশ্রাম বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা যাহাকে দেখিয়া শেষ করিতে পারি না, জানিয়া অন্ত করিতে পারি না, তাহা সমগ্রভাবে—নিয়তই তিনি প্রেরণ করিতেছেন। এই বিশ্বপ্রকাশক অসীম শক্তির সহিত আমার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে? কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া তাহাকে ধ্যান করিব?

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ

যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার প্রেরিত সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্য্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য নিজে আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছেন, সেই কিরণেরই দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অন্তরে যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন—যে শক্তি থাকাতেই আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত প্রত্যক্ষ ব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি, সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি—এবং সেই শক্তির দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকের সবিতৃরূপে তাঁহাকে জগৎ চরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করিব, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে—অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং অন্তরে ধী, এই দুইই একই শক্তির বিকাশ, ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চিত্তের এবং আমার চিত্তের সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা ও স্বার্থ হইতে, ভয় ও বিষাদ হইতে মুক্তিলাভ করি। এইরূপে গায়ত্রী মন্ত্র বাহিরের সহিত অন্তরের এবং অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে।"

উপনিষদের বাণীর ব্যাখ্যান তাঁহার শান্তিনিকেতন পর্য্যায়ের প্রবন্ধগুলিতে ও ধর্ম্মনামক গ্রন্থের নিবন্ধগুলিতে উপনিবদ্ধ। তাঁহার নৈবেদ্য কাব্যের কবিতাগুলিতে ঐ বাণীগুলি সংহত।

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ব্যাখ্যা—'শ্রৌত বা স্মার্ত্ত মতে করেন নাই। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার সহিত কবির ব্যাখ্যার মিল হয় না।' মিল নাই বলিয়াই ত তিনি নবযুগের ঋষি। উপনিষদ্ শুধু দর্শন নয়, ইহা ব্রহ্মায়ণ মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের যথার্থ ব্যাখ্যা আমরা কবির কাছেই চাই—দার্শনিক ব্যাখ্যা যাহাই হউক। তাহা ছাড়া কবির আর্ষ দৃষ্টিতে আর্ষ মন্ত্রগুলি যে রূপলাভ করিয়াছে সেইগুলিই বর্ত্তমান যুগে তাহাদের সত্য রূপ। উপনিষদ্ সম্বন্ধে কবির উক্তি—

"উপনিষদের মধ্যে যে ব্রহ্মের প্রকাশ আছে তাহা পরিপূর্ণ, তাহা অখণ্ড, তাহা আমাদের কল্পনাজাল দ্বারা বিজড়িত নয়। উপনিষদ্ বলিয়াছে—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। এই বিচিত্র জগৎ সংসারকে উপনিষদ্ ব্রহ্মের অনন্ত সত্যে ব্রহ্মের অনন্তজ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখিয়াছে।"

—কোন মূর্ত্তি, মন্দির বা প্রতীক কল্পনা না করিয়া ব্রহ্মকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া উপনিষদ্

সর্ব্বপ্রকার জটিলতা-জাল হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়াছে। কবির মতে ধর্ম্মের বিশুদ্ধ সরলতার এত বড় বিরাট আদর্শ আর নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রার্থনার মধ্য দিয়া তাঁহার উপনিষদের উপলব্ধি এইভাবে একটি ভাষণে প্রকাশ করিয়াছেন।—

হে পুষণ, হে পরিপূর্ণ, অপাবৃণু, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ খোলো। আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য, তোমার মধ্যে তার অবারিত স্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্ঘাটিত হোক।

হে পুষণ, তোমার হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন। উন্মুক্ত কর সেই আবরণ।

তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ আপনার মহৎ স্বরূপকে দেখেছে—কালে কালে বলেছে—'জেনেছি আমরা অমৃতের পুত্র'—বলেছে—'জেনেছি অন্ধকারের পার হ'তে আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষের আবির্ভাব।'

হে সবিতা, সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন। তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায় রচিত যে আমার দেহের অণু পরমাণু। তারো অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ। তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে। * * *

মহাকাল সন্ন্যাসী তুমি
তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গশিখরে
উচ্ছ্রিত হয়ে উঠেছে সৃষ্টি
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে।
প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত অব্যক্তের চক্রনৃত্য
তারি নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে
তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে।
হে নির্ম্মম, দাও আমাকে ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা,
জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া ও হারাণোর মাঝখানে
যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নি শিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে দাও আমাকে আশ্রয়।

হিন্দুর উৎসবে—আনন্দের প্রাচুর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে মনুষ্যত্বের ক্ষণিক অবস্থাগত সমস্ত দৈন্যের বিমোচন হয়, এইকথা তিনি উৎসব নামক প্রবন্ধে বিস্তৃত করিয়া বলিয়াছেন, তাহাই রবীন্দ্রনাথের 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' উপনিষদের এই বাণীর ব্যাখ্যা।

'দিন ও রাত্রি' নামক প্রবন্ধে—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি—এই বাণীর একটি পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবনের প্রতিদিনকার প্রার্থনা—

অসতো মা সদ্‌গময় তমসোমা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়, আবিরাবির্ম্ম এধি।

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্। এই প্রার্থনার তিনি ব্যাখ্যা দিয়াছেন 'প্রার্থনা' প্রবন্ধে, তাঁহার জীবনের মটো (motto)—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি— এই বাক্যের ভূমার ব্যাখ্যা তিনি নানাস্থলেই দিয়াছেন—একটি ব্যাখ্যা পাই 'মনুষ্যত্ব' নামক প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় বলিয়াছেন—

তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া,
বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।

তারপরই বলিয়াছেন—'শুনরে একের ডাক।' এই 'একের' পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'এক' নামক প্রবন্ধে, উপনিষদের বৃক্ষ-ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্—এই বাণীর মধ্য দিয়া। এই প্রবন্ধে ও প্রার্থনা নামক প্রবন্ধে মৈত্রেয়ীর যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিং কুর্য্যাম্ এই অমরবাণীরও ব্যাখ্যা আছে। 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' নামক নিবন্ধে শান্তং শিবমদ্বৈতমের ব্যাখ্যা দিযাছেন। অবিদ্যযা মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে —উপনিষদের এই বাণীর সহিত 'ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্' এই শ্লোকেরও ব্যাখ্যা দিয়াছেন—'ততঃ কিম্' নামক নিবন্ধে। ইহাকেই কবি ভূমার সুর বলিয়াছেন।

কবি বিনা যুক্তিতে নির্বিচারে প্রাচীন ভারতের কোন ভাববস্তু বা তথ্য গ্রহণ করেন নাই। দেশের প্রাচীন ঋষি মনীষীদের প্রতি গভীর ভক্তি তিনি সহজাত ভাবে ও পারিবারিক আবেষ্টনীর প্রভাবে লাভ করেন। এই ভক্তিই আগে, তারপর সেই ভক্তির সমর্থনের জন্য যুক্তি। এই যুক্তির অনুসন্ধান করিয়াছেন কোন শাস্ত্রে নয়, কোন গুরুর কাছে নয়, নিজের মনেই। তাহার ফলে তিনি অন্তর হইতে একটা আলোক পাইয়াছেন। সেই আলোকে তিনি যে তত্ত্বসূত্র খুঁজিয়া পাইযাছেন—তাহাই অবলম্বন করিয়া ভক্তির সমর্থনমূলক ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন।

সেই সূত্রানুসারে তিনি ওঙ্কারের এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—"ওঁ একটি ধ্বনিমাত্র—তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থ নেই। এই শব্দ চিত্তকে ব্যাপ্ত করিযা দেয়—কোন বিশেষ আকারে বাধা দেয় না। এই একটি মাত্র ওঁ শব্দের মহাসঙ্গীত জগৎ সংসারের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকে, সঙ্গীতের স্বর যেমন গানের কথার মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয়তার সঞ্চার করে তেমনি ওঁ শব্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি আমাদের ব্রহ্মধ্যানের মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয়তা অবতারণ করিয়া থাকে। ওঁ শব্দের অর্থ—হাঁ। সুতরাং ওঁ হচ্ছে স্বীকারোক্তি। এই যে পরিপূর্ণতা যা সমস্তকে নিয়ে অথচ যা কোন খণ্ডকে আশ্রয় করে নয়, যা চন্দ্রে নয়, সূর্য্যে নয়, মানুষে নয়, অথচ যা চন্দ্রসূর্য্য মানুষে, যা কানে নয়, চোখে নয়, বাক্যে নয়, মনে নয়, অথচ সমস্ত কানে চোখে বাক্যে মনে—সেই একেই—সেই হাঁ-কেই সমস্ত প্রাণমন দিয়ে—সেই পরিপূর্ণতাকে স্বীকার হচ্ছে ওঙ্কার। উপনিষদের ঋষিগণ বলেন—জগতে এবং জগতের

বাইরে ব্রহ্মই একমাত্র ওঁ—তিনিই চিরন্তনী হাঁ, তিনিই Everlasting Yea. আমাদের আত্মার মধ্যে তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেশকালকে অতিক্রম ক'রে তিনি ওঁ—তিনিই হাঁ। এই মহৎ, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী যে হাঁ, ওঁ-ধ্বনি ইহাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মের কোন প্রতিমা ছিল না—কোন চিহ্ন ছিল না—এই একটিমাত্র ক্ষুদ্র অথচ সুবৃহৎ ধ্বনি ছিল—ওঁ।"

রবীন্দ্রনাথ গীতার বাণীর ব্যাখ্যান দিয়াছেন এইভাবে—

"আতস কাচের একপিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্য্যালোক আর একপিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তরশ্মি—মহাভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আর দিকে তেমনি তাহারই সমষ্টির একটা সংহত জ্যোতিঃ। জ্ঞানকর্ম্মভক্তির যে সমন্বয় যোগ তাহাই সমস্ত ভাবতেতিহাসের চরম তত্ত্ব।"

"মানুষকে ভগবান সখা ব'লে তখনি সম্মান করেছেন যখন তাকে দেখিয়েছেন তাঁর উগ্ররূপ, তাকে দিয়ে যখন বলিয়েছেন—'দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্'—মানুষ যখন প্রাণমন দিয়ে এই স্তব করতে পেরেছে—অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।'"

বিশ্বরূপই ব্রহ্মের রুদ্ররূপ, দুঃখরূপ। এই রূপকে সহ্য করিতে পারিলেই ব্রহ্মের সখা হইবার অধিকার জন্মে।

আমরা গীতার সম্বন্ধে খুব বিস্তৃত ব্যাখ্যানই রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। তবে গীতা ত উপনিষদের সার নির্য্যাস—উপনিষদের বিবিধ অংশের ব্যাখ্যা তিনি বহু প্রবন্ধে দিয়াছেন—তাহাতেই গীতার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। নৈবেদ্যের কবিতাগুলির মধ্যে গীতার নিষ্কাম কর্ম্মবাদ ও কর্ম্মফল ব্রহ্মে সমর্পণের কথা বহুবারই আছে। গীতায় যে দ্বন্দ্বাতীত মহাপুরুষত্বের একটা আদর্শ আছে—রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শে মহাপুরুষত্বের বিচার করিতেন—সেই মহাপুরুষেরই একটা ছায়া তাঁহার Symbolical নাটকগুলিতে দেখা যায়।

কবি বলিয়াছেন—ব্রহ্মের মধ্যেই আমাদের সংসারের পরিণাম, আমাদের কর্ম্মের গতি। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ 'যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।' ইহাতে একই কালে কর্ম্ম এবং বিরাম, চেষ্টা এবং শান্তি, দুঃখ এবং আনন্দ। ইহাতে একদিকে আমাদের আত্মার কর্ত্তৃত্ব থাকে ও অন্য দিকে যেখানে সেই কর্ত্তৃত্বের নিঃশেষে বিলয়, সেইখানে কর্ত্তৃত্বকে প্রতিক্ষণে নিঃশেষে বিসর্জন দিয়া আমরা প্রেমের আনন্দ লাভ করি।

রবীন্দ্রনাথ বৈদান্তিক ধর্ম্মের পরিবেষ্টনীর মধ্যে লালিত, বৈদান্তিক ধর্ম্মেই দীক্ষিত। বেদান্তের নূতন ব্যাখ্যা দিবার প্রয়োজন তাঁহার হয় নাই। বেদান্তের বৃন্তেই তাঁহার সমগ্র রচনাবলী সহস্রদল পদ্মের মত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে তিনি নিজের কবিমনের উপযোগী করিয়া জীবনে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। বেদান্তের কবিকল্পিত অভিনব ব্যাখ্যা তাঁহার কবিতাবলী ও রাজা নাটকের মধ্যে রসরূপ ধরিয়াছে। তিনি অদ্বৈতবাদী, কিন্তু মায়াবাদী নহেন। কবির ব্রহ্ম রসব্রহ্ম, রসো বৈ সঃ।

মায়াবাদের সঙ্গে সংসারত্যাগের সম্বন্ধ আছে—কবি সে পথে মুক্তির কথা বলেন নাই—বরং বলিয়াছেন 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ।' তিনি কবিরূপে এই বিশ্বকে বিশ্বনাথের মতই ভালবাসিয়াছেন। তিনি বলেন—যে খুশী রুদ্ধ চোখে ধ্যান করুক। এই বিশ্ব সত্য কিংবা ফাঁকি সে বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করুক, আমি তত ক্ষণ দিনের আলো থাকিতে থাকিতে বিশ্বের সৌন্দর্য্য নির্নিমেষে দেখিয়া লই। ইহা মায়াবাদীর কথা নয়।

নির্গুণ ব্রহ্ম লইয়া কাব্যরচনা চলে না, ভক্তিবাদও চলে না—সেজন্য তাঁহার কাব্যে নির্গুণ ব্রহ্মকে আমরা সগুণ ব্রহ্মরূপেই পাই। এই সগুণ ব্রহ্ম কোন প্রতীকের দ্বারা উপলব্ধব্য নয়। তিনি নিরাকার, নিরাধার, কিন্তু তিনি নিরুপাধিক নহেন। এইরূপ সগুণ ব্রহ্মকল্পনা কেবল কাব্যেরই প্রয়োজনে কি না বুঝা যায় না। তবে নির্গুণ অদ্বৈতের উপাসনারও তিনি পন্থা দেখাইয়াছেন—"পরকে আপন করিয়া, অহমিকাকে খর্ব করিয়া, প্রেমের পথ প্রশস্ত করিয়া।" তিনি একস্থলে বেদান্তের কথায় বলিয়াছেন—"সমস্ত বেদের নানা পথের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্তের একটি সন্ধান ও লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাই বেদান্ত।"

প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আশ্রমবিভাগ সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ইত্যাদি আমাদের ধর্ম্মকেই জীবনের মধ্যে, সংসারের মধ্যে, সর্ব্বতোভাবে সার্থক করিবার সোপান। পরে তিনি এই আশ্রমবিভাগের সার্থকতার খুব বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন 'ততঃকিম্' নামক নিবন্ধে। সেই ব্যাখ্যার প্রারম্ভে কবি বলিয়াছেন—এই দিন যেমন চার স্বাভাবিক অংশে বিভক্ত—পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ এবং সায়াহ্ন—ভারতবর্ষ সেইরূপ জীবনকে চারি আশ্রমে ভাগ করিয়াছিল। এই বিভাগ স্বভাবকে অনুসরণ করিয়াই হইয়াছিল। আলোক ও উত্তাপের ক্রমশঃ বৃদ্ধি এবং ক্রমশঃ হ্রাস যেমন দিনের আছে, তেমনি মানুষেরও ইন্দ্রিয়শক্তির ক্রমশঃ অবনতি আছে। এই ক্রমকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষ জীবনের আরম্ভ হইতে জীবনান্ত পর্য্যন্ত একটি অখণ্ড তাৎপর্য্যকে বহন করিয়া লইয়া গেছে। প্রথমে শিক্ষা, তাহার পরে সংসার, তাহার পরে বন্ধনগুলিকে শিথিল করা, তাহার পরে মুক্তি ও মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা।

কবি 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায়' প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির একটা অভিনব ব্যাখ্যান দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রামায়ণ মহাভারতের বহু উপাখ্যানের রূপক বিশ্লেষণ করিয়াছেন। রামায়ণকে তিনি বলিয়াছেন—আর্য্যজাতির কৃষিবিস্তার হইতে গৃহধর্ম্ম-নীতির উদ্বোধনের ইতিহাস।

প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধীয় আলোচনাগুলিতে কবি কালিদাসের কাব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'যে আনন্দ পেলুম তা-ত আবৃত্তির আনন্দ নয়,—সৃষ্টির আনন্দ। বেশ বুঝলুম এসব কাব্য আমি যেমন ক'রে পড়লুম—দ্বিতীয় আর কেউ তেমন ক'রে পড়েনি।' কবির এই উক্তি অকপট ও পরম সত্য। কবি যে 'সৃষ্টির আনন্দ' পাইয়াছেন তাহাই কতকগুলি নিবন্ধে রূপ লাভ করিয়াছে—সেগুলিও অভিনব সৃষ্টি। কালিদাসের কাব্যের কুহরে কুহরে যে রস সঞ্চিত ছিল এতকাল তাহা কাহারো চোখে পড়ে নাই।

কবি প্রথম যৌবনে প্রভাতসঙ্গীতে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় নামক একটি কবিতায় ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রের ত্রিগুণাত্মিকা ত্রৈশী পরিকল্পনার একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। পরে একটি প্রবন্ধে ভগবানের এই ত্রিমূর্ত্তির একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়া বলিয়াছিলেন :—

"ব্রহ্মায় আর্য্যসমাজের আরম্ভকাল, বিষ্ণুতে মধ্যাহ্নকাল, শিবে তাহার শেষ পরিণতির রূপ।"

শিবশক্তির অর্দ্ধনারীশ্বর রূপেরও কবি একটা ব্যাখ্যা দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"প্রাচীন সংহিতাকারগণ হিন্দুসমাজে হরগৌরীকে অভেদাঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন। বিশ্বচরাচর যে গ্রহণ ও বর্জ্জন, যে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, যে কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ, যে স্ত্রী ও পুরুষ ভাবের নিয়ত সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, সমাজকে তাঁহারা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল দিকে সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যের উপরে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিব ও শক্তির, নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সম্মিলনই সমাজের একমাত্র মঙ্গল এবং শিব ও শক্তির বিরোধই সমাজের সমস্ত অমঙ্গলের কারণ, ইহাই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন।"

ব্রহ্মের এই ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে শিবই রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে বিস্ফারিত ও ভাবগদ্‌গদ করিয়াছে। আর্য্যের মহাযোগী সর্ব্ববন্ধনমুক্ত অনাদিনিধন ব্রহ্মময় শিব ও অনার্য্যের ভাঙধুতুরাখোর শ্মশান-চারী, ভস্মভূষণ ভুজঙ্গধর প্রেতপিশাচপরিবৃত দরিদ্র গৃহী শিব দুইয়ে মিলাইয়া আমাদের শিব। কালিদাসের মত রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার উপাস্য শিব—আর্য্যের শিব। কিন্তু অনার্য্যের শিব —যিনি আমাদের বঙ্গসাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ সেই ভিখারী শিবের মহিমারও চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

"মঙ্গলকাব্যগুলিতে জামাতার নিন্দা, স্ত্রীপুরুষের কলহ, গৃহস্থালীর বর্ণনা আছে, তাহাতে রাজভাব বা দেবভাব কিছুই নাই। দাম্পত্যবন্ধনের মধ্যে একটা বিঘ্ন বিরাজ করিতেছে দারিদ্র্য। বাংলার কবিহৃদয় এই দারিদ্র্যকে মহত্ত্বে ও দেবত্বে মহোচ্চ করিয়া তুলিয়াছে। ভোলানাথ দারিদ্র্যকে অঙ্গের ভূষণ করিয়াছেন—দরিদ্রসমাজের পক্ষে এমন আনন্দময় সান্ত্বনা আর নাই। 'আমার সম্বল নাই' যে বলে সেই গরীব। আমার আবশ্যক নাই যে বলিতে পারে তাহার অভাব কিসে? শিব তাহারই আদর্শ।"

আর্য্যের শিবকেও কবি আপনার মনের মাধুরী ও ভক্তি দিয়া নূতন করিয়া বিশ্বাত্মক রূপে গড়িয়া লইয়াছেন। ইহাই তাঁহার উপাস্যের ধ্যানমূর্ত্তি-গঠন। এই শিবকে কখনো তিনি প্রলয়, কখনো মরণ, কখনো মহাকাল, কখনো আনন্দে বিভোর নটরাজ, কখনো গ্রীষ্মের উগ্রজ্বালাবর্ষী মহাতাপস, কখনও জ্বলজ্জ্বলদজটাকলাপমণ্ডিত ধূর্জ্জটি, কখনও কল্যাণ-গঙ্গাধর, কখনও সর্ব্বসংস্কারমুক্তির চিদানন্দঘন ভাববিগ্রহের সহিত একাত্মকভাবে দেখিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার বিশ্বরূপ। শিব ও রুদ্র কত রূপে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পূর্বপ্রবন্ধে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

কবি গৌরীর সহিত হরের মিলনের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"আমাদের পুরাণে শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দরিদ্রবেশ আর অন্নপূর্ণায় তাঁর ঐশ্বর্য্য। বিশ্বে এই দুইএর মিলন সত্য।

সাধুরা এই মিলনকে যখন স্বীকার করতে চান না—তখন কবিদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধে। তখন শিবের ভক্ত কবি কালিদাসের দোহাই পেড়ে এই যুগলকেই আমরা আমাদের সকল অনুষ্ঠানের নান্দীতে আহ্বান করব—যাঁরা বাগর্থাবিবসংপৃক্তৌ—যাঁদের মধ্যে অভাব ও পূর্ণতার নিত্যলীলা।"

বাংলার শাক্ত মঙ্গলকাব্যগুলিতে শিব হইতে শক্তিকে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহার পূজা ও মহিমা প্রচার করিবার চেষ্টা হইয়াছে। শিব হইতে শক্তি বিযুক্ত হইলেই ধর্ম্মের পরাভব ঘটে। রবীন্দ্রনাথ বলেন মঙ্গলকাব্যগুলি ইহারই দৃষ্টান্ত।

"কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মনসার ভাসান, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য প্রকৃত পক্ষে অধর্ম্মেরই জয়গান। সেই সকল কাব্যে অন্যায়কারিণী ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তির হাতে শিব পরাভূত।"

কবি নানা প্রবন্ধেই মেঘদূতের অভিনব ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যান মেঘদূত নামক কবিতাতেও রূপলাভ করিয়াছে।

"মেঘমন্দ্র শ্লোক—
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপনার অন্ধকার স্তরে
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে।"

ইহাই অভিনব ব্যাখ্যার মূল সূত্র। বিদায়-অভিশাপ, চিত্রাঙ্গদা, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তীসংবাদ ইত্যাদি কবিতায় কবি মহাভারতের কতকগুলি উপাখ্যানকে অভিনব সার্থকতা (Interpretation) দান করিয়াছেন। "ভাষা ও ছন্দ" কবিতা বাল্মীকির কবিত্ব-লাভের একটি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা। "পতিতা" "অহল্যা" ইত্যাদি কবিতা রামায়ণের কোন কোন উপাখ্যানের অভিনব ব্যাখ্যা; "বৈষ্ণব কবিতা" "একাল ও সেকাল" "দেহের মিলন" "পশারিণী" ইত্যাদি কবিতা বৈষ্ণব কবিতাব রসাদর্শের ছন্দোময়ী ব্যাখ্যা। গীতাঞ্জলির কোন কোন কবিতাও বৈষ্ণব রসসাধনারই ব্যাখ্যা। রবীন্দ্রনাথ নানা রচনায় বৈষ্ণবপদাবলীর মর্ম্ম-কথার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা বৈষ্ণব রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে আগেই বলিয়াছি।

ভারতীয় সংস্কৃতির আরো দুই একটি অঙ্গের Interpretation কবি যেভাবে দিয়াছেন এখানে তাহার উল্লেখ করি। যেমন গঙ্গার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—

মানুষের মুখ্য ভয় মৃত্যুভয়,
কেমনে করিবে তারে জয়, নাহি জানে।
তাই সে হেরিছে ধ্যানে
মৃত্যুবিজয়ীর জটা হ'তে অক্ষয় অমৃত স্রোতে
প্রতিক্ষণে নামিছ ধরায়।
পুণ্যতীর্থ তটে সে যে তোমার প্রসাদ পেতে চায়।
সে ডাকিছে মিথ্যা শঙ্কা নাগ-পাশ ঘুচাও ঘুচাও,
মরণেরে যে কালিমা লেপিয়াছি মুছাও মুছাও।

গম্ভীর ভয়াল মূর্ত্তি মরণের
তব কলধ্বনি মাঝে গান ঢেলে দিক তরণের
এ জন্মের শেষ ঘাটে।
শেষ দণ্ডে ভ'রে দিক তার কাণ
অজানা সমুদ্রপথে তব নিত্য অভিসার গান।

যজ্ঞের অভিনব ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিয়াছেন—

যে সকল ক্রিয়াকলাপে মানুষ আত্মশক্তির দ্বারা বিশ্বশক্তিকে উদ্বোধিত ক'রে তোলে তাই মানুষের যজ্ঞ। গীতাকার যদি একালের মানুষ হতেন, তবে সমস্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক অধ্যবসায়ের মধ্যে তিনি মানুষের যজ্ঞকে দেখতে পেতেন। একদা যজ্ঞকাণ্ডের দ্বারা যে চেষ্টা বিশ্বশক্তির সিংহদ্বারে আঘাত করেছিল—গীতা তাকেও সত্য ব'লে দেখিয়েছে।

কাশীধামের আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যা—

"হিন্দুর কাছে কাশীর ভৌগোলিক সীমানা একটা মায়া। পরামার্থতঃ যেখানে নিখিল বিশ্বের পরিচয়—সেইখানেই বিশ্বেশ্বরের আসন। যথার্থ হিন্দুর কাছে মৃত্যুর মুক্তিবাণী কাশীতে বিশুদ্ধ স্বরে প্রবেশ করে।"

কবি হিন্দুসমাজের সতীধর্ম্মের চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন—তাঁহার অজস্র কবিতায় ও প্রবন্ধে। তাঁহার 'সমাজ'-গ্রন্থের ষষ্ঠীচরণের চিঠিতে বৈধব্যব্রতের এবং 'মাভৈঃ' নামক প্রবন্ধে সতীর সহমরণেরও চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

যে দৃষ্টিতে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতিকে নব কলেবর (অবশ্য রসজ্ঞগণের চোখে) দান করিয়াছেন, সেই দৃষ্টিই আমাদের সংস্কৃতির সর্ব্বাঙ্গকে আমাদের কাছে নব সার্থকতায় মণ্ডিত করিয়াছে। এই দৃষ্টিকে Cosmic, Synthetic বা Universal vision বলা যাইতে পারে। যাহা পুরাতন তাহাকে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী সার্থকতাদান, যাহা লৌকিক তাহার মধ্যে অতিলৌকিক ব্যঞ্জনার সন্ধান, যাহা দেশকালের সীমায় পরিচ্ছিন্ন—তাহার সীমাগণ্ডীর বিলোপ-সাধন, যাহা সঙ্কীর্ণ ও সসীম তাহার সহিত অসীমের যোগসাধন, বিশেষকে সামান্যের মধ্যে মুক্তিদান, যাহা প্রাকৃত তাহার উপর আধ্যাত্মিক আলোকপাত,—গতানুগতিক চিন্তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উদ্বোধন—এই মানসদৃষ্টিরই ফল। ইহাকেই বলে Rational interpretation—ইহাই বিশ্বজনীন গূঢ়ার্থের আবিষ্কার। রবীন্দ্রনাথের মত এত বড় গূঢ়ার্থের আবিষ্কারক এদেশে পূর্ব্বে কেহ জন্মিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

এইরূপ নব নব অর্থের আবিষ্কারে (ইংরাজিতে যাহাকে বলে Symbolical, Spiritual, Universal বা Transcendental significance) ভারতীয় সংস্কৃতির সর্ব্বাঙ্গ নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ভাবলোকে যাহা কিছু গুহাহিত ছিল—আজ রবির আলোকে সবই যেন ঝলমল করিতেছে। নব নব অর্থ-সম্পদের আবিষ্কারে ভারতের ঋষি, কবি ও সাধুসন্তগণের বাণীর মূল্য যে কত বাড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

———